কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ প্রকাশন :

স্বাধীন ভারত

ও তাহার অর্থনৈতিক সংগঠন

৺অনাথগোপাল সেন স্মৃতি-প্রবন্ধ

অধ্যাপক

ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ও

কস্তুরচাঁদ লালুয়ানী

কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের পক্ষে প্রকাশক শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট : কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
১৯৪৬
দাম : চার টাকা

৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, বোধি প্রেস হইতে
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

১

স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থনৈতিক সংগঠন

লেখক : শ্রীধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

২

স্বাধীন ভারতের আর্থিক সংগঠন

লেখক : শ্রীকস্তুরচাঁদ লালুয়ানী

ভূমিকা

আমাদের দেশের অনেকেই জানেন, স্বর্গীয় অধ্যাপক অনাথগোপাল সেন ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে বাংলাভাষার আলোচনায় একজন অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার সরস আলোচনা বাংলা সাহিত্যের একটা নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছিল। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ একজন প্রধান সভ্য হারাইয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করে। তাঁহার আলোচনার ধারা অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রতিবৎসর ভারতীয় অর্থনীতি, রাজনীতি বা শিক্ষা-পদ্ধতির কোনও একটি বিষয় লইয়া বাংলায় প্রবন্ধ আহ্বান করা ও উপযুক্ত প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার দেওয়া স্থির হয়। দশ বৎসর এই ব্যবস্থা চলিবে। প্রথম বৎসরের জন্য Economic Order in Free India 'স্বাধীন ভারতে ও তাহার আর্থিক সংগঠন' প্রবন্ধের বিষয় নির্ধারিত হয়। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের অনুরোধে অর্থনীতির বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা প্রবন্ধগুলি বিচার করেন। পরীক্ষকদের মতে শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত কস্তুরচাঁদ লালুয়ানী, এই উভয়ের প্রবন্ধই পুরস্কারযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উভয় প্রবন্ধের ভাষা এবং আলোচনা-পদ্ধতির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিষয়টির বিচারে যে উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া পরীক্ষকেরা প্রীতিলাভ করিয়াছেন। পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুইটি একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া সুধীবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। আশা করি, ইহাতে অনাথগোপাল সেন মহাশয়ের উপযুক্ত মর্যাদা রক্ষিত হইয়াছে; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবার আয়োজন রূপে সকলে ইহা গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।

অনাথগোপাল স্মৃতি-সমিতি
১ ডোভার লেন, কলিকাতা
১৫ই চৈত্র, ১৩৫৪

ইতি

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

স্বাধীন ভারত

ও তাহার অর্থনৈতিক সংগঠন

স্বতন্ত্র ভারতের ভবিষ্যৎ রূপটি যে কী হইবে, তাহার পূর্ণাঙ্গ আভাস দেওয়া বর্তমান সময়ে এক প্রকার অসম্ভব। এক দুরন্ত রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি; ইহার দাপটে কতো কিছু যে ধ্বংস হইয়া যাইবে, এবং নূতন সৃষ্টি যে কোন দিক দিয়া কী রূপ ধরিয়া দেখা দিবে, সে সম্বন্ধে কিছু-কিছু কল্পনা করা চলে বটে,—কিন্তু ভাবিকালের ইতিবৃত্ত তাহাকে হয়তো নিছক কল্পনা বলিয়াই নির্ধারণ করিবে। প্রত্যেক জাতির ও প্রত্যেক দেশের ভাগ্য আজ নূতন করিয়া ছাঁচে ঢালা হইতেছে; কে কোন রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহা এখনও অনিশ্চিত। এই যুগসন্ধিক্ষণে ভবিষ্যৎ ভারতের একটি পরিপূর্ণ রূপ নির্দেশ করার ব্যাপারে যেমন কল্পনা ও যুক্তির ব্যবহার করিয়া আনন্দ পাওয়া যায়, তেমনি প্রমাদের সম্ভাবনাও পদে পদে।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারিত না হইলে তাহার আর্থিক সংগঠন সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছু ভাবা চলে না। রাজনীতিতে আর অর্থনীতিতে অবিচ্ছেদ্য সংযোগ। কাজেই ভারতের রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান কী প্রকারে হইবে তাহা না জানিলে তাহার আর্থিক সংগঠন সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষ আদৌ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবে কি না, এবং করিলে কবে ও কী উপায়ে—ইহাই মুখ্য রাজনৈতিক সমস্যা। ভবিষ্যৎ

ভারতের রাজনৈতিক রূপটি কেমন হইবে, তাহার শাসনতন্ত্র স্বৈরাচারমূলক হইবে কি গণতন্ত্রসম্মত হইবে—ইহা আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা। তৃতীয় সমস্যাটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে ভারতবর্ষের অখণ্ডত্ব নষ্ট করার প্রয়োজন হইবে কিনা এবং ইহার ফলে ভারতবর্ষ একাধিক[১] খণ্ডে বিভক্ত হইলে তাহাদের রাজনৈতিক সম্বন্ধ কী দাঁড়াইবে—ইহাই আমাদের তৃতীয় সমস্যা। আজিকার ভারতবর্ষে এই প্রশ্নগুলির অবিসংবাদিত উত্তর পাওয়া একান্তই অসম্ভব। অথচ, এ সম্বন্ধে কতকগুলি কল্পনাকে স্বীকার করিয়া না লইলে, ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থ নৈতিক রূপটি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না।

অতএব যুক্তি ও কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান যথাসাধ্য সন্ধান করিবার চেষ্টা করা যাক।

ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্য-অর্জন-প্রচেষ্টা এ যাবৎ প্রধানত শান্তিপূর্ণ অহিংসার পথকেই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। ইহাতে তাহার অভীপ্সিত বস্তু সহজলভ্য হইবে কিনা, সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ থাকিতে পারে; কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে একটা বৃহৎ আন্দোলনকে যুক্তি ও ন্যায়ের সরল মার্গে চালিত করিয়া ভারতবর্ষ তাহার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে বহুল পরিমাণে দুষ্ট ব্যক্তিত্বের[২] হাত হইতে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছে। শান্তিপূর্ণ আর্থিক সংগঠনের পক্ষে রাজনৈতিক শান্তি ও শৃংখলা অপরিহার্য। যদি অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পূর্ণ রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করে, তবে এই শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলনের ঐতিহ্য তাহার আর্থিক সংস্থাকে সুদৃঢ় করিতে প্রভূত সাহায্য করিবে। আর যদি রক্তময় বিপ্লবের পথেই ভারতের স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিতে হয়, তাহা হইলেও ভারতবর্ষের আর্থিক রূপটি যুক্তিসিদ্ধ (rational) হইতে পারে না, এমন নয়, যদিও যুক্তিবিচারের প্রতিষ্ঠা করিতে দীর্ঘসময় অতিক্রান্ত হওয়াই সম্ভব। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে, ভারতবর্ষ স্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা উভয় কার্যই একযোগে সম্পন্ন করিতে পারিবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে

ইহাকে অবাস্তব কল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাহিরের পৃথিবীর দিকে ভালো করিয়া তাকাইলে ইহাকে একেবারেই দুরাশার পর্যায়ে স্থান দিতে পারি না। বিশেষত, গ্রেট ব্রিটেন যদি সত্যই সোশ্যালিস্ট ডিমক্রেসির[৩] (Socialist Democracy) দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তবে ভারতবর্ষের অভিভাবকত্ব তাহাকে শান্তিপূর্ণভাবেই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

দ্বিতীয় সমস্যাটি আরও জটিল। কোনো দেশের শাসনতন্ত্র (Constitution) একদিকে যেমন অর্থ নৈতিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত, অন্যদিকে রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থারও সে-ই নিয়ামক। অর্থনীতি একদিকে যেমন রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, অন্যদিকে তেমনি রাজনীতির দ্বারা নিয়মিত হইতেছে। স্বতন্ত্র ভারতের রাজনৈতিক-তরণীর কর্ণধারেরা যদি বৈশ্যমনোবৃত্তি-সম্পন্ন[৪] হইয়া পড়েন এবং শূদ্রদের নিষ্পেষণ করিতে চেষ্টা করেন, তবে তাহার অর্থ নৈতিক আকাশ যে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে এবং শূদ্রবিপ্লবের বীজ যে বপন করা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কী? বর্তমান কালের ভারতে যেরূপ ধনবৈষম্য ও শিক্ষাবৈষম্য বিদ্যমান, তাহাতে এই আশংকাকে একেবারেই ভিত্তিহীন বলা চলে না। তবুও এই প্রবন্ধে এই আশংকাকে প্রাধান্য দিতে আমরা কুণ্ঠা বোধ করিতেছি। যুক্তি ও ন্যায়ের উপর আমাদের আস্থা এতই সুদৃঢ় যে ভবিষ্যৎ ভারত ক্রমশ সাম্য-ভাবাপন্ন গণতন্ত্রের (Equalitarian Democracy) দিকে অগ্রসর হইবে, ইহা ভিন্ন আর কিছু আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলনের উদার ঐতিহ্য এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিবে, সন্দেহ নাই।

তৃতীয় সমস্যাটিও এখন আর উপেক্ষার বিষয় নয়। ভারতবর্ষের অখণ্ডত্ব বিনষ্ট না করিয়া কোনোরূপ সন্তোষজনক মীমাংসা যদি সম্ভব হইত, তবে সম্ভবত ভারতের অর্থনীতিবিদ্‌গণই সর্বাপেক্ষা সুখী হইতেন। কেন না ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যে যে নিবিড় আর্থিক সংযোগ ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রহিয়াছে, সে তথ্য তাঁহারা সর্বদাই অনুধাবন করিতেছেন[৫]। এই প্রবন্ধে আমরা ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক সত্তা বলিয়াই ধরিয়া

লইব। তাহার বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে যথোপযুক্ত স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও, তাহাদের মধ্যে গরিষ্ঠ সংযোগ ও অবাধ বাণিজ্য থাকিবে, এ কথা ধরিয়া লইতে হইবে। আর যদি কোনো প্রদেশ মূল ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাতন্ত্র্য লাভ করেই, তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থনৈতিক রূপটির সন্ধান করিতে গিয়া তাহার রাজনৈতিক কাঠামোটির দিকে ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করিতে হইল। ইহা নিতান্তই অপরিহার্য ছিল। এবার আমাদের কল্পনার মূর্তিটিকে রূপ দিতে হইবে। কিন্তু, তাহার আগে, এই ভারতেরই এক বড়ো শিল্পী[৬] ভবিষ্যৎ ভারতের কী রূপ কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখা যাক।

—২—

গান্ধীজির স্বরাজকল্পনার মধ্যে রাজনীতি, ব্যক্তিনীতি (personal ethics) এবং অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গীরূপে সম্বদ্ধ; একটিকে বাদ দিয়া অন্যটিকে বুঝিবার উপায় নাই। তাঁহার অর্থনীতি রাজনীতিকে পরিশুদ্ধ করার এবং ব্যক্তিচরিত্রের সদ্ব্যবহার করার একটি উপায় মাত্র; ইহার অতীত কোনো মূল্য অর্থনীতির আছে, এ কথা গান্ধীজি বিশ্বাস করেন না।

এক সময়ে অর্থনীতির পড়ুয়ারা অর্থের একটা স্বতন্ত্র মূল্যে বিশ্বাস করিতেন, এমন কথা অর্থনীতিশাস্ত্রের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নয়। কিন্তু আজও অর্থনীতিবিদ্‌রা সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুসরণ করিতেছেন, এ কথা বলিলে বর্তমান অর্থনীতিশাস্ত্রের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হইবে। বস্তুত, গত পঞ্চাশ বৎসরে অর্থনীতিশাস্ত্রের তত্ত্বের দিক দিয়া যতো না পরিবর্তন হইয়াছে, আদর্শের দিক দিয়া হইয়াছে তাহার চেয়ে বেশি। যে শাস্ত্র একদিন ব্যক্তিস্বার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন কোনো সমাজস্বার্থকে স্বীকার করিত না, করিলেও একটি শ্রেণীস্বার্থকে সমাজস্বার্থ বলিয়া ধরিয়া লইত, সেই শাস্ত্র আজ নিরন্তর গরিষ্ঠ

সমাজস্বার্থের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। এই দিক দিয়া গান্ধীজির অর্থনীতির সহিত প্রচলিত অর্থনীতির প্রভেদটাকে যত বড়ো করিয়া সাধারণত দেখা হয়, বাস্তবিক তাহা তত বড়ো নয়। ব্যক্তির উন্নতি ও সমাজের সংগঠন উভয় চিন্তাধারারই মর্মস্থলে, প্রভেদ শুধু উন্নতির রূপ ও উপায় লইয়া।

কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্র যখন ধনতন্ত্রের গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরিয়া মরিতেছে এবং তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিবার যে প্রচলিত পথ—অর্থাৎ বিপ্লবাত্মক সমাজতন্ত্র—তাহাকেও প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, তখন গান্ধীজির দ্বিধাহীন, বিকল্পহীন পথের বাণী তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। ইহার আন্তরিক সারল্য তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে মুগ্ধ করে বটে, কিন্তু গান্ধীজি যখন বলেন, 'ইহাই মুক্তির এ ক মা ত্র উপায়', তখন ইহার অতিরিক্ত সারল্যই তাহাকে এ পথে আসিতে বাধা দেয়। সে আবার তাহার অভ্যস্ত গোলক-ধাঁধার মধ্যে ছট্‌ফট্ করিয়া মরে। প্রচলিত অর্থনীতি জীবনকে সমৃদ্ধ করিতে চায়, আর সারল্য তো সমৃদ্ধির ঠিক বিপরীত। গান্ধীজি বলেন, সারল্য আর স্বাবলম্বনই সমৃদ্ধির পথ, ইহার চেয়ে বড়ো সমৃদ্ধি চাহিলে বিপদে পড়িতে হইবে; সে সমৃদ্ধি আসে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে, তাহার পথ দুষ্ট রাজনীতি ও বিনষ্ট জীবন দিয়া আকীর্ণ। ম্যাকবেথের কথায় বলিতে গেলে—

> "Only
> Vaulting ambition, which o'erleaps itself
> And falls on the other."[৭]

সে সমৃদ্ধির দায় অনেক। তাহার ভার বহিবার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নাই। সাধারণ লোক তাহার ভাগ পাইবে না, শুধু তাহার বোঝা বহিয়া মরিবে। সে সমৃদ্ধি ধনতন্ত্রের ভিতর দিয়াই আসুক আর কেন্দ্রশাসিত সমাজতন্ত্রের ভিতর দিয়াই আসুক, সাধারণ মানুষকে সুখী কিংবা উন্নত করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। গান্ধীজির বিশ্বাস, সাধারণ মানুষকে সুখ ও

স্বাধীনতা দিতে হইলে, সমৃদ্ধিকে কিছুটা ত্যাগ করিতেই হইবে। তাঁহার মতে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা চারিত্রিক সমৃদ্ধি, সামাজিক ধনবৃদ্ধি অপেক্ষা ব্যক্তির স্বাধীনতা, অনেক বেশি কাম্য। সেই জন্য তাঁহার কল্পনায় ভারতবর্ষে অবাধ ধনতন্ত্র বা কেন্দ্রীভূত সমাজতন্ত্র কোনোটাই বাঞ্ছনীয় নয়। ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের যে চিত্রটি তাঁহার বিভিন্ন রচনায়, নিবন্ধে ও প্রশ্নোত্তরে অংকিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ধনিকশাসিত বৃহৎ যন্ত্র যেমন অবাঞ্ছনীয়, রাষ্ট্রশাসিত বৃহৎ কলকারখানাও তেমনি অবান্তর। স্বতন্ত্র ভারতবর্ষের যে রূপটি তিনি কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে বৃহৎ যন্ত্র, জনাকীর্ণ নগর, কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার স্থান অল্প। তাহার মধ্যে স্বাবলম্বী গ্রামসমাজ, সরল জীবন ও পঞ্চায়েৎ শাসনের মধ্য দিয়া স্ব-রাজ সাধনার আদর্শই প্রধান। সেইজন্য অর্থনীতির প্রচলিত সূত্র ধরিয়া ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের যে রূপটি আমরা কল্পনা করি, গান্ধীজির কল্পনার সহিত তাহার প্রভেদ বিস্তর। তাঁহার কল্পনায় মানুষের সমৃদ্ধির যে আদর্শটি চিত্রিত হইয়াছে, প্রচলিত অর্থনীতি তাহাকে আজও প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। গান্ধীনীতি ও প্রচলিত অর্থনীতির পার্থক্য এই নয় যে, গান্ধীজি চান মানুষের উন্নতি এবং প্রচলিত অর্থনীতি চায় শুধুমাত্র আর্থিক সঞ্চয়। তাহাদের পার্থক্য মানুষের সমৃদ্ধির বস্তুরূপটি (content) লইয়া। সমৃদ্ধি বলিতে প্রচলিত অর্থনীতি যাহা বোঝে, গান্ধীজি তাহা বোঝেন না। তিনি যে অর্থে মানুষের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, প্রচলিত অর্থনীতি সে অর্থকে স্বীকার করিয়া লইতে রাজি নয়।

আদর্শকল্পনার দিক দিয়া প্রচলিত অর্থনীতির সহিত গান্ধীনীতির এই যে পার্থক্য, ইহার কারণ আমাদিগকে সন্ধান করিতে হইবে। উভয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য যখন এক, অর্থাৎ মানুষের জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করা, তখন এই উন্নতির আদর্শ ও উপায় লইয়া উভয়ের মধ্যে এই মতদ্বৈধ কেন? এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এই মতদ্বৈধের মূল কিছুটা প্রচলিত অর্থনীতির বনিয়াদের মধ্যে সন্ধান করিতে হইবে; আর কিছুটার সন্ধান পাওয়া যাইবে

গান্ধীজির মানসিক সংগঠনের মধ্যে। অর্থনীতির মূলসূত্রগুলি সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ ধারণা ও বিকৃত ব্যাখ্যাও অনেক সময়ে এই মতদ্বৈধকে আকারে বড়ো করিয়া দেখাইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, গান্ধীনীতির সহিত প্রচলিত অর্থনীতির প্রভেদটাকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত বেশি বড়ো করিয়া দেখা হইয়া থাকে। বর্তমান অর্থনীতিশাস্ত্রের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

কিন্তু একথা অস্বীকার করা চলিবে না যে, বর্তমান অর্থনীতিশাস্ত্রের যে ইতিহাস এবং যে আবেষ্টনীর মধ্যে তাহা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে অর্থকে জীবনের কেন্দ্র মনে করিয়া প্রাধান্য দিবার আশংকা যথেষ্ট; এবং যদিও বর্তমান অর্থনীতিশাস্ত্র পূর্বের ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে পরিহার করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তথাপি তাহার জন্মের ছাপগুলিকে সে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। সেইজন্যই আর্থিক সমৃদ্ধির সন্ধানকে সে একেবারেই নির্বিকারে অবহেলা করিতে প্রস্তুত নয়। আর্থিক সমৃদ্ধি বাড়াইতে পারে, এমন কোন উপায়কেই সে একান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে করিতে পারে না, সে উপায় অন্য দিক দিয়া যতই অনিষ্টকর হৌক না কেন, তাহাকে একবার পরীক্ষা না করিয়া বর্জন করিবার কল্পনাও সে করিতে পারে না। এই পরীক্ষার ব্যাপারে নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক— নানাপ্রকার বিপদের কথা, নানা রকমের বাধাবিঘ্নের কথা তাহার জানা আছে। কিন্তু চারিদিকে উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিয়া যদি আর্থিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থাটা পাকাপোক্ত করিয়া লওয়া যায়, তাহাতে তাহার আপত্তি নাই।

গান্ধীজির আপত্তি ঠিক এইখানেই। তাঁহার অর্থনীতিতে 'অর্থ'টাই বড়ো কথা নয়, 'নীতি' টাই বড়ো। কাজেই 'অর্থের' ব্যবস্থা করিতে গিয়া যদি 'নীতি'র উপর আঘাত পড়ে, বা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাঁহার আপত্তি করিবারই কথা। গান্ধীজির মতে এই নীতি দ্বিবিধ: সমাজনীতি ও ব্যক্তিনীতি। গান্ধীজির বিশ্বাস, প্রচলিত অর্থনীতি যে পথকে অনুসরণ করিতে চায়, তাহা গৌস্বামিদের পথ, অতিরিক্ত সমৃদ্ধিপিপাসা দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া সমাজনীতি ও ব্যক্তিনীতি,—এই

দুই নীতিরই মর্মমূলে আঘাত করে। তাঁহার মতে, নানা রকমের রক্ষাকবচ দিয়া যদিও বা আর্থিক সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করা যায়, সে ব্যবস্থা তথাপি স্থায়ী হয় না, তাহা মানুষের কুপ্রবৃত্তিগুলিকে নিরন্তর উত্তেজিত করিতে থাকে, এবং এক সময়ে এই বর্ণচোরা ব্যবস্থা আপনার বিকৃত স্বরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সেই জন্য ভবিষ্যৎ কালের ভারতে তিনি রাষ্ট্রশাসিত সমাজতন্ত্রের উদ্ভব দেখিয়াও সন্তুষ্ট হইবেন না। এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন,

"আমার মত এই যে, বৃহদাকার শিল্প দুর্নীতির বাসস্থান। সমাজতন্ত্র যতই শক্তিশালী হউক, ইহার মূল কিছুতেই উচ্ছেদ করিতে পারে না। ইহার পশ্চাতে লোভ নিরন্তর কাজ করিতে থাকে।"[৮]

সমাজতন্ত্রের প্রতি গান্ধীজির এই বিরাগকে অনেক সময়েই অহেতুক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমেই বর্তমান অর্থনীতি-শাস্ত্রের একটি অমার্জনীয় ত্রুটির প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। এ যুগের অর্থনীতি বড়ো সহজে রাষ্ট্রকে জনস্বার্থের ধারক ও বাহকরূপে স্বীকার করিয়া লয়। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস, এবং যেহেতু অর্থ-নীতি-শাস্ত্রের জন্ম ইংলণ্ডে[৯] সেই হেতু ইংলণ্ডের শাসনযন্ত্র যেরূপ জনমতের দ্বারা প্রভাবান্বিত, অন্য দেশেও সেইরূপ, এই ভিত্তিহীন ধারণা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। অর্থ নৈতিক সুব্যবস্থার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিয়াই সে খালাস; রাষ্ট্র কী উদ্দেশ্যে আর্থিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহা ফিরিয়া দেখা সে নিজের কর্ম বলিয়া বিবেচনা করে না। আচার্য কণ্ডলিফের (Condliffe) ভাষায় বলিতে গেলে, সে বিশুদ্ধ অর্থনীতিমাত্র, তাহার রাজনৈতিক পটভূমিকা সম্বন্ধে সে বড়ো বেশি সচেতন নয়।[১০] গান্ধীজির অর্থনীতি তাহার রাজনৈতিক পরিবেশ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন। পূর্বে বলিয়াছি, তাঁহার অর্থনীতি রাজনীতিকে পরিশুদ্ধ করিবার একটি উপায় মাত্র। আর্থিক ব্যবস্থা যত জটিল হইবে, রাজনীতির চক্র ততই বিষম হইয়া দাঁড়াইবে, ইতিহাস ইহার প্রমাণ। গান্ধীজি তাঁহার রাষ্ট্রকে যথাসম্ভব জনসাধারণের অধিগম্য করিতে চান;

সেইজন্য আর্থিক জীবনকে সরল ও রাষ্ট্রনিরপেক্ষ করা তাঁহার কল্পনায় অপরিহার্য। তাঁহার আন্দোলন তো কেবল ভারতবর্ষে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নয়, ভারতের দীনতম লোকটিকে 'স্ব-রাজ' (self-rule) দিবার জন্যও। বৃহৎ শিল্পকে প্রাধান্য দিতে গেলে হয় ধনিক শ্রেনীকে, নয় রাষ্ট্রকে ক্ষমতা দিতেই হইবে। তাহাতে আর্থিক সমৃদ্ধি যদি বা বৃদ্ধি পায়, ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে। গান্ধীজি তাই শিল্পায়নের (industrialization) অর্থনীতিকে পরিত্যাগ করিয়া, খদ্দরের অর্থনীতিকে (Economics of Khadi) ভারতবর্ষের জন্য আবিষ্কার করিলেন।[১১] এ অর্থনীতির কোন কেন্দ্র নাই, ইহা এক লক্ষ স্বাবলম্বী পল্লীসমাজে ব্যাপ্ত।[১২] এখানে উৎপাদন ও বণ্টন এক যোগে সম্পন্ন হইয়া যাইবে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য বাহিরের মুখ চাহিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। এখানে আর্থিক জীবনে রাষ্ট্রিক সহায়তা কিংবা নিয়ন্ত্রণ, দুইই অনাবশ্যক। গান্ধী-অর্থনীতির এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন থাকিতে হইবে। গান্ধীজির মতে, রাষ্ট্রের ভিত্তিকে অহিংস করিতে গেলে, বৃহদাকার যন্ত্রশিল্পকে পরিত্যাগ করিয়া বিকেন্দ্রীকৃত শিল্পব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। বৃহৎ শিল্প শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং, যদি তাহা রাষ্ট্রের অধীনেও হয় তথাপি জনসাধারণকে শাসনদণ্ড দ্বারা পরিচালিত করিতে সে বাধ্য। ইহার ফলে সমাজে হিংসা ও দ্বেষের বৃদ্ধি পাইবে এবং স্থায়ী সামাজিক শৃঙ্খলার আশা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিবে। কোনোরূপ সমাজতন্ত্রের মধ্যেই এই মূল ব্যাধির ঔষধ তিনি খুঁজিয়া পান নাই। তাই তিনি বলিতেছেন,

"যদি ভারতবর্ষকে অহিংসার পথে বিকাশ লাভ করিতে হয়, তবে তাহাকে অনেক কিছুই বিকেন্দ্রীকৃত করিতে হইবে। প্রভূত শক্তির সাহায্য ব্যতীত কেন্দ্রীকরণকে রক্ষা করা চলে না। গরীবের কুটির হইতে হরণ করিবার কিছু নাই, তাই তাহাকে পাহারা দিবারও প্রয়োজন নাই; কিন্তু ধনীর প্রাসাদকে দস্যুদলের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শক্তিমান্ প্রহরীর প্রয়োজন।"[১৩]

প্রচলিত অর্থনীতি যেমন রাজনৈতিক পটভূমিকাকে প্রাধান্য দিতে অস্বীকার

করিয়াছে, তেমনি বিভিন্ন দেশের সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলিকেও সে আমল দেয় নাই। গান্ধীজির অর্থনীতি সামাজিক ধারাটির সহিত সংযোগ রাখিতে ব্যগ্র। ভারতবর্ষে এই সামাজিক ধারার দুইটি বৈশিষ্ট্য একটু লক্ষ্য করিলেই চোখে পড়ে। প্রথমত, ভারতবর্ষ কোন দিনই সীমাহীন ভোগের আদর্শকে মানিয়া লয় নাই এবং যে কোন প্রকারে উপভোগের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হইবে, এই আদর্শ তাহার কোনো দিনই ছিল না। বরং ভোগকে একটা যুক্তিনির্ধারিত গণ্ডীর মধ্যে রাখিতেই সে চিরকাল চেষ্টা করিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শের এই পার্থক্য লইয়া অনুকূল ও প্রতিকূল, এই উভয় প্রকার সমালোচনাই যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি করিবার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু এই প্রসংগে ভারতবর্ষের জীবনযাত্রার সারল্য লইয়া সময়ে সময়ে যে উচ্ছ্বাস প্রদর্শন করা হয়, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ সামাজিক চিত্র আমরা আজও পাই নাই, পাইব সে ভরসাও বড়ো বেশি নয়। আভাসে ইংগিতে যেটুকু চোখে পড়ে তাহাতে হিন্দুরাজত্বের স্বর্ণযুগে কোন কোন শ্রেণীর ভোগ্যসামগ্রীর বাহুল্য লক্ষ্য করা বোধ হয় খুব দুরূহ নয়। সে যুগে ভারতবর্ষে শ্রেণী-বৈষম্য কী রূপ ছিল, শ্রেণী-চৈতন্যের বিকাশ ঘটিয়াছিল কিনা, এবং তাহা কোন্ পথ অনুসরণ করিয়াছিল—ইত্যাদি নানারূপ প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করিয়াছে, কিন্তু প্রচলিত ইতিহাস এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব।

পক্ষান্তরে, প্রচলিত অর্থনীতি সম্বন্ধে যাঁহারা Ruskin বা Carlyle-এর গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বিরূপ ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ইহার আদর্শকে সীমাহীন ভোগের আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লইতেছেন। আধুনিক অর্থনীতি এই বিকৃত ধারণাকে পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এ তথ্য হয় ইঁহাদের অজানা, নয় তো ইঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রভেদটাকে এতই বড়ো করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত যে আধুনিক অর্থনীতির এই মহত্তর আদর্শবাদেও ইঁহারা তুষ্ট নহেন। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে আধুনিক অর্থনীতি দিশাহারা নাবিকের মতো—কোন্ দিকে চলিতে হইবে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ তাহার জানা নাই;

কিন্তু মানুষের যথার্থ মূল্য যে তাহার ভোগ্যবস্তুর পরিমাণ দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না, এ সত্যকে সে বর্তমানে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

ভারতীয় সমাজধারার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তাহার গ্রামমুখীনতা। ভারতীয় সভ্যতার চরম উন্নতির সময়েও তাহার এই বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয় নাই। নাগরিক জীবন ছিল রাজা ও রাজনীতিকে কেন্দ্র করিয়া; তাহার সহিত দেশের অর্থ নৈতিক সংস্থার কোনো ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল না। ভারতের কৃষি ও শিল্প ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। তাহার গ্রামসংঘগুলি ছিল অর্থ নৈতিক ব্যাপারে অন্যনিরপেক্ষ। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাহারা নিজেরাই উৎপন্ন করিয়া লইত, এবং উৎপাদন ও বণ্টনের কাজ একযোগে, অতি সহজে সম্পন্ন হইয়া যাইত। ইহাতে শাসন ও শোষণের সুযোগ ছিল নিতান্তই অল্প; নানা রাজনৈতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জীবিকা উৎপাদন ও জীবিকা নির্বাহের কার্য অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারিত।

গান্ধীজির বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থ নৈতিক রূপ আবার এই আকার ধারণ করিবে। পূর্বে আমরা রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের প্রতি গান্ধীজির যে বিরাগ লক্ষ্য করিয়াছি, এখানে তাহার কথা পুনরায় স্মরণ করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ ভারতের যে রূপটি গান্ধী-কল্পনায় ধরা দিয়াছে তাহাতে আর্থিক জীবন ও রাজনৈতিক সংস্থার পারস্পরিক সংযোগ অতি ক্ষীণ। তাঁহার গ্রামসমাজ প্রাচীন পঞ্চায়েৎ শাসনের আদর্শে চালিত হইবে। বিভিন্ন গ্রামমণ্ডলীর মধ্যে সংযোগ থাকিলেও, তাহা হইবে প্রধানত সাংস্কৃতিক ও ইচ্ছাধীন সংযোগ। তাহার মধ্যে আবশ্যিকতার কোনো উপাদান থাকিবে না। ইহাদের সমবায়ের ফলে যে রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবে, তাহা হইবে জনমণ্ডলীর ইচ্ছার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার মধ্যে "দণ্ডনীতি, ভেদনীতি, কূটনীতি" প্রভৃতির একান্তই স্থানাভাব। পক্ষান্তরে এই সম্মিলিত রাষ্ট্র হইবে জনসাধারণের স্বাধীন সমবায়-ইচ্ছার (will to co-operate) প্রতীক। রাষ্ট্রীয় দণ্ড-ক্ষমতার ব্যবহার ক্রমে লোপ পাইয়া এক স্বাধীন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে; ইহাই হইবে জনসাধারণের প্রকৃত 'স্ব-রাজ'। প্রচলিত অর্থনীতির সহিত গান্ধীজির মতদ্বৈধের একটি প্রধান কারণ এখানে

খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। প্রচলিত অর্থনীতি যেমন অর্থ নৈতিক জীবনকে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে রাখিতে উৎসুক, গান্ধীজি তেমন নন। রাষ্ট্র তাঁহার কাছে দণ্ডশক্তি ও হিংসার প্রতীক; তিনি এক উন্মুক্ত, স্বেচ্ছাধীন সমাজের বিকাশ দেখিতে চান। সেইজন্য প্রচলিত অর্থনীতি যখন আর্থিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র-শাসনের হাতে তুলিয়া দিয়া সামাজিক উন্নতি ও ব্যক্তিগত শ্রীবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিতেছে, তখন গান্ধীজি বলিতেছেন, 'অহিংস সমাজবিকাশের পথ ইহা নয়। সমাজের গঠনকে রাষ্ট্রশক্তির মুঠিতে ফেলিও না! আর্থিক ও সামাজিক জীবনকে ইচ্ছা ও নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ কর, রাজদণ্ডের দ্বারা নয়।' সংক্ষেপে বলিতে গেলে, প্রচলিত অর্থনীতি যে-সমাজদর্শনে বিশ্বাস করে, গান্ধীজি তাহা করেন না। সেইজন্য ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক কল্পনার মধ্যে রাষ্ট্রশাসনের স্থানকে যথাসম্ভব স্বল্পপরিমিত করিবার জন্যে গান্ধীজির এই প্রয়াস; এবং তাঁহার বিশ্বাস ভারতবর্ষ যে-সমাজব্যবস্থাকে এত দিন সযত্নে লালন করিয়া আসিয়াছে, তাহার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হইলে কেবল মাত্র আর্থিক সমৃদ্ধির মোহে তাহাকে সে ত্যাগ করিতে পারিবে না।

এইরূপে গান্ধী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রচলিত অর্থনীতির ত্রুটি কতটুকু এবং গান্ধীজির নিজের সন্দেহবাদিতার (Scepticism) জন্যই তাঁহার এই অর্থ নৈতিক নৈরাজ্যবাদের উদ্ভব হইয়াছে কিনা, তাহা বিচারসাপেক্ষ। পরবর্তী অধ্যায়ে ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে, কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতি যে তাহার রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজনৈতিক পরিবেশ সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন নয়, এ কথা অস্বীকার করা চলিবে না।

রাষ্ট্রকেন্দ্রিক অর্থনীতির বিরুদ্ধে গান্ধীজির অভিযোগ যেমন অভিনব ও তাৎপর্যপূর্ণ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঠিক তেমন নয়। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অবাধ ধনতন্ত্রের পরিপোষক, এরূপ ধারণা করিলে তাঁহার সমগ্র জীবন-সাধনার প্রতি অবজ্ঞা দেখানো হইবে।[১৪] বস্তুত, ধনতন্ত্রের লাভপিপাসার

প্রতি তাঁহার বিরাগের অন্ত নাই। কিন্তু যে-হেতু ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধনতন্ত্রের বহু সমালোচনা ইতিপূর্বে হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য গান্ধীজির সমালোচনার মধ্যে আমরা আর নূতন কোনো যুক্তিধারা খুঁজিয়া পাই না। তাই বলিয়া ভারতবর্ষে রাষ্ট্রনিরপেক্ষ ধনতন্ত্র কায়েম হইয়া বসুক, ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার অভিপ্রেত নয়। ধনতন্ত্রের মনস্তত্ত্ব তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে যেরূপভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার অর্থ নৈতিক মতবাদ সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। তিনি বলিতেছেন,—

"না ঠেকিলে কি মিল-মালিক দেড়া বা দ্বিগুণ লাভ করিতে ছাড়ে ? তাহাদের ব্যবহারে কোনো ঘোর কপটতা নাই, তাহারা চায় টাকা। অতএব দেশের দিকে চাহিয়া তাহারা কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণ করে না।"[১৫]

অতএব, ধনতন্ত্রের দুরন্ত লাভ-পিপাসা, এবং তাহা হইতে গুরুতর ধনবৈষম্যের সৃষ্টি। এক সময়ে অর্থনীতি-শাস্ত্র ধনতন্ত্রের প্রভাবে এমন আচ্ছন্ন ছিল যে, এই ধনবৈষম্য ও অসম বণ্টনকে সে স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, ইহার বিরুদ্ধে বলিবার মতো কোনো কথা তাহার ছিল না। প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধেও গান্ধীমতাবলম্বীদের অনেকে এই অভিযোগ আনয়ন করিয়া থাকেন। যন্ত্রের বিরুদ্ধে, বড়ো কলকারখানার বিরুদ্ধে তাঁহারা ধনবৈষম্য সৃষ্টির অভিযোগ আনিয়া থাকেন। এ অভিযোগকে কিছুটা কালাতিক্রমণ-দোষে দুষ্ট (anachronistic) বলিয়া মনে করি। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রচলিত অর্থনীতি অধুনাতন কালে ধনবণ্টনের সমস্যাগুলিকে আর অবহেলা করিতে পারিতেছে না। কেন্দ্রীভূত ধনতন্ত্র বিপুল ধনবৈষম্যের সৃষ্টি করে, এ অভিযোগ যেমন সত্য, আধুনিক করনীতি ও রাষ্ট্রীয়করণের নীতি সেই ধনবৈষম্য দূর করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে, এ কথাও সমান সত্য। এ পথে বাধাবিঘ্ন যথেষ্ট, এ পথে পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠার আশা অবাস্তব, কিংবা এ পথে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না, সে কথা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু সাম্য-সংস্থাপন করিতে গিয়া যদি আর্থিক সমৃদ্ধিকে খর্ব করিতে হয়, তাহা হইলেই বিচারের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে আমরা সাম্যস্থাপনের

উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারিব কিনা, ইহাই এ প্রসংগে প্রধান বিচার্য। গান্ধীজি যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রে স্বাভাবিক নিয়মে সাম্য গড়িয়া তুলিতে চান, প্রচলিত অর্থ-নীতি তাহাকেই সাম্যস্থাপনের এক মাত্র উপায় বলিয়া মনে করে না। সেইজন্য গান্ধীজি যখন আর্থিক সমৃদ্ধি ক্ষুণ্ণ করিয়া হইলেও আর্থিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ বাঞ্ছনীয় মনে করেন, তখন সাধারণ অর্থনীতিবিদ্ একটু বিজ্ঞের হাসি হাসেন। বলেন, কেন, যান্ত্রিক উৎপাদনের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কি ধনসাম্য সংস্থাপন একান্তই অসম্ভব ? বণ্টনের ভার কি রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব নয় ? গান্ধীজি বলিবেন, সম্ভব হইলেও এ ব্যবস্থা সুচারু নয়। ইহার মধ্যে আবার রাষ্ট্রনীতির ঘোরালো ব্যবস্থার প্রয়োজন কি ? গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে এরূপ পরমুখাপেক্ষিতার স্থান নাই। গান্ধীজির কল্পনার যে চিত্রটি আমরা পাইয়াছি, তাহাতে সাম্য আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবে ; সেখানে সাম্যই হইবে আর্থিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি। অর্থ নৈতিক বৈষম্যের উদ্ভব হওয়াই সেখানে দুষ্কর—কাজেই রাষ্ট্রের হাতে সাম্য স্থাপনের ভার দেওয়ার প্রয়োজনও সেখানে অল্প। আর রাষ্ট্রের দণ্ডশক্তির সাহায্যে সাম্য সংস্থাপন করিলেই কি সে সাম্য স্থায়ী হইবে ? তাহার প্রতিঘাতী-শক্তি কি নিরন্তর তাহাকে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিবে না ? তাহার ফলে সমগ্র রাষ্ট্রের আবহ বিষাক্ত হইয়া উঠিবে, সন্দেহের বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে, স্বাধীনতা খর্ব হইবে। ব্যক্তিকে অর্থসংগ্রহের সুযোগ ও প্রলোভন দিয়া পরে তাহার নিকট হইতে দণ্ডবলে অর্থ আদায় করিয়া লইলে সে তো ক্ষিপ্ত হইয়াই উঠিবে। এই মোহ তাহার স্বাভাবিক। অতএব, প্রথম হইতে তাহাকে অফুরন্ত অর্থসঞ্চয়ের প্রলোভন না দেওয়াই ভালো। ব্যক্তিচালিত, যন্ত্রশক্তি-পরিচালিত, প্রতিযোগিতামুলক ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে গান্ধীজির এই অভিযোগ যদিও নূতন নয়, যদিও বর্তমানকালের অর্থনীতিশাস্ত্র ধনবৈষম্যের সমস্যাগুলিকে আর অবহেলা করিতে পারিতেছে না, তথাপি গান্ধীবাদ এই সমস্যাগুলির মূল ভিত্তি ধরিয়া যেরূপ নাড়া দিয়াছে, সেরূপ আর কোনো মতবাদই দেয় নাই। অর্থনীতি-

শাস্ত্র এই ক্ষতের উপর প্রলেপ দিবার চেষ্টা করিয়াছে মাত্র, কারণ লইয়া বড়ো বেশি মাথা ঘামায় নাই। সমাজতন্ত্রবাদও যন্ত্রকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া এ সমস্যার সমাধান করিতে রাজি নয়। একমাত্র গান্ধীজিই সাম্য-সংস্থাপনের মূল সূত্রটিকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সংগে সংগে এ কথাও ভুলিতে পারি না যে, গান্ধীজির এই বিশ্বাসের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাসটি একটি বড়ো জায়গা জুড়িয়া বসিয়া আছে। এই অবিশ্বাসের কারণটিকে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদরূপে আলোচনা করা যাইবে।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে গান্ধীবাদের অন্য একটি প্রধান অভিযোগ লইয়া আমরা কিছু আলোচনা করিব। যন্ত্রশিল্পমূলক আর্থিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গান্ধীজির অন্যতম অভিযোগ এই যে, ইহা বেকারসমস্যার সৃষ্টি করে। ধনিক যখন তাহার ব্যক্তিগত লাভের জন্য যন্ত্র ব্যবহার করে, তখন ইহার ফলে কাহার জীবিকা বিনষ্ট হইল, সে সংবাদ রাখা সে প্রয়োজন মনে করে না। সেইজন্য গান্ধীজির কল্পনায় ভবিষ্যৎ কালের ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্পমূলক আর্থিক ব্যবস্থার স্থান অল্প। দেশের প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী যাহাতে কাজ করিতে পারে, যাহাতে যন্ত্র আসিয়া মানুষের স্থান অধিকার না করে, গান্ধীজির অর্থ নৈতিক মতবাদের ইহা অন্যতম প্রধান অংগ। তাঁহার বিশ্বাস, অন্নবস্ত্রের মতো দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য।[১৬] সেইজন্য যন্ত্রের সহায়তায় মানুষের অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধান হইলেই তিনি সন্তুষ্ট নহেন। মানুষের কর্মপ্রবণতাকে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া দিলেই যে সে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, এমন কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। সেইজন্য মানুষের কর্মক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর।[১৭] আর সেই উদ্দেশ্যে তিনি যন্ত্রশিল্পের চারিদিকে গণ্ডী টানিয়া তাহাকে মানুষের কর্মের সহায়ক করিতে চান,—যন্ত্র যাহাতে মানুষকে কর্ম হইতে বঞ্চিত করিতে না পারে, মানুষের জীবিকার উপায় রুদ্ধ করিতে না পারে, এমন ব্যবস্থা করাও

তিনি প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। সেইজন্য ভবিষ্যতের ভারতবর্ষে প্রতি গ্রামে সমৃদ্ধ কুটিরশিল্প গড়িয়া উঠুক, গ্রামের লোক তাহাতে যোগ দিয়া একাধারে কাজের আনন্দ এবং জীবিকা অর্জন করুক, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। মুষ্টিমেয় কয়েকটি নগরে যন্ত্রশিল্প প্রসার লাভ করুক, এবং তাহার ফলে গ্রামবাসীর শিল্পোদ্যোগ হীনবল হইয়া পড়ুক, গ্রামের লোক বেকার হোক—ইহা তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। যন্ত্রশিল্পের প্রসার এমন একটি সীমার মধ্যে রাখা কর্তব্য, যাহাতে কেহ জীবিকা অর্জনের উপায় হইতে বঞ্চিত না হয়। গান্ধীজির মতবাদের এই দিকটিকে বিশ্লেষণ করিলে ইহার মধ্যে দুইটি ধারা অতি সহজে লক্ষ্য করা চলে। প্রথমত, অবাধ যন্ত্রোদ্যোগের ফলে সাধারণ লোকের জীবিকার উপায় যেন বিনষ্ট না হয়। সম্ভবত, একমাত্র অবাধ রাষ্ট্রশাসন-হীন (laissez-faire) ধনতন্ত্রের আমলেই ইহা সম্ভব। ধনতন্ত্রের প্রথম যুগে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। সে সময়ে ধনিকশ্রেণী লাভের সাধনায় জড়শক্তির সহায়তা পাইয়া মানুষকে কেবল বস্তু উৎপাদনের অন্যতম অপ্রধান যন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করিতেন। তাহার ফলে সাধারণ শ্রমিক, ছোটো শিল্পী, গ্রাম্য কারিগর—ইহাদের দুর্গতির আর সীমা ছিল না। কিন্তু সেই প্রথম যুগ হইতেই ধনতন্ত্রের অবাধ তাণ্ডবের বিরুদ্ধে মানুষের শুভবুদ্ধি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যুগের বিদ্রোহী অর্থনীতিবিদ্ Sismondi-র মুখে আমরা তাহারই বাণী শুনিতে পাই। তিনি বলেন,

"যন্ত্রোদ্যোগের আশু ফল হইল কিছু লোককে বেকার করা এবং তাহাদের প্রতিযোগিতার ফলে সমগ্র শ্রমিক সমাজের বৃত্তি (wages) হ্রাস করা; যন্ত্র কেবল তখনই শুভপ্রদ, যখন সে কাহাকেও কর্মচ্যুত না করে, কিংবা কর্মচ্যুত করিলেও যখন তাহার জন্য অন্য কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে।"[১৮]

সেইজন্য যন্ত্রবিস্তারের গতিকে শ্লথ করিয়া দিবার জন্য তিনি রাষ্ট্রের নিকটে আবেদন জানাইয়াছিলেন। ধনিকশ্রেণীর অসংযত লাভপিপাসাকে রাষ্ট্র শাসন করুক, ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। গান্ধীজি তাঁহার বাণী

প্রেরণ করিলেন, রাষ্ট্রের নিকটে নয়, সমস্ত চিন্তাশীল, সংবেদনশীল মানবসমাজের কাছে। মানুষকে বলি দিয়া যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার প্রয়াসকে তিনি ধিক্কার দিলেন।

কিন্তু শ্রেণীস্বার্থ-প্রণোদিত যন্ত্রোদ্যোগকে ধিক্কার দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। যন্ত্রের বিস্তার হোক, মানুষ বেকার বসিয়া থাকুক, রাষ্ট্র তাহার জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দিক—এই আধুনিক অর্থ নৈতিক চিন্তাধারাও তাঁহার মনঃপূত হইল না। যন্ত্র যাহাতে মানুষের স্বাভাবিক কর্মজীবন যাপনের অন্তরায় হইয়া না দাঁড়ায়—ইহাও তাঁহার পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্যবস্তু হইয়া দাঁড়াইল। পূর্বে যে গান্ধী-মতবাদের দুইটি ধারার উল্লেখ করিয়াছি, ইহাই তাহার দ্বিতীয় ধারা। বেকার ব্যক্তির জীবিকার ব্যবস্থা না হয় রাষ্ট্র করিয়া দিল, কিন্তু তাহাকে কাজ দিবে কে? এই যে মানুষের স্বাভাবিক কর্মজীবন যাপনের পথে বাধা দিয়া পরে তাহাকে রাষ্ট্রের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতে বাধ্য করা, ইহা তো অতি "অস্বাভাবিক, অবনতিকর এবং ক্ষতিজনক ব্যবস্থা"।[১৯] কর্মীকে তাহার জীবিকা দেওয়াই তো যথেষ্ট নয়, তাহাকে উপযুক্ত কর্ম দিবারও প্রয়োজন আছে। সেইজন্য, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সমাজতন্ত্রেও যন্ত্রশিল্পপ্রধান আর্থিক ব্যবস্থার পক্ষে গান্ধীজির সমর্থন পাওয়া কঠিন। বিশেষত, ভারতবর্ষের মতো জনসংখ্যা-প্রপীড়িত দেশে। এক রচনায় তিনি বলিতেছেন,

"যখন কোনো আবশ্যক কার্যের পক্ষে কর্মীর সংখ্যা অত্যল্প, তখন যন্ত্র-ব্যবহার কাম্য বটে। কিন্তু যখন কর্মের তুলনায় কর্মীর সংখ্যা অতিমাত্রায় বেশি, তখন যন্ত্র অতীব অনিষ্টকর। যেমন, ভারতবর্ষে। আমাদের সমস্যা তো লোকের অবসর বাড়ানো নয়; তাহাদের উদ্বৃত্ত সময়ের সদ্ব্যবহার করিবার উপায় আবিষ্কার করাই আমাদের অভিপ্রায়।"[২০]

সেইজন্য ভবিষ্যৎ ভারতের যে চিত্রটি তিনি কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে বিরাট কলকারখানা, কিংবা যান্ত্রিক চাষের স্থান নাই। সে চিত্রে প্রত্যেক পল্লীমণ্ডলী যেমন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দিক দিয়া স্বাবলম্বী হইবে,

সেই রূপ প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তিকে উপযুক্ত কার্যেরও ব্যবস্থা করিয়া দিবে। সে অবস্থায়ও যদি কাহাকেও কর্মহীন থাকিতে হয়, অর্থাৎ পল্লীসমাজের সমস্ত অভাব মিটাইবার জন্য যদি সমাজের সকল লোকের শ্রম আবশ্যক না হয়, তাহা হইলে কি হইবে, সে সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ পাইতেছি না। কিন্তু যন্ত্রকে আর্থিক জীবন হইতে ছাঁটিয়া ফেলিলে, এরূপ অবস্থার সহজে উদ্ভব হইবার কথা নয়।

বেকার সমস্যা সম্বন্ধে গান্ধী মতবাদের এই দ্বিতীয় ধারাটিকে লইয়া সম্প্রতি বেশ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক দাঁতেওয়ালা (Dantwalla) তাঁহার Gandhism Reconsidered গ্রন্থে এই প্রসংগ লইয়া বিশদ আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রধানত এই যুক্তির উপরে গান্ধীবাদকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের জীবনযাত্রার মান যতই বাড়ানো হোক, কিংবা তাহার অবসরকাল যতই বাড়ানো যাক, দেশের সমস্ত সমর্থ জনসাধারণকে কাজ দিতে হইলে যন্ত্রের ব্যবহার সীমাবদ্ধ করিতেই হইবে। সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে শিল্পবৃদ্ধির গতির সংগে সংগে মানুষের ক- জীবনযাপনের সুযোগ কমিয়া যায়। ইহা শুধু ধনতন্ত্র-পরিচালিত আর্থিক ব্যবস্থারই রীতি নয়। সমাজতন্ত্র-সম্মত আর্থিক ব্যবস্থাও যন্ত্রশিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়—এবং এ সমস্যার সমাধান শুধু ক্ষুদ্র আকারের কারখানা ইত্যাদির মধ্য দিয়াই সম্ভব। অর্থাৎ যন্ত্রশিল্প বর্তমানে এত উন্নত (?) হইয়াছে যে বহু লোককে কর্মহীন রাখিয়াও সে তাহাদের ভোগ্য সামগ্রী উৎপাদনের কাজ পরিপাটিরূপে সম্পন্ন করিতে পারে। কাজেই সমাজের সকল মানুষকে যদি ক্ষমতা-অনুযায়ী কর্ম করিবার সুযোগ দিতে হয়, তবে বৃহৎ-যন্ত্রাশ্রয়ী সমাজতন্ত্রও তাহা পারিবে না। সেইজন্য বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষুদ্র কারখানা, ছোট জমিতে ব্যক্তিগত চাষ আবার প্রবর্তন করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের আর্থিক সংগঠনে বৃহৎযন্ত্রাশ্রয়ী নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলে সকল

সমর্থ মানুষকে উপযুক্ত কাজ দেওয়া সম্ভব হইবে না, এরূপ কথা আরও অনেকে বলিয়াছেন। অধ্যাপক ওয়াডিয়া এবং মার্চেণ্ট তাঁহাদের Our Economic Problem নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে বৃহদাকার শিল্পের প্রসার দ্বারা উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত হইলেও, কর্মলাভের সুযোগ হইবে অতি সামান্য। তাঁহারা বলিতেছেন,

"স্বাভাবিক জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে কর্মপ্রার্থী লোকের যে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিবে, বৃহদাকার শিল্প তাহাদের সকলকে কর্ম সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে না। ১৯৩৯ সনে ভারতবর্ষের বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ছিল মাত্র কুড়ি লক্ষ, অথচ ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে। এই বাড়তি লোকগুলিকে শিল্পের মধ্যে নিযুক্ত করিতে কী বিপুল ও দ্রুত শিল্প-প্রয়াসের প্রয়োজন, তাহা অনুমেয়। আর যে সব চাষী বৎসরের অধিকাংশ সময় বেকার বসিয়া থাকে, তাহাদের জন্য শিল্পে স্থান সংগ্রহ করা তো অসম্ভব ব্যাপার।" অতএব, ছোটো আকারের বহুব্যাপ্ত কুটিরশিল্প ব্যতীত ভারতবর্ষের বিরাট্ জনসমষ্টিকে কর্মসংস্থান করিয়া দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

এই প্রসংগে একটি কথা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। যন্ত্রশিল্পের আনুষঙ্গিক বেকার সমস্যা গান্ধীজির মনে যেরূপভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা শুধু অর্থ নৈতিক সমস্যা নয়, তাহাতে ব্যক্তিনীতির একটি গুরুতর প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে। বস্তুত, যদি বৃহদাকার যন্ত্রের সাহায্যে ভোগ্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয় এবং রাষ্ট্র তাহা সকলের মধ্যে যথাযথভাবে বণ্টন করিয়া দেয়, তবে আমাদের অনেকেরই তাঁহাতে আপত্তি না-থাকিবারই কথা। আলাদিনের প্রদীপের কথা মানুষ কি এত সহজেই ভুলিতে পারে! কিন্তু বিনা শ্রমমূল্যে এই যে উপভোগ, ইহাকে গান্ধীজি ক্ষমা করিতে পারেন না। দেহকে যথাযথরূপে খাটাইয়া লওয়াকে গান্ধীজি তাঁহার অর্থনীতির এক প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করেন।[২১] তাঁহার মতে,—

"শরীর-যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করিয়া যে অন্নগ্রহণ করে, সে চুরি করে। চরকা শরীর-যজ্ঞের শুভ সাধন।"[২২] অন্যত্র তিনি বলিতেছেন,

"কলকব্জা মানুষের হাতের কাজ কাড়িয়া লইবে, আর কাজের অভাবে মানুষের হাত-পা নিষ্কর্মা ও আড়ষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।"[২৩]

সেইজন্য কেবলমাত্র ধনিক-শ্রেণীর নির্মম যন্ত্রোদ্যোগকেই তিনি নিন্দা করেন নাই, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সমাজতন্ত্রে যন্ত্রের অবাধ ব্যবহার এবং তাহার ফলে বহু সমর্থ লোকের কর্মচ্যুতিকেও তিনি ক্ষমার চোখে দেখিতে পারেন নাই। ইহার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং রাষ্ট্রই এই বেকার শ্রমিকদের জীবিকার সংস্থান করিবে, এই যুক্তিতে তাঁহার মন সায় দেয় নাই। দারিদ্র্য অপেক্ষা কর্মহীনতাকে তিনি কম খারাপ মনে করেন না। দারিদ্র্যের মতো বাধ্যতা-মূলক বেকারত্বকেও তিনি নৈতিক অবনতির সোপান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বৃহৎ শিল্প ব্যক্তি-চালিতই হোক আর রাষ্ট্র-ব্যবস্থিতই হোক, ভারতবর্ষের অগণিত জনসমষ্টিকে উপযুক্ত কর্মজীবন যাপনের সুযোগ দিতে পারিবে না, এরূপ আশংকা তাঁহার বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার যুক্তির ভিতরে ধনতন্ত্রের অবাধ যন্ত্রবিস্তারের আশংকাটাকেই প্রধান বলিয়া মনে হইয়াছে। বস্তুত, পূর্বে যে গান্ধী চিন্তাধারার দুইটি বিভিন্ন গতির কথা উল্লেখ করিয়াছি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুক্তির মধ্য হইতে ইহাদিগকে পৃথক করিয়া লওয়া অসম্ভব। সেইজন্য সমাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া গান্ধীজির এই বিপুল কর্মচ্যুতির আশংকাকে অমূলক ও অবাস্তব বলিয়া মনে হইয়াছে। এ স্থলে এ কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, গান্ধীজির চিন্তাধারা যখন গঠিত হইতেছিল,[২৪] তখন ইউরোপ রণবিধ্বস্ত; এবং আমেরিকা ব্যক্তিপ্রধান ধনতন্ত্রের তাড়নায় Rationalization-এর ধ্বজা তুলিয়া বহু লোককে কর্মচ্যুত করিয়াছে। উহা ধনতন্ত্রেরই এক অস্বাভাবিক অবস্থা, সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে এ অবস্থার উদ্ভব হওয়া তো একান্তই অসম্ভব।

ধনতন্ত্রের এই বেকার-সমস্যা ব্যাধি লইয়া আধুনিক কালের অর্থনীতিশাস্ত্র ব্যতিব্যস্ত; এই ব্যাধির কারণ ও রাষ্ট্রের সহায়তায় কিরূপে তাহার প্রতিকার হইতে পারে, বর্তমান যুগের অর্থনীতির তাহা এক প্রধান সমস্যা।[২৫] পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র যে এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইবার পূর্বেই মানুষের 'কাজ করিবার অধিকার'[২৬] (Right to work) মিটাইবার চেষ্টা করিবে, ইহা বোধ হয় ধরিয়া লওয়া চলে। কাজেই যন্ত্র আসিয়া মানুষের কাজ আত্মসাৎ করিয়া ফেলিবে এবং মানুষ শুধু নিষ্কর্মা হইয়া রাষ্ট্রের হাত হইতে দান (dole) গ্রহণ করিবে, এরূপ অস্বাভাবিক ব্যবস্থা কোনো রাষ্ট্রেই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। যন্ত্রের ব্যবহার হ্রাস করিয়া হোক, কিংবা অন্য কোনো উপায়েই হোক, রাষ্ট্রকে মানুষের পরিপূর্ণভাবে বাঁচিবার সুযোগ করিয়া দিতেই হইবে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং প্রয়াস দুইই ব্যাপকতর হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। এ কথাও সত্য যে এরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন হইবে বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশি[২৭], এবং সে সহযোগিতা বর্তমান রাষ্ট্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে বিকাশ লাভ করিবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র যন্ত্রের অবাধ ব্যবহার করিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে কর্মহীন, বেকার জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিবে, কোনো সমাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি এই অবাস্তব ধারণা পোষণ করেন কিনা সন্দেহ। সেইজন্য, অধ্যাপক দাঁতেওয়ালা (Dantwala) যে ভিত্তির উপর গান্ধীবাদকে স্থাপিত করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহাকে ঠিক গান্ধীবাদের সপক্ষীয় যুক্তি (raison d'etre) বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। এ কথা হয়তো বলা চলে যে পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্রে বর্ধিষ্ণু জনমণ্ডলীর কর্মসংস্থান করিতে হইলে যন্ত্রের ব্যবহার[২৮] কমাইতে হইবে; কিন্তু সমাজতন্ত্র সে-ভার রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করে। তাহার জন্য নূতন কোনো 'মতবাদের পুনর্বিচার' করা সে আবশ্যক মনে করে না।

সমাজতন্ত্র বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে অক্ষম, গান্ধীবাদকে ঠিক এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা চলে না। বরং সমাজতন্ত্র যে উপায়ে এবং যে সকল

সংস্থার (institutions) ভিতর দিয়া এ সমস্যার সমাধান করিতে চায়, গান্ধীজি সেই উপায় ও সংস্থার সহায়তা গ্রহণে পরাঙ্মুখ, গান্ধীনীতির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য-টুকুই আমাদের চোখে পড়ে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন এক্ষেত্রেও তেমনি গান্ধীজি রাষ্ট্রকে তাঁহার আর্থিক পরিকল্পনা হইতে দূরে রাখিতে চান। তাঁহার আবেদন রাষ্ট্রের নিকটে নয়, সাধারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির কাছে। রাষ্ট্রের সাহায্যে আর্থিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা তাঁহার কাছে বাঁকা পথ (indirect method) বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ মানুষকে যন্ত্রের বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি সাধারণ মানুষকে বেকার-সমস্যার হাত হইতে বাঁচাইতে চান। এই সচেতন ও স্বেচ্ছামূলক নিয়ন্ত্রণকেই তিনি সহজ পথ, এবং, সেইজন্য, একমাত্র পথ বলিয়া মনে করেন। ইহাতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন, কেন না এ পথে বেকার-সমস্যার উদ্ভব হইবার সম্ভাবনাই বিনষ্ট হইয়া যায়। এ যুক্তির ভিতরে রাষ্ট্রবিধির প্রতি গান্ধীজির বিরাগটুকু লক্ষ্য করা দুরূহ নয়। রাষ্ট্রের হাতে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের সমস্ত লোকের কর্মসংস্থানের ভার তুলিয়া দেওয়াকে তিনি অবাঞ্ছনীয় মনে করেন। বরং সরল আর্থিক ব্যবস্থার ভিতর দিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কর্ম নিজেই সংস্থান করিয়া লইবে, কেবল, প্রয়োজন হইলে গ্রামসমাজ তাহাকে সহায়তা করিবে মাত্র—ইহাই গান্ধীজির অভিপ্রায়। সেইজন্য নিয়োগ-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের হাতে সঁপিয়া দেওয়াকে তিনি ভবিষ্যৎ ভারতীয় সমাজের পক্ষে অকল্যাণজনক[২৯] বলিয়া মনে করেন। স্বতন্ত্র ভারতের যে চিত্রটি তিনি কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে অন্নবস্ত্র বা কর্ম সংস্থানের জ কাহাকেও রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না।

অর্থনীতির দিক দিয়া গান্ধীবাদ শুধু যে রাষ্ট্রনিরপেক্ষ আর্থিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে চায়, তাহাই নয়; সামাজিক বিকাশ ও জগতের শান্তিও গান্ধী-অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত। এ প্রবন্ধে তাহার বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন খুব বেশি নয়। এ দিক দিয়া তিনি যন্ত্র-প্রধান আর্থিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে-সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, যেমন, নাগরিক জীবনের অশুভ প্রভাব[৩০],

স্বয়ংসম্পূর্ণ সৃষ্টির আনন্দ হইতে মানুষকে বঞ্চনা,[৩১] কিংবা জীবনের জটিলতা-বৃদ্ধি[৩২]—সে সকল যুক্তি পুরাতন হইলেও তাহাদের গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না। ব্যাপ্তি-কামী, শিল্পপ্রধান আর্থিক ব্যবস্থা মানুষের জাতীয় ভেদবুদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করিয়া কী জটিল রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাও আর কাহারও অবিদিত নয়। তবে নিছক ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যাপ্তি, এবং দুর্বল, পদানত দেশের অধিবাসিবৃন্দকে শোষণ ইত্যাদি সাম্রাজ্যতান্ত্রিক নীতি পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রেও স্থান পাইতে পারে, এরূপ কল্পনাকে স্বতোবিরোধী বলিয়াই মনে হয়। বস্তুত, গান্ধীজির চিন্তাধারার মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধনতন্ত্রের সমালোচনা এবং রাষ্ট্রশাসিত যন্ত্রব্যবস্থার সমালোচনা এরূপ ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে, যে, অনেক সময়ে তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া অনুধাবন করা দুরূহ। কিন্তু লাভমূলক (profit-seeking) আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তে ব্যবহার-মূলক আর্থিক ব্যবস্থার (use-economy) প্রবর্তন যদি প্রকৃতই সম্ভব হয়, তবে অবাধ বিস্তার ও পররাজ্য শোষণ লুপ্ত হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব লইয়া রাষ্ট্রসংকটের সৃষ্টি হওয়ার আশংকাও ক্ষীণতর। ইহার উত্তরে গান্ধীপন্থী হয়তো বলিবেন, কেন্দ্রশাসিত সমাজতন্ত্রকে লোভের পথ হইতে দূরে রাখা অসম্ভব, তাহার ধনিক শ্রেণী লুপ্ত হইলেও তাহার উপরের স্তরে যে শাসক শ্রেণীর উদ্ভব হইবে তাহাদের লিপ্সাকে সংযত রাখিবার কোনো উপায় নাই। স্বর্গত অনাথগোপাল সেন তাঁহার Gandhism and Socialism নামক প্রবন্ধে[৩৩] এই আশংকার প্রতি ইংগিত করিয়া গান্ধীনীতির মর্মকথাটি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, কেন্দ্রশাসিত সমাজতন্ত্রের গতি প্রকৃতিই আমাদের সকল সমস্যার কেন্দ্র-বিন্দু। আগামী কালের ভারতবর্ষ এই মূল সমস্যাটির সমাধান করিয়া যন্ত্র ও মানুষের সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে কি ?

—৩—

স্বতন্ত্র ভারতের অর্থনৈতিক রূপটি গান্ধীজির কল্পনায় কী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা আমরা দেখিলাম। অবাধ ধনতন্ত্রের বিস্তার যেমন তাঁহার

নিকটে অসহনীয়, কেন্দ্রশাসিত যন্ত্রপ্রধান সমাজতন্ত্রের বিস্তারও তেমনি তাঁহার মতে বাঞ্ছনীয় নয়। আধুনিক অর্থনীতি অবশ্য অবাধ ধনতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, কিন্তু ধনতন্ত্রের অবাধ বিস্তার রাষ্ট্রশাসনের দ্বারা নিয়মিত হইলে সর্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারে, এ ধরণের একটি বিশ্বাস তাহার আছে। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে এ বিশ্বাসের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি যে আস্থা এবং রাষ্ট্র ও জনসাধারণের যে একাত্মতা কল্পনা করা হয়, গান্ধীজির সমাজদর্শন তাহার বিপরীত-ধর্মী। অন্যদিকে, বিপ্লবাত্মক সমাজতন্ত্র যেমন রাষ্ট্রের দণ্ডশক্তিকে ব্যবহার করিয়া সাম্য ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে চায়, গান্ধীজি তাহাতেও বিশ্বাসী নন। সেইজন্য, প্রচলিত অর্থনীতি বা সমাজতন্ত্রের সূত্র ধরিয়া ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের যে আর্থিক রূপটি আমরা কল্পনা করি, গান্ধীজির কল্পনা তাহা হইতে ভিন্ন। আর্থিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবার জন্য রাষ্ট্রের সহায়তা গ্রহণ করিতে সাধারণ অর্থনীতিবিদ্ তেমন কুণ্ঠা বোধ করেন না, কিন্তু গান্ধীজির রাষ্ট্রবোধ তাঁহাকে এই বহু-নির্দেশিত পথের উপর আস্থা স্থাপন করিতে বাধা দেয়। সাধারণ বিপ্লববাদী সমাজতন্ত্রী হয়তো শ্রেণীসংগ্রাম ও রাষ্ট্রশক্তির উপর সর্বহারাদের অধিকার বিস্তারের স্বপ্ন দেখিয়াই সন্তুষ্ট, কিন্তু গান্ধীজি ইহাকেই সকল সমস্যার শেষ সমাধান বলিয়া মানিয়া নিতে প্রস্তুত নন। সেইজন্য তিনি ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের আর্থিক সংগঠনকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হইতে বিমুক্ত করিয়া বহুসংখ্যক গ্রামসমাজের মধ্যে বিস্তারিত করিয়া দেওয়াকে অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করেন। এই বিকেন্দ্রীভূত আর্থিক ব্যবস্থা হইবে সরল ও স্বেচ্ছামূলক, ইহা একদিকে মানুষের দারিদ্র্য দূর করিবে এবং অন্যদিকে তাহার উপযুক্ত কর্মের সংস্থান করিয়া দিবে, ইহাই গান্ধীজির বিশ্বাস ও কল্পনা। এই কল্পনার সপক্ষে তিনি ও তাঁহার মতাবলম্বীরা যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা তাহা কিছু-কিছু আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহারই জের টানিতে হইবে। বিগত অধ্যায়ের আলোচনার ভিত্তিতে যন্ত্রব্যবহারমূলক শিল্প-সভ্যতার বিরুদ্ধে গান্ধীবাদের অভিযোগগুলিকে মূলত

দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। প্রথম শ্রেণীর অভিযোগগুলিকে আমরা 'নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক' (relating to control),—এই আখ্যা দিতে পারি। যান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থাকে কে বা কাহারা নিয়ন্ত্রণ করিবে, ইহার আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলির সমাধানই বা কে করিবে, এ অভিযোগগুলি প্রধানত এই সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া। অবাধ ধনতন্ত্র যে উপায়ে যন্ত্রব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করে, তাহাকে সর্বাঙ্গসুন্দর বলিবার উপায় আজ আর নাই।[৩৪] তাহা ধনবৈষম্যের সমস্যা, বেকারত্বের সমস্যা, পৌনঃপুনিক সংকটসৃষ্টির সমস্যা (recurrent crises) ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যার দ্বারা কণ্টকিত। ঠিক এই কারণেই সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ-শক্তিকে আর্থিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার আহ্বান জানাইয়াছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়াছি যে কি ধনবৈষম্যের সমস্যা, কি নিয়োগবৃদ্ধির সমস্যা—সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আধুনিক অর্থনীতি সর্বথা সচেতন। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক অভিযোগগুলিতে গান্ধীনীতির এই বৈশিষ্ট্যটুকু ধরা পড়িয়াছে যে তাহা ব্যক্তি বা রাষ্ট্র কাহারও উপর যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ এবং তাহার আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলির সমাধান ভার অর্পণ করিতে প্রস্তুত নয়। যন্ত্রকে আর্থিক-জীবনে স্থান দেওয়া সংগত কিনা, ইহাই তাহার মূল প্রশ্ন—যদি যন্ত্রের ব্যবহারকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন অবান্তর। সেইজন্য গান্ধীনীতির যন্ত্রবিরোধিতার মধ্যে আমরা একদিকে যেমন ধনতন্ত্রের প্রতি বিরাগ লক্ষ্য করিয়াছি, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির অভাবও আমাদের চোখে পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিযোগগুলিকে প্রভাব-বিষয়ক (relating to influences), এই আখ্যা দেওয়া চলে। ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের উপর শিল্প-সভ্যতার অশুভ প্রভাবগুলিকে গান্ধীজির পূর্বেও অনেকে নিন্দা করিয়াছেন এবং আধুনিক অর্থনীতিও তাহাকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারিতেছে না। কিন্তু গান্ধীজি যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যের (values) উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, অর্থনীতি তাহার সকলগুলির

উপরেই সমান গুরুত্ব আরোপ করে কি না সন্দেহ। এ কথা অনস্বীকার্য।যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মুল্যগুলি অর্থনীতির উপর সামান্য প্রভাব বিস্তার করিতেছে মাত্র, একেবারে তাহার অংগীভূত হইয়া যাইতে পারে নাই। গান্ধী-নীতিতে কিন্তু তাহাদের স্থান সামান্য নয়—তাহারা আর্থিক মুল্যগুলির অপেক্ষা কোনো অংশে কম তো নয়ই বরং কোনো কোনো স্থলে তাহাদের প্রভাবকেই বেশি বলিয়া মনে হইয়াছে। তাঁহার নিজের অননুকরণীয় কথায় তিনি সোজাসুজি বলিতেছেন,

"আমি অবশ্যই স্বীকার করিব, অর্থনীতি ও সাধারণ নীতির (ethics) মধ্যে আমি খুব প্রভেদ দেখি না; যে অর্থনীতি মানুষের নৈতিক উন্নতি ব্যাহত করে, কিংবা জাতীয় জীবনের ক্ষতিসাধন করে, তাহা দুর্নীতিমুলক, তাহা পাপপংকিল।" ৩৫ তাই, যে পথে চলিলে আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু মানুষের দেহ ও মনের ক্ষতি হয়, সে পথ তাঁহার কাছে সর্বথা পরিত্যাজ্য। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মুল্যগুলির প্রতি এই একনিষ্ঠ মনোনিবেশকে গান্ধী-অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

ইহা হইতে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, বিপ্লবসঞ্জাত সমাজতন্ত্র যতই মানুষের সমৃদ্ধি বিধান করুক না কেন, গান্ধী-নীতি তাহাকে কলুষিত বলিয়া মনে না করিয়া পারে না। হিংসার ভিতর দিয়া যাহার জন্ম, হিংসামুলক দণ্ডশক্তিতে যাহার প্রতিষ্ঠা, এবং প্রতিঘাতী শক্তিসমুহকে (reactionary forces) হিংসার দ্বারা দমন করা যাহার অন্যতম প্রধান কর্ম—সেই সমাজ-ব্যবস্থা আর্থিক সমৃদ্ধি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে কিংবা বেকার সমস্যার সমাধান করিতে পারিয়াছে, এ সকল কৃতিত্ব তাহাকে তাহার নৈতিক গ্লানি হইতে মুক্ত করিতে পারে না। বস্তুত, বিপ্লবসঞ্জাত এই আর্থিক ব্যবস্থা প্রকৃত সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, এ বিশ্বাসই তাঁহার নাই। কেন না, "হিংসার ভিতর দিয়া যেটুকু পাওয়া যায়, প্রবলতর হিংসার পীড়নে তাহাও হারাইতে হয়।" ৩৬

সেইজন্য, বল্‌শেভিক-বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন,

"বল্‌শেভিক ব্যবস্থা যে দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারিবে এবং বর্তমান আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে, এ কথা আমি স্বীকার করি না। হিংসার উপর ভিত্তি করিয়া কোন স্থায়ী মূল্যবান সামগ্রী গড়িয়া তোলা চলে না,—ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস।"[৩৭]

অতীত হিংসার প্রভাব মানুষকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে, হিংস বিপ্লবের ভিত্তির উপর সাম্যমূলক আর্থিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা চলে না, ইহা মার্ক্সবাদীদের বিরুদ্ধে গান্ধীবাদের প্রধান অভিযোগ। এ অভিযোগকেও আমরা প্রভাব-বিষয়ক অভিযোগগুলির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইব।

প্রথমে আমরা নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক অভিযোগগুলি লইয়া আলোচনা করিতে চাই। বিগত অধ্যায়ে আমাদের স্বীকার করিতে হইয়াছে যে প্রচলিত অর্থনীতি আর্থিক জীবনকে বড়ো সহজে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া রাখিতে স্বীকৃত হইয়া পড়ে, রাষ্ট্রের সহিত জনসাধারণের সংযোগ কিরূপ, এবং রাষ্ট্র যে উদ্দেশ্যে আর্থিক-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে জনস্বার্থের পরিপোষক কিনা, সে-আলোচনায় অবসর তাহার নাই। সেইজন্য কেন্দ্রশাসিত আর্থিক ব্যবস্থার ব্যাপক সমালোচনা করা তাহার সাধ্য নয়। গান্ধীনীতি ঠিক এই জায়গাটিতেই প্রচলিত অর্থনীতিকে আঘাত করিয়াছে।

কিন্তু এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে প্রচলিত অর্থনীতির সমালোচনার জন্য গান্ধীজির বিশেষ মানসিক সংগঠনটিও বহুল পরিমাণে দায়ী। পূর্ব অধ্যায়ে আমরা এ সত্যের প্রতি ইংগিত মাত্র করিয়াছি। এবার ইহার পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে হইবে।

গ্রাম-কেন্দ্রিক আর্থিক ব্যবস্থার প্রতি গান্ধীজির অনুরাগের অন্যতম কারণ যে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হইতে আর্থিক জীবনকে মুক্ত রাখা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই দৃষ্টিভংগী লইয়া দেখিতে গেলে স্বীকার করিতে হয় যে রাষ্ট্র সর্বদাই দণ্ডশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং হিংসা তাহার ভিত্তি। গান্ধীজি এক জায়গায় স্পষ্টই বলিয়াছেন—"রাষ্ট্র ঘনীভূত এবং সংহত হিংসার প্রকাশ মাত্র।"[৩৮] অতএব, অহিংস সমাজ-গঠনে রাষ্ট্রের কোনো স্থান নাই। রাষ্ট্রের সহায়তায় সাধারণ মানুষের পক্ষে স্ব-"রাজ" লাভের চেষ্টা বৃথা। মানুষকে রাষ্ট্রের সাহায্যে স্বাধীন করা যায় না। অতএব, তাহার আর্থিক জীবনকে রাষ্ট্রের অধীন করিয়া তাহার নিজের স্বাধীন সত্তাটুকু বিপর্যস্ত হইবে মাত্র।

গান্ধীজির রাষ্ট্রবোধের এই বৈশিষ্ট্যটুকু লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহা তাঁহাকে 'দার্শনিক নৈরাজ্যবাদের' (Philosophical anarchism) অন্যতম প্রধান পরিপোষক বলিয়া প্রমাণিত করে। সুতরাং এই মতবাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার্য সকল যুক্তিই গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা চলে। এখানে বিস্তারিত সমালোচনার প্রয়োজন খুব বেশি নয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের রাষ্ট্রবোধ এ মতবাদকে কোনোদিনই গ্রহণ করে নাই, এ কথা বলার প্রয়োজন আছে। সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রকে চিরদিনই 'শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমনে'র যন্ত্র হিসাবে কল্পনা করিয়া আসিয়াছে এবং রাষ্ট্র যখনই তাহার এই কর্তব্য পালনের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তখনই তাহাকে স্ব-পথে আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। সে চেষ্টা যতই সামান্য হোক, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে রাষ্ট্রকে সে জীবন হইতে ছাঁটিয়া ফেলিবার কল্পনাও করিতে পারে নাই, তাহাকে বরং অপরিহার্য বলিয়াই মনে করিয়াছে। রাষ্ট্রের সহায়তায় সমাজ জীবন নানাদিক দিয়া সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধ হইতে পারে, এ বিশ্বাস যদি তাহার না থাকিত, তবে রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করিতে সে রাজি হইত না; রাষ্ট্রকে যৌথ-সমৃদ্ধির উপায় হিসাবে কল্পনা করিয়াই সে এই বশ্যতার যুক্তি-ভিত্তি (rationale) খুঁজিয়া পাইয়াছে। রাষ্ট্রের এই অধীনত্বের মধ্যে যুক্তিমূলক ইচ্ছার (rational will) যে স্বাধীনতা, সমাজবদ্ধ জীবনে মানুষের ইহার চেয়ে বেশি স্বাধীনতার অবকাশ নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত এই স্বাধীনতা-টুকু ক্ষুণ্ণ না হয়, ততক্ষণ মানুষকে রাষ্ট্রের

অধীন হইলেও স্বাধীন বলা চলে, এবং রাষ্ট্রকে দণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত না বলিয়া ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত বলা চলে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-দর্শনের ইহাই ভিত্তি। অধিকার-বাদ (Theory of rights) এবং প্রচলিত বিধি-শাস্ত্র (Constitutional theory) এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ বুদ্ধি হইতেও এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, রাষ্ট্রকে অধিকসংখ্যক মানুষের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে তাহার নির্দেশকে আর হিংসার প্রকাশ বলিয়া মনে করা চলে না। সমাজবদ্ধ জীবন-যাপনের পক্ষে রাষ্ট্রের নির্দেশ মানিয়া চলা সে ক্ষেত্রে অপরিহার্য, কারণ সেই নির্দেশের মধ্যে ব্যক্তির নিজের ইচ্ছাটিকেও যথোপযুক্ত মূল্য দেওয়া হইয়াছে।

সাধারণ মানুষ তাহার ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই স্থূল, লোভী, হিংসক, অনুদার। কিন্তু সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সেই মানুষকেই আবার ন্যায়-অন্যায়ের বোধটুকু যখন ফিরিয়া পাইতে দেখি, তখন 'দার্শনিক নৈরাজ্যবাদের' ত্রুটিটুকু অতি সহজেই চোখে পড়ে। ব্যক্তিকে তাহার ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যে ভালো হইবার উপদেশ দিয়া তাহাকে ভালো করা যত-না সম্ভব, তাহাকে সামাজিক জীবনের বৃহৎ ও উদার ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়া, সামাজিক জীবনের সহিত তাহার সংযোগটুকু উপলব্ধি করিবার সুযোগ দিয়া, তাহাকে উন্নত ও উদার করিয়া তোলা অনেক বেশি সহজসাধ্য। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ইহাই নির্দেশ। রাষ্ট্র কেবল মানুষকে তাহার সামাজিক সংযোগ উপলব্ধি করিতে দিবার উপায় মাত্র; তাহাকে উদারতা ও সমাজবোধ শিক্ষা দেওয়াই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। সেইজন্য মানুষের চরিত্রগত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করিবার জন্য ইচ্ছাভিত্তি রাষ্ট্রের প্রয়োজন একেবারেই অপরিহার্য; 'দার্শনিক নৈরাজ্যবাদ' কেবল পরিপূর্ণ চরিত্রবিশিষ্ট মানুষের সমাজেই সম্ভব। 'দার্শনিক নৈরাজ্যবাদ' ধরিয়া লয় যে মানুষের চরিত্রে উন্নতির আর অবকাশ নাই; ইচ্ছাভিত্তি রাষ্ট্র মানুষকে তাহার ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করিবার সুযোগ দিয়া তাহাকে পথের ইংগিত দেয় মাত্র।

সেইজন্য রাষ্ট্রের সহায়তায় আর্থিক সমৃদ্ধি-বিধান কিংবা সাম্য-সংস্থাপন

গান্ধীজির মনঃপূত না হইলেও, সাধারণ মানুষ যেহেতু রাষ্ট্রকে অধিকাংশ লোকের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করে, সেইজন্য অল্প-সংখ্যক লোকের লোভ, অনুদারতা প্রভৃতি ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করিবার পক্ষে রাষ্ট্রের সহায়তা গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে কোনো প্রবল যুক্তি সে দেখিতে পায় না। বরং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুমোদনক্রমে আর্থিক জীবনকে সংগঠিত করাকেই সে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে। এই ধরণের রাষ্ট্র-নির্দেশের মধ্যে সে যুক্তি দেখিতে পায়, সমাজের অধিকাংশ নর-নারীর ইচ্ছার বিকাশ দেখিতে পায়, কিন্তু গান্ধীজির মতো হিংসার বহিঃপ্রকাশ দেখিতে পায় না।

কেবল যে মানুষের চারিত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতির জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন, তাহা অবশ্য নয়। আর্থিক জীবনে যে সকল সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য তাহাদের সম্বন্ধে সমাজের যৌথ নির্ধারণ প্রকাশ করাও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। যাহাতে ব্যক্তিসম্পত্তির (private property) বিস্তার দ্বারা সাধারণের স্বার্থ-হানি না হয়, সমাজ জীবনের সুশৃঙ্খলার জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক তাহা নির্ধারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ ধরণের নির্ধারণকে দণ্ডশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না বলিয়া সমাজের যৌথ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বিধৃত বলা চলিতে পারে। সুতরাং আর্থিক জীবনের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ অবাঞ্ছনীয় তো নয়ই, তাহাকে এক রকম অপরিহার্যই বলা চলে।

এই প্রসংগে গান্ধীজির বিখ্যাত "উপনিধি-বাদ-তত্ত্বের" (doctrine of trusteeship) কথা স্বতই আসিয়া পড়ে। অতীতকাল হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে সমাজে যে ধনবৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার দূরীকরণ কিরূপে সম্ভব, ইহা এক গুরুতর আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা। সাধারণ অর্থনীতি অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এ ক্ষেত্রেও তেমনি সমাধানের ভার রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিতে উৎসুক। বিপ্লবাত্মক সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রের দণ্ডশক্তির সাহায্যে অলস ধনী-শ্রেণীর উচ্ছেদ সাধন করিতে চায়। কিন্তু গান্ধীজির সমাধান অন্যরূপ। তিনি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে পরিবর্তন আনিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত

সম্পত্তিকে জনসাধারণের ব্যবহারে নিয়োজিত করিবার সম্ভাবনাকে সকলের উপরে স্থান দিয়াছেন। তাঁহাদের সম্পত্তি তাঁহাদের নিকট ন্যাস মাত্র, ইহার ব্যবহার হইবে সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য। গান্ধীজির এই কল্পনায় ব্যক্তি-চরিত্রের পরিবর্তনকে যতটা সুহজসাধ্য মলিয়া মনে করা হইতেছে, বাস্তবিক তাহা ততই সহজসাধ্য কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া লাভ নাই। কেন না, ইহা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রশ্ন। কিন্তু ব্যক্তিকে পরিবর্তনের উপায় নির্দেশ করিয়া দিতে রাষ্ট্রের—অর্থাৎ সংহত সমাজজীবনের—প্রয়োজন কত বেশি, ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ভালো এবং উদার হইবার ব্যক্তিগত ইচ্ছা সত্ত্বেও ব্যক্তির পক্ষে একক ভালো হইবার চেষ্টা যত কঠিন, সামাজিক শৃংখলার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া সংঘবদ্ধভাবে উদারতার শিক্ষা অর্জন করা তাহার চেয়ে সহজতর, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমাজজীবনে রাষ্ট্রের এই স্থানটিকে আমাদের স্বীকার করিয়াই লইতে হইবে।

সমাজবদ্ধ আর্থিক জীবনে রাষ্ট্রের আরও একটি প্রয়োজন আছে। ব্যক্তির আর্থিক সমৃদ্ধি যখন বিঘ্ন ও ব্যাধির দ্বারা ব্যাহত হয়, তখন তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার দায় ও দায়িত্ব সমাজের। যাহারা তাহাকে সাহায্য করিতে সক্ষম, তাহাদের নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অমর্যাদাকর এবং এই সাহায্যে সমাজের সমস্ত সক্ষম ব্যক্তিরই অংশ থাকা উচিত, ইহাও ন্যায্য। সামাজিক সহায়তার এই সংহত প্রকাশের কেন্দ্র হিসাবে রাষ্ট্রের স্থান সকল প্রতিষ্ঠানের উর্ধে। ইহা রাষ্ট্রের হিংসাশক্তি বা দণ্ডক্ষমতার পরিচয় মাত্র নয়, রাষ্ট্রই যে বর্তমান জগতে ব্যাপকতম সংহতির কেন্দ্র, তাহার অন্যতম প্রমাণ। এক সময়ে গ্রাম-সমাজ এই সংহতির মুল কেন্দ্র ছিল, এবং ভবিষ্যতে যে সমস্ত মানবসমাজকে ব্যাপ্ত করিয়া এই ধরণের সংহতি গড়িয়া উঠিবে না, তাঁহারও প্রমাণ নাই। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক ব্যাপকতর সংহতি ক্ষুদ্রতর সংহতি অপেক্ষা মানুষের অধিকতর মংগলবিধান করিবার ক্ষমতা রাখে, সেই হেতু বর্তমান জগতে রাষ্ট্রীয় সংহতিকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। সেই জন্য গান্ধীজি যখন

বলেন যে 'অহিংস সমাজে রাষ্ট্রের স্থান নাই,' কিংবা 'রাষ্ট্রের ভিত্তি সর্বদাই হিংসামূলক', তখন আমরা সে কথা স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। অহিংস সমাজে রাষ্ট্র শুকাইয়া তো যাইবেই না, যাহা আজ কুঁড়ির আকারে আছে তাহা পুষ্পরূপে বিকসিত হইয়া উঠিবে।[৩৯] রাষ্ট্রের দণ্ড-শক্তি লোপ পাইবে, কিন্তু তাহার মংগল-শক্তির প্রয়োজন লোপ পাইবে না।

বস্তুত, গান্ধীজিও তাঁহার সকল রচনায় রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারেন নাই। রাষ্ট্র তাহার দণ্ডশক্তি লইয়াই বজায় থাকিবে, অথচ গ্রামসমাজ বিকেন্দ্রীভূত আর্থিক ব্যবস্থা সংস্থাপন করিবে, ইহাই যেন তাহার অভিপ্রায়। কিন্তু হিংসা-ভিত্তি রাষ্ট্র যদি বহাল তবিয়তে শাসনের কাজ চালাইতে থাকে, তাহা হইলে বিকেন্দ্রীভূত আর্থিক ব্যবস্থার সংস্থাপন ও সংরক্ষণ কি সম্ভব? ইতিহাসে রাষ্ট্র ও আর্থিক জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সর্বদাই লক্ষ্য করিবার বস্তু, সে সংযোগ কখনও বা শাসনের ও শোষণের জন্য, ক্বচিৎ সমৃদ্ধি সাধন ও পোষণের জন্য। রাষ্ট্র ও আর্থিক জীবনের এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ কার্ল মার্ক্স যেমন গভীরভাবে অনুধাবন করিয়াছিলেন, গান্ধীজির রচনায় তাহার নিদর্শন খুঁজিয়া পাই না। রাষ্ট্র যদি আর্থিক জীবনকে পোষণ করিবার জন্য নিয়ন্ত্রণ না করে, তাহা হইলে শোষণ করিবার জন্যও যে নিয়ন্ত্রণ করিবে না, তাহার কিছু নিশ্চয়তা নাই। শোষক-শ্রেণী শোষিত-শ্রেণীকে রাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় কী ভাবে শোষণ করিয়া আসিয়াছে, মার্ক্স তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষায় তাহার প্রতি ইংগিত মাত্র করিয়া গিয়াছেন।[৪০] সেইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের মূল শোষণে এবং হিংসায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ, সমৃদ্ধ, বিকেন্দ্রীভূত আর্থিক জীবনের কল্পনা করা অসম্ভব। ভারতবর্ষে বিকেন্দ্রীভূত গ্রামসমাজ শ্রেণীবুদ্ধি-সম্পন্ন রাষ্ট্রের অবলম্বিত নীতির ফলে হতশ্রী হইয়া পড়িয়া আছে। শুধু ভারতবর্ষে কেন, বিকেন্দ্রীভূত গ্রামসমাজ অন্য দেশেও ছিল, কিন্তু ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ে রাষ্ট্রীয় নীতি তাহাদিগকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। সেই কারণে রাষ্ট্রের শক্তিকে অবহেলা করিয়া কিংবা তাহাকে এক পাশে রাখিয়া কেবল বিকেন্দ্রীকরণকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে কোনো যুক্তি

সংগতি দেখিতে পাই না। রাষ্ট্রের শক্তিকে হিংসার ভিত্তি হইতে, শ্রেণীস্বার্থের ভিত্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া তাহাকে মংগল শক্তিতে পরিণত করাই আমাদের মূল সাধনা। ইহার মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণের স্থান থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা উপায় হিসাবে, উদ্দেশ্য হিসাবে নয়। ইহার মধ্যে যন্ত্রের ব্যবহার হ্রাস করিবার অবকাশ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে গৃহীত হইলে তবেই তাহা সার্থক। রাষ্ট্রনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন কোনো অর্থনৈতিক সংগঠন সহজে সফল হইতে পারে না, এ কথা গান্ধীজি স্বীকার করিবেন না এমন নয়, কিন্তু তাঁহার রচনায় রাষ্ট্রনিরপেক্ষ বিকেন্দ্রীকরণের আভাস বড়ো উগ্র, ইহার অন্তর্নিহিত অসংগতি আমাদিগকে বিভ্রান্ত না করিয়া পারে না।

ঐতিহাসিক উদ্ভবের দিক হইতে দেখিতে গেলে রাষ্ট্রের উদ্ভব যে সমাজের শক্তিকেন্দ্র-রূপে হইয়াছিল, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। সে শক্তির মধ্যে হিংসা, চাতুর্য প্রভৃতির অংশও অল্প ছিল না। কিন্তু সেই দূষিত বীজের মধ্যেও একটি মঙ্গলের কণা নিহিত ছিল—তাহাকে বিকসিত করিয়া তোলাই মানুষের সাধনা। রাষ্ট্রের এই মঙ্গলশক্তিকে সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার পথে বাধাবিঘ্নের অভাব নাই,—সে সাধনা বহু যুগ পূর্বে আরম্ভ হইয়াছে, এবং আজিও তাহার শেষ হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া রাষ্ট্রের এই সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। বরং রাষ্ট্রের কাছে মানব-কল্যাণের দাবী জানাইয়াই তাহাকে হিংসার পথ হইতে ইচ্ছার পথে, শোষণের পথ হইতে পোষণের পথে, কঠিন শাসনের পথ হইতে নিরপেক্ষ পালনের পথে আনয়ন করা সম্ভবপর বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। তাহাকে আর্থিক জীবন হইতে ছাঁটিয়া ফেলিবার চেষ্টা নিরর্থক। তাহার শক্তিকে আর্থিক ও সামাজিক জীবনের পোষণ ও পালনের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস[৪৪]। কিন্তু এ কথাও বারংবার স্মরণ করিতে হইবে যে রাষ্ট্রের শক্তিকে এ পথে চালিত করিবার জন্য অনেক সাধনা, অনেক সংযম এবং (গান্ধীজির ভাষায়) অনেক 'তপস্যা'র প্রয়োজন। আমরা শুধু দেখাইতে চাই যে ব্যক্তিগতভাবে অহিংস হইবার জন্য

যে 'তপস্যা'র প্রয়োজন, সমাজগতভাবে রাষ্ট্রের ভিত্তিকে মানুষের স্বতোবিকশিত ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠা করিবার 'তপস্যা' তাহা অপেক্ষা কঠিন তো নয়ই, বরং অনেক অংশে সহজ।

গান্ধীজির মত বোধ হয় ইহার বিপরীত। এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন, "ব্যক্তির আত্মা আছে, কিন্তু রাষ্ট্র তো নিরাত্মক যন্ত্র মাত্র। রাষ্ট্রকে তাহার জন্মগত হিংসার ভূমি হইতে বিচ্যুত করা অসম্ভব।"[৪৫] ব্যক্তিচরিত্রের পরিবর্তনের উপর এই পরিপূর্ণ আস্থা, অথচ রাষ্ট্রকে কেবলমাত্র নিরাত্মক যন্ত্র বলিয়া মনে করা—ইহার মধ্যে গান্ধীজির মানসিক সংগঠনের সাবশেষে পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই ভিত্তির উপরেই তাঁহার উপনিধিবাদ-তত্ত্ব (doctrine of trusteeship) প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের নির্দেশ যে সমাজের গরিষ্ঠ অংশের ইচ্ছার প্রকাশ হইতে পারে, গান্ধীবাদের মধ্যে এ সত্যের স্বীকৃতি সামান্যই।

ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। গান্ধীবাদ রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতার বাণী বহন করিয়া আনে নাই, তাহার জন্ম অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে, এ কথা মনে রাখিলে রাষ্ট্রের প্রতি গান্ধীজির এই একান্ত আস্থাহীনতার কারণ উপলব্ধি করা যাইবে। রাষ্ট্র যখন কিছুতেই নিজেকে যুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে রাজি হয় না, তখন সমাজের গরিষ্ঠ অংশ যে পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, তাহার নাম বিপ্লব। সে বিপ্লব সহিংস বা অহিংস দুই-ই হইতে পারে। অহিংস বিপ্লবের মধ্যে আর্থিক উৎপাদনকারীদের অসহযোগ একটি প্রধান অংগ, এবং গান্ধীজি বিপ্লবের এই অস্ত্রকে শাণিত করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার রাষ্ট্রনিরপেক্ষ গ্রাম-কেন্দ্রিক অর্থনীতির উদ্ভাবন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া রাষ্ট্রকে কোনোদিনই আমরা যুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না, এ কথা বলা সংগত ও শোভন হইবে না। বিপ্লব সমাজের অস্বাভাবিক অবস্থা; গান্ধীজি ভারতের মূক বিপ্লবকে মুখর করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ হইলেও, বিপ্লবকেই চিরস্থায়ী অবস্থা বলিয়া আমরা মানিয়া নিতে পারি না।[৪৬] ভারতে ইংরেজ-

রাজত্বের অবসান ঘটিলেও ভারতের অগণিত জনসাধারণ তখনও বৈশ্যতন্ত্রের অধীন হইতে পারে—এ আশংকাও আমরা পূর্বেই করিয়াছি; যদি তাহাই হয়, তবে সে সময়ে গান্ধীজির প্রদর্শিত অহিংস বিপ্লবের পন্থা আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণ মানুষকে চিরদিনই রাষ্ট্রের বিরোধিতা সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে আমরা লোকায়ত্ত করিতে কোনোদিনই পারিব না, সংকীর্ণ স্বাবলম্বনই হইবে আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র উপায়, এ কল্পনা অশ্রদ্ধেয়। রাষ্ট্রের মাধ্যমে আমরা বৃহত্তর সহযোগিতার পথ কাটিয়া লইব, রাষ্ট্রকে বৃহত্তর 'পঞ্চায়েতে' পরিণত করিব, ইহাই আমাদের সাধনার লক্ষ্য হওয়া উচিত। গান্ধী-নীতির মধ্যে এই বৃহত্তর সাধনার ইঙ্গিত অতি অল্প।

তথাপি গান্ধীজির আধুনিকতম রচনাগুলির মধ্যে রাষ্ট্রস্বীকৃতির কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। ১৯৩৭ সনে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রাক্কালে তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আছে,

"আমাদের দেশে ধনীর আয়ের উপর যথেষ্ট কর নাই। আমাদের এই দরিদ্র দেশে অধিক ধন সঞ্চয় করা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। অতএব করের পরিমাণ যথাসম্ভব বাড়াইলে ক্ষতি নাই।…আর, মৃত্যু-করই বা থাকিবে না কেন?"[৪৭] ইত্যাদি। এই কথাগুলির মধ্যে রাষ্ট্রের মণ্ডলশক্তিকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদী লেখকদের সমালোচনার ফলে গান্ধীজিকে অনেক শিল্পের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাও স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। তাহার মধ্যে রেলওয়ে ব্যবস্থা, মৌলিক শিল্প (key industries) এবং জনহিতকর শিল্প (public utilities) প্রধান। কিন্তু ভোগ্য-সামগ্রীর উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীভূত এবং রাষ্ট্রশাসনের বাহিরে রাখিতে তিনি দৃঢ়সংকল্প। তথাপি এই বিকেন্দ্রীভূত শিল্পগুলিকে ধনতন্ত্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র-শাসনের প্রয়োজনকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই।[৪৮] যদি এ ব্যবস্থায়

পর্যাপ্ত পরিমাণ ভোগ্য-সামগ্রী উৎপন্ন না হয়, জীবন-যাত্রার মান সমৃদ্ধ না হয় কিংবা নিয়োগ সমস্যার সমাধান না হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র কিরূপে এই বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদন-ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবে, তাহাই এ ক্ষেত্রে ভাবিবার বিষয়। পরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রের পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সাধারণ সমাজতন্ত্রবাদী সমালোচকের মতের সহিত গান্ধীজির মতের পার্থক্য কত সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রের সহায়তায় সমাজতন্ত্রস্থাপন যাঁহারা সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন, গান্ধীজিকে তাঁহাদের অন্যতম বলিতে আমাদের দ্বিধা নাই; অথচ রাষ্ট্র যখন গণতন্ত্রের ভিত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে তখন অহিংস বিপ্লবের নির্দেশও তিনি এই সংগেই দিয়া রাখিতেছেন। কেন না, প্রকৃত গণতন্ত্র এবং তাহার বিপরীত ব্যবস্থার মধ্যে দূরত্ব যে কত সংকীর্ণ তাহা তাঁহার অবিদিত নাই। গণতন্ত্রসম্মত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা রক্ষার জন্য ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে সচেতন করিয়া তোলা গান্ধীনীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সেইজন্য আর্থিক জীবনের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা ক্রমে স্বীকার করিয়া লইলেও, অর্থনৈতিক অসহযোগের নীতিতে এবং ব্যক্তিচরিত্রের পরিবর্তনের জন্য অবিশ্রাম প্রচারের নীতিতে তাঁহার বিশ্বাসের অবধি নাই।[৪৯]

বস্তুত, রাষ্ট্রকে হিংসার ভিত্তি হইতে সরাইয়া যুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, এই দুই নীতিরই আবশ্যকতা আছে। রাষ্ট্রের ইচ্ছা কতকগুলি ব্যক্তির ইচ্ছার সমবায়েই গঠিত হয়, কাজেই ব্যক্তি হইতে রাষ্ট্রকে পৃথক্ করিয়া দেখা অসম্ভব। সেইজন্য কার্ল মার্ক্স যখন "সর্বহারাদের রাষ্ট্র" গঠন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, সে রাষ্ট্রের চালনাশক্তি কাহার ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিলেন না, তখন সমাজশাস্ত্রের একটি অলিখিত বিধি তিনি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, ইহাই আমাদের ধারণা।[৫০] গান্ধীজি সে ভুলটি হইতে আমাদের রক্ষা করিয়াছেন। রাষ্ট্রবিধির আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া লইলেও, ব্যক্তির ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের ইচ্ছা বলিয়া আমরা ভুল করিয়া না

বসি, নিজের সামর্থ্যকে রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের জন্য নিয়োগ করি এবং দণ্ডবিধির পরিবর্তে সমবায়-বিধি (law of co-operation) গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করি, এই আহ্বান তিনি সর্বদা আমাদের প্রতি প্রেরণ করিতেছেন।[৫১] প্রথম জীবনে গুরু Tolstoy-এর নিকটে 'দার্শনিক নৈরাজ্যবাদের' দীক্ষা লইলেও, অবশেষে গণতন্ত্র-সম্মত রাষ্ট্রকে সমাজ-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশকেন্দ্র বলিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। শাসনের জন্য নিয়ন্ত্রণ এবং পালনের জন্য নিয়ন্ত্রণ—এ দুয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহাকে আর অস্বীকার করিয়া তিনি পারিতেছেন না। এই ভাবে 'নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক' সমস্যাগুলির উত্তর তিনি সমাজতন্ত্র-সম্মত পথেই খুঁজিয়া পাইতেছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বিকেন্দ্রীকরণের প্রতি তাঁহার যে আসক্তি ছিল তাহাকে এখন আর "রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ" বিকেন্দ্রীকরণ বলা চলে না; রাষ্ট্রের সহায়তায় বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অবলম্বন করিয়া অন্য উদ্দেশ্যে তাহার প্রবর্তন করাই তাঁহার বর্তমান অভিপ্রায়। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে, প্রকৃত গণতন্ত্রের সংরক্ষণের জন্যই রাষ্ট্রশক্তির বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষা ও বিচার-ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ অত্যাবশ্যক।[৫২] আর্থিক জীবনের বিকেন্দ্রীকরণও সম্ভব এবং আবশ্যক কিনা তাহার বিস্তারিত আলোচনা আমাদের অচিরেই করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে 'প্রভাব-বিষয়ক' সমস্যাগুলির আলোচনা করা প্রয়োজন।

—৪—

যন্ত্রব্যবহারমূলক আর্থিক ব্যবস্থা কতকগুলি নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে, সে কথা আজ আর কেহ অস্বীকার করিবে না।[৫৩] কিন্তু যন্ত্রের ব্যবহার যদি বিকেন্দ্রীভূত করা যায়, অর্থাৎ মানুষ তাহার নিজস্ব যন্ত্রের সাহায্যে নিজের কুটিরে বসিয়া ভোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন করিবে এরূপ ব্যবস্থা যদি সম্ভবপর হয়, তবে এই ধরণের সমস্যাগুলির সমাধান অতি সহজ হইয়া যায়। সেইজন্য গান্ধীজি ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের যে চিত্র কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে কেবল সেই

ধরণের যন্ত্রেরই স্থান আছে, যে যন্ত্রকে কুটিরবাসী গ্রাম্য লোকও অতি সহজে ব্যবহার করিতে পারে। চরকা ও তাঁত এই ধরণের যন্ত্র মাত্র। তাই এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন,

"নিছক যন্ত্র হিসাবে যন্ত্রের উপর আমার কোনো আক্রোশ নাই. চরকাই তো এক মূল্যবান্ যন্ত্র বিশেষ।"[৫৪]

অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন,

"যে-যন্ত্র কুটিরবাসী কোটি কোটি মানুষের শ্রমের লাঘব করিবে, তাহাকে আমি সাদরে বরণ করিয়া লইব।"[৫৫]

কাজেই গৃহব্যবহৃত যন্ত্রকে উন্নত করিবার জন্য এবং গৃহে ব্যবহারের উপযোগী নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিবার জন্য তিনি ভারতের কারুশিল্পীদের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।[৫৬]

মানুষের সমৃদ্ধি সাধনের উপায় হিসাবে এই ধরণের বিকেন্দ্রীকরণ-নীতি যদি সামাজিক শুভবুদ্ধির দ্বারা গৃহীত হয়, তবে অর্থনীতিবিদ্ তাহার মধ্যে আপত্তি করিবার মতো কিছু খুঁজিয়া পাইবেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু গান্ধীনীতিতে যাঁহারা আস্থাবান্ তাঁহাদের রচনায় অনেক সময়ে বিকেন্দ্রীকরণকেই একটি উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে দেখি। যেহেতু কেন্দ্রীভূত আর্থিক ব্যবস্থা শোষণ ও শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই হেতু বি কে ন্দ্রী ক র ণ ই বাঞ্ছনীয়—ইহাই যদি তাঁহাদের যুক্তি হয়, তাহা হইলে বিকেন্দ্রীভূত আর্থিক ব্যবস্থা শোষণ ও শাসনের দ্বারা পীড়িত হইতে পারিবে না, ইহাও তাঁহারা প্রমাণ করিতে বাধ্য। ইতিহাস ইহার বিপরীত সাক্ষ্যই বহন করিয়া আসিতেছে।[৫৭] পক্ষান্তরে, কেন্দ্রীভূত আর্থিক ব্যবস্থা যদি মানুষের ন্যূনতম (minimum) আর্থিক সমৃদ্ধি সাধনের জন্য অপরিহার্য হয়, তাহা হইলে সে-ক্ষেত্রে মানবসমাজের কী কর্তব্য, কেন্দ্রকে লোকায়ত্ত করা সম্ভব কিনা, এবং কী উপায়ে তাহা সম্ভব, এ সম্বন্ধে আলোচনা করা অর্থনীতিবিদ্ তাঁহার প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহার নিকটে বিকেন্দ্রীকরণ একটি উপায় মাত্র—এবং এ উপায়ে মানুষের ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যবিধান

যদি অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে কেন্দ্রীকরণের সমস্যাগুলিকে এড়াইয়া গেলে তাঁহার চলিবে না। অন্য কোনো পথে এই আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব কিনা সে-সন্ধান তাঁহাকে অবশ্যই করিতে হইবে।

অতএব, বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার দ্বারা আনুষঙ্গিক 'প্রভাব-বিষয়ক' সমস্যাগুলির সমাধানের কথা চিন্তা করিবার আগে, এ ব্যবস্থায় মানুষের সমৃদ্ধি কতদূর সাধিত হইতে পারে তাহা চিন্তা করা প্রয়োজন। বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা মানুষ স্বাবলম্বন শিক্ষা করিতে পারে, স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্যের আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, জনাকীর্ণ নগরে না থাকিয়া গ্রামের কুটিরে থাকিতে পারে, এ সকলই সত্য। কিন্তু মানুষ আদৌ বাঁচিয়া থাকিতে পারে কিনা, এবং পারিলে তাহার জীবনযাত্রার স্বরূপ অত্যন্ত হীন হইয়া পড়ে কিনা, সে কথা গণনার মধ্যে আনাও যে প্রয়োজন, বিকেন্দ্রীকরণ-বাদী অনেক ব্যক্তি তাহা ভুলিয়া যান। ইঁহাদের ধারণা, কেন্দ্রীকরণ শুধু ভোগ্যদ্রব্যের বাহুল্যের জন্যই প্রয়োজন; অতএব, বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা সাধারণ মানুষের ক্ষতি তো হইবেই না, বরং নানাবিধ দূষিত সমস্যার কবল হইতে মুক্ত হইয়া সে বাঁচিবে। অর্থনীতিবিদ্ এ ধারণা পোষণ করেন না। মানুষের একক উৎপাদন-ক্ষমতা যে কত অল্প সে-কথা জানিলে গোঁড়া বিকেন্দ্রীকরণবাদীও তাঁহার ধারণা পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইবেন, সন্দেহ নাই।

বস্তুত, আমাদের মূল প্রশ্ন কেন্দ্রীকরণ কিংবা বিকেন্দ্রীকরণ নয়—মূল প্রশ্ন ভারতের অগণিত জনসাধারণের জন্য একটি ন্যূনতম আর্থিক পরিকল্পনা স্থির করিয়া সেই পরিমাণ উৎপাদন-ক্ষমতার সৃষ্টি করা। এই পরিমাণ উৎপাদন-ক্ষমতার সৃষ্টি করিতে হইলে কেন্দ্রীকরণের মাত্রা যাহাই হউক না কেন, যন্ত্র ব্যবহারের পরিমাণ যত বেশি কিংবা যত কমই হোক না কেন, আমাদের তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা, বাহুল্য তো দূরের কথা, পর্যাপ্ত পরিমাণ ভোগ্য সামগ্রী সংগ্রহ করাও অসম্ভব।

এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যদি আমরা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই, তবে বিকেন্দ্রীকৃত আর্থিক ব্যবস্থার আলোচনা মাত্র দুইটি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ

রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, যদি কেন্দ্রীভূত কিংবা বিকেন্দ্রীভূত এই দুই ব্যবস্থায়ই উৎপাদন-ক্ষমতার বিশেষ-কিছু তারতম্য না হয়, তাহা হইলে কোন ব্যবস্থা আমাদের গ্রহণ করা উচিত? দ্বিতীয়ত, যদি বিকেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীভূত আর্থিক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে উৎপাদন-ক্ষমতা কমিয়াও (বাড়িয়া) যায়, তবে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে তাহা গ্রহণ করা সংগত হইবে কিনা? এই উভয় প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর দেওয়া আবশ্যক।

প্রথম ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি এই যে, ইহা ব্যক্তিকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ সৃষ্টির আনন্দ প্রদান করে, জটিল যন্ত্রের বন্ধন হইতে তাহাকে মুক্তি দেয়, নাগরিক জীবনের গ্লানি হইতে তাহাকে মুক্ত রাখে। এই যুক্তিগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করিতেছি না; কিন্তু আমাদের ধারণা, এই ধরণের যুক্তির মূল্য মানুষের বিশিষ্ট মানসিক সংগঠনের উপর অনেকটা নির্ভর করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, কোনো লোক হয় তো নিজের ঘরে বসিয়া নিজের কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পন্ন করিতে ভালবাসে, কেহ বা অন্য দশজনের সহিত মিশিয়া একটি কাজের অংশবিশেষ করিতে পারিলেই বাঁচিয়া যায়। কেহ বা গ্রামের মুক্ত প্রকৃতির লীলা দেখিয়া আনন্দ পায়, অন্য কেহ হয়তো নগরের বিচিত্র জনারণ্যের মধ্যে নিজেকে সমৃদ্ধ ও সুখী বলিয়া মনে করে। আবার একই মানুষ হয়তো কখনও গ্রামে, কখনও নগরে, কখনও একা, কখনও জনসমাগমের মধ্যে আনন্দ খুঁজিয়া পায়। মানুষের মনের এই বিচিত্র লীলাকে কেবলমাত্র আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তন দ্বারা প্রকাশের সুযোগ দেওয়া সম্ভবপর কিনা, তাহা ভাবিবার বিষয়। অন্ততঃ পক্ষে, কেন্দ্রীভূত এবং বিকেন্দ্রীভূত, যন্ত্রশিল্প এবং কুটিরশিল্প, উভয় প্রকার শিল্পের স্থানই যে আর্থিক ব্যবস্থায় যথাসম্ভব রাখা দরকার, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। সেই সঙ্গে, যন্ত্রশিল্পের বিস্তৃতির ফলে যাহাতে বহুজনাকীর্ণ নগর গড়িয়া না উঠে, গ্রামজীবন এবং নগরজীবনের বর্তমান পার্থক্য যাহাতে সংকীর্ণ হইয়া আসে, সে সম্বন্ধে সামাজিক শুভবুদ্ধির উদয় ও রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া তাহার প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। পূর্বে মানুষের ন্যূনতম জীবনসমৃদ্ধি সংরক্ষণের

আবশ্যকতা আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি ; ইহাকে কার্যে পরিণত করিতে গেলে গ্রামের গৃহব্যবস্থা (housing), পানীয় জলের সংস্থান, পথঘাটের ব্যবস্থা নগরের আদর্শেই করিতে হইবে, এবং নগরের জনাকীর্ণতা দূর করিতে গেলে গ্রামই হইবে তাহার আদর্শ।

জটিল যন্ত্রব্যবস্থার আর একটি প্রধান ত্রুটি গান্ধী সাহিত্যে তেমন ভাবে আলোচিত হয় নাই ; বর্তমান প্রসংগে তাহারও আলোচনা প্রয়োজন। বার্ণ্‌হাম্‌ Managerial Revolution নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, জটিল যন্ত্রকে চালনা করিতে হইলে এক শ্রেণীর দক্ষ শিল্পীর একান্ত প্রয়োজন, ইহারা সাধারণ, স্বল্পদক্ষ মানুষকে চালনা করিয়া ক্রমে সমাজে এবং রাষ্ট্রে প্রধান হইয়া উঠে। ইহাদের শাসনমুষ্টি হইতে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করিয়া লওয়া তখন দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এই ভাবে এক শ্রেণী শাসন করিতে এবং অন্য শ্রেণী নির্বিবাদে আদেশ পালন করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে বলিয়া এরূপ রাষ্ট্রে গণতন্ত্র-সম্মত শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে, কিংবা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

অন্যান্য সকল যুক্তি হইতে জটিল যন্ত্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ যুক্তি যে একটু স্বতন্ত্র এবং অনেকাংশে প্রবলতর, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এ বিপদের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য যাঁহারা আর্থিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের ফতোয়া দিয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহারা রাষ্ট্র ও আর্থিক জীবনের নিগূঢ় সম্বন্ধটিকে খুব গভীরভাবে অনুধাবন করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না।[৫৮] সমাজ-সম্মত কোন আর্থিক ব্যবস্থাকে স্থায়ী করিতে হইলে রাষ্ট্রকেও সেই ভাবে ভাবিত করা প্রয়োজন, নতুবা শ্রেণী-রাষ্ট্রের পীড়ন ও শোষণে সে-ব্যবস্থা লুপ্ত হইয়া যায়, বিগত অধ্যায়ে ইহাই ছিল আমাদের মূল বক্তব্য। ইতিহাসেরও ইহাই নির্দেশ। বস্তুত, রাষ্ট্রকে লোকায়ত্ত করিতে না পারিলে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থাকে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে যদি বা ব্যবহার করা যায়, বাঞ্ছিত আর্থিক সমৃদ্ধি ইহার দ্বারা অর্জন করা চলে না।

সেইজন্য বার্ণ্হাম্ যে-বিপদের ইঙ্গিত করিয়াছেন, সাধারণ মানুষকে তাহার হাত হইতে বাঁচাইতে হইলে, শুধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়, প্রত্যেকটি বড়ো কারখানার বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। জটিল যন্ত্রব্যবস্থা যাহাতে এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় দক্ষ লোককে অগণিত সাধারণ নরনারীর উপর কর্তৃত্ব করিবার অধিকার না দিতে পারে, তাহার জন্য গোড়া হইতেই তাহাদের কর্তৃত্বলিপ্সা খর্ব করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ, রাষ্ট্রকে লোকায়ত্ত করিবার যে 'তপস্যা,' কারখানাকে 'শ্রমিকায়ত্ত' করিবার তপস্যা তাহারই একটি অঙ্গ।[৫৯] রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে রক্ষা করিতে হইলে, শিল্পের ক্ষেত্রেও গণতন্ত্রকে রক্ষা করিতে হইবে। রাষ্ট্রশক্তির বিকেন্দ্রীকরণ যদি বাঞ্ছনীয় হয়, কারখানার উপর শ্রমিক-সংঘের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাও সমভাবে বাঞ্ছনীয়। দক্ষ শিল্পী যাহাতে তাহার প্রতিভাকে, তাহার ক্ষমতাকে সমাজ-বিরুদ্ধ রীতিতে পরিচালনা করিতে না পারে, সাধারণ শ্রমিককে প্রথম হইতেই সে-কথা ভাবিতে শিখিতে হইবে। ক্ষমতার বিরুদ্ধে অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই গণতন্ত্রের প্রথম পাঠ।

বিকেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি নাই, বরং সমৃদ্ধির মানকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ না করিয়া শিল্পব্যবস্থাকে যত দূর সম্ভব বিকেন্দ্রীকৃত করা যায়, তাহা করা উচিত বলিয়াই আমরা মনে করি। কিন্তু স্থায়ী আর্থিক ব্যবস্থা হিসাবে রাষ্ট্র-বিধি-বহির্ভূত বিকেন্দ্রীকরণের কল্পনাকে আমরা অবাস্তব বলিয়াই মনে করি। সেইজন্য ম্যানেজার-রাজের (Managerial State) আবির্ভাবকে বাধা দিবার জন্য, রাষ্ট্রসংস্রবহীন (in abstracto) বিকেন্দ্রীকরণের চিন্তাকে আমরা সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে 'বিকেন্দ্রীকরণ অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রনিরপেক্ষ হইলেও তাহার একটি নিজস্ব মূল্য থাকিতে পারে না' এ কথা আমরা বলি নাই। এই সূত্রে আমরা পূর্বে উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রশ্নটির আলোচনায় আসিয়া উপস্থিত হইব।

রাষ্ট্রের শক্তি যখন গণতন্ত্রের উচ্ছেদ করিতে চায়, কিংবা ধনিক যখন

শ্রমিকের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার কল্পনা করে, তখন অত্যাচারিতকে বাধ্য হইয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়। সেই বিশেষ ক্ষেত্রে, সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হিংসার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া জনসাধারণ যদি নিজেদের অর্থ নৈতিক সহযোগিতার অবসান ঘটাইতে পারে, তবে অত্যাচারীকে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হয়।[৬০] জনসাধারণের এই ক্ষমতাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য গান্ধীজি যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। একথা খুবই সত্য যে,

"শ্রমিক যে মুহূর্তে তাহার শক্তি উপলব্ধি করে, সেই মুহূর্তে সে ধনিকের সম-অংশ-ভাগী হইয়া দাঁড়াইতে পারে—তাহাকে আর ধনিকের দাস হইয়া থাকিতে হয় না।"[৬১]

শ্রমিকের এই ক্ষমতা ধর্ম্মঘট-আন্দোলনেরও (strikes) বিষয়বস্তু। কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই আর্থিক অসহযোগের আন্দোলন চালাইতে গেলে একদিকে যেমন রাষ্ট্রের অত্যাচার সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, অন্যদিকে বৃহত্তর জগতের সহিত আর্থিক সংযোগ নষ্ট হওয়ার ফলে জীবনযাত্রার সমৃদ্ধি বিশেষ ভাবেই ক্ষুণ্ণ হইবে। এই আন্দোলনের জন্য যে সংঘবদ্ধতা ও নেতৃত্বের প্রয়োজন তাহাতেও সন্দেহ নাই। এই সংঘ ও নেতৃত্বকে আমরা অত্যাচারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি সমান্তরাল রাষ্ট্র (parallel government) বলিতে পারি। অতএব, অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়াই একটি যুক্তির-উপর-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে এবং ইহার হাতে সমাজের আর্থিক ব্যবস্থাকে পোষণ করিবার ভার তুলিয়া দিতে কাহারও আপত্তি হইবার কথা নয়। কিন্তু আন্দোলন চলিতে থাকা কালে আর্থিক জীবনকে ছোট ছোট কেন্দ্রে বিভক্ত করিয়া সমৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করিতেই হইবে; ইহাতেও আপত্তি করিবার কিছু নাই। যেখানে সম্মান ও স্বাধীনতার প্রশ্ন, সেখানে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ করিবার শিক্ষা গান্ধীনীতির নিকট হইতে শিক্ষনীয়। এই বিশেষ ক্ষেত্রেই কেবল রাষ্ট্র-সংস্রব-হীন বিকেন্দ্রীকরণকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করিয়াও রক্ষা করা

কর্তব্য; কিন্তু ইহাই যদি ভারতবাসীর চিরন্তন ভাগ্যলিপি হয়, তবে স্বতন্ত্র ভারতের চিত্র লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কী? মানুষের বৃহত্তর গণতন্ত্র-সম্মত সমবায়ে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, আমাদের চিত্র কেবল তাঁহাদেরই জন্য। মানুষ ক্ষুদ্র সমবায় হইতে বৃহত্তর সমবায়ে পৌঁছিবার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদ কম ছিল না। অতএব, স্থায়ী সমৃদ্ধির ব্যবস্থা হিসাবে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সহিত সংযোগহীন, রাষ্ট্র-বিধি-বহির্ভূত বিকেন্দ্রীকরণের কল্পনা কেবল যে অবাঞ্ছনীয় তাহাই নয়, ইহার মধ্যে মানুষের ইতিহাস ও প্রকৃতিকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা দেখিতে পাই।

সেই সংগে এ কথাও আমরা মানিয়া লইব যে, ভারতবর্ষের ভাবী শাসনতন্ত্র যদি প্রকৃত গণতন্ত্রসম্মত হয়, তবে তাহার মধ্যে গ্রামসমাজের একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকৃত হইবে এবং গ্রামসমাজের আর্থিক জীবনের উপর তাহার পূর্ণ কর্তৃত্ব রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা লংঘিত হইবে না কেবল তাহাই নয়। যেহেতু গণতন্ত্র-ব্যবস্থা অতিমাত্রায় ভংগুর, সেই হেতু গ্রামসমাজ যাহাতে সর্বদা তহার আর্থিক অসহযোগের হাতিয়ার প্রস্তুত রাখিতে পারে, যে উদ্দেশ্যে অন্ততঃ অন্ন ও বস্ত্রের ব্যাপারে গ্রামসমাজকে যথাসম্ভব স্বাবলম্বী রাখিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব-লিপ্সাকে সংযত রাখিবার জন্য গ্রামকেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী রাখা। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রকে আপনা হইতেই 'গণ'-মণ্ডলীকে শক্তিমান্ করিবার ভার গ্রহণ করিতে হইতে। ইহাতে রাষ্ট্রের মঙ্গল-শক্তি লুপ্ত হইবে না, কিন্তু তাহার ক্ষমতা-লিপ্সা বহুসংখ্যক কেন্দ্রের চাপে পড়িয়া সংযত ও নিয়মিত হইবে; সংক্ষেপে, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।[৬২]

এই উদ্দেশ্যের মধ্যে রাষ্ট্র-নির্দেশিত বিকেন্দ্রীকৃত বস্ত্রশিল্প-ব্যবস্থার (decentralised textile scheme) একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। (ঠিক সেইরূপে, বিকেন্দ্রীকৃত খাদ্য-শিল্পেরও স্থান আছে।) প্রত্যেক ব্যক্তির হাতে চরকা তুলিয়া দিয়া, রাষ্ট্র যেন তাহাকে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান

জানাইতেছে—গণতন্ত্রী রাষ্ট্র নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সম্ভাবনা নিজেই সৃষ্টি করিয়া রাখিতেছে। চরকা এই সম্ভাব্য (contingent) বিদ্রোহের প্রতীক। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে চরকা শান্তির দূত নয়, অশান্তি ও বিপ্লবের বার্তাবহ; বিকেন্দ্রীকরণের প্রতীকমাত্র নয়, স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষার সংকল্পবাক্য। এই ধরণের বিকেন্দ্রীকরণকে আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না, কিন্তু রাষ্ট্র যাহাতে তাহার স্থায়ী ও মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ জনসাধারণের জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান সংরক্ষণ করার কথা, ভুলিয়া না যায়, সে সম্বন্ধেও আমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে।

এবার অন্য ধরণের একটি প্রসংগ উত্থাপন করা যাক। পূর্বে বলিয়াছি, জটিল যন্ত্র ব্যবহার ও কেন্দ্রীকরণের সাহায্যে উৎপাদন ক্ষমতা যদি বাড়িয়াও যায়, তথাপি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে তাহার ব্যবহার বাঞ্ছনীয় না-ও হইতে পারে। সেই বিশেষ ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি যে রাষ্ট্রের সহিত অসহযোগ, পূর্বের আলোচনা হইতেই তাহা বোঝা যাইবে। কিন্তু রাষ্ট্র গণতন্ত্র-সম্মত পথে চলিলেও, এবং এক সময়ে ন্যূনতম সমৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়া গেলেও, উৎপাদন-ক্ষমতা এত বাড়িয়া গেল যে তাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা মানুষের সমৃদ্ধি আরও বাড়ানো সম্ভব হইল। ভারতবর্ষে এ সমস্যার উদ্ভব হইতে আরও অনেক বিলম্ব আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু নিছক সমস্যা হিসাবেই ইহার আলোচনা করা যাইতে পারে। বস্তুত, যে রাষ্ট্র সর্বসাধারণের জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণ করিতে বদ্ধপরিকর, তাহার পক্ষে এ সমস্যার কোনো গুরুত্ব আছে বলিয়াই আমাদের মনে হয় না। কিন্তু কোনো কোনো লেখক সোভিয়েট্ রাশিয়ার আধুনিক অর্থ নৈতিক বিস্তারচেষ্টার মধ্যে এই সমস্যার আভাস পাইয়াছেন।[৬৩] এ আশংকা সত্য হইলে সে দেশে সমাজতন্ত্রের আদর্শ যে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। সমাজে উৎপাদনের পরিমাণ যত অপর্যাপ্ত হোক না কেন, তাহার দ্বারা মানুষের মংগল না-হইয়া ক্ষতি হইতে পারে, ইহা অবিশ্বাস্য। কিন্তু যদি এমন হয় যে, উৎপাদনের পরিমাণ যত বাড়িতে থাকিবে, কেন্দ্রী-

করণের দোষক্রটিগুলি ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকিবে, সে ক্ষেত্রে ন্যূনতম সমৃদ্ধির মাত্রা ছাড়াইয়া উৎপাদনবৃদ্ধির আদর্শ গ্রহণ করিবার কোনো অর্থ নাই। কিন্তু সামাজিক শুভবুদ্ধি ও রাষ্ট্রবিধির দ্বারা এই আদর্শ স্বীকৃত না হইলে, এবং আর্থিক ব্যবস্থা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ভিত্তিতে পরিচালিত হইলে, এই অবস্থার মধ্য হইতে শোষক শ্রেণীর উদ্ভব এবং সাম্রাজ্যবাদের জন্ম হওয়া বিচিত্র নয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষের প্রধান সমস্যা জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে সমৃদ্ধ করিবার সমস্যা ; এবং সে সমৃদ্ধির ন্যূনতম মান সংরক্ষণ করাই স্বতন্ত্র ভারতে রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে। ইহার জন্য যতটুকু যন্ত্র-ব্যবহার ও কেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন, তাহার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হইবে। কিন্তু ইহার পরেও উৎপাদন-মাত্রাকে বাড়াইবার জন্য যদি কেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন হয়, কিংবা জটিল ; অবিভাজ্য[৬৪] (indivisible) যন্ত্র-ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ যদি নির্দিষ্ট সীমারেখাকে ছাড়াইয়া যায়, তবে সে ক্ষেত্রে যন্ত্রকে পরিত্যাগ করিতে কাহারও আপত্তি হইবার কথা নয়। বস্তুত, ধনতন্ত্রের আমলে যান্ত্রিক উৎপাদন-রীতির যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ ধনিকের উৎপাদন-ব্যয় কমাইয়া তাহার লাভের অংক স্ফীত করা, আমাদের কল্পনায় (—এবং ইহাই সমাজতন্ত্রসম্মত কল্পনা—) যন্ত্র-ব্যবহারের উদ্দেশ্য তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অবশ্য, এ কল্পনায়ও যন্ত্র-ব্যবহারের আনুষঙ্গিক ক্রটি আছে ; কিন্তু, যেহেতু জনসাধারণের সমৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীভূত যান্ত্রিক উৎপাদন অনেকাংশে অপরিহার্য, সেই হেতু অন্য কোনো উপায়ে এই আনুষঙ্গিক ক্রটিগুলির সংশোধন সম্ভব কিনা, তাহাই আমাদের প্রথম বিবেচ্য। স্থায়ী আর্থিক ব্যবস্থা হিসাবে যন্ত্র-শিল্পকে গ্রহণ করিতে হইলে, কেবল অপরিহার্য সামগ্রীগুলির উৎপাদনের জন্যই তাহাকে গ্রহণ করা বিধেয়—ইহা আমাদের দ্বিতীয় আলোচনার সারাংশ। ইহা হইতে এ-কথাও প্রমাণিত হয় যে, বিলাস-দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকৃত কুটির শিল্পকে প্রাধান্য দিবার কথাও ভারতীয় আর্থিক কল্পনায় স্বীকৃত হওয়া উচিত।

—৫—

'প্রভাব-বিষয়ক' সমস্যাগুলির মধ্যে বেকারত্বের সমস্যাও অন্যতম। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রসংগক্রমে আলোচনা করিতে হইয়াছে। সেখানে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, বেকারত্বের সমস্যাটি বহুল পরিমাণে ধনতন্ত্রের সমস্যা; পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্রের আমলে, অর্থাৎ রাষ্ট্র যখানে সর্বসাধারণের জীবন-সমৃদ্ধি রক্ষা করিতে সচেষ্ট, সেখানে সমস্যাটির প্রকৃতি অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়া যায়। ধনতন্ত্রের আমলে রাষ্ট্র যেমন বেকারের জীবিকা নষ্ট হইয়া গেলেও তাহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য নয়, সমাজতন্ত্রের আমলে তেমন হইতে পারে না। সেখানে রাষ্ট্রকে শ্রমজীবির জীবন-সমৃদ্ধি রক্ষা করিবার দায়িত্ব স্বীকার করিয়া নিতে হয়। অতএব, সমাজতন্ত্রের আমলে, কেবলমাত্র সকল মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করিবার মতো ন্যূনতম উৎপাদন-ক্ষমতা সৃষ্টি হইবার পরেই কর্মহীনতা-সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। ধনতন্ত্র কিন্তু এ-সকল সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করে না। ব্যক্তিগত লাভের জন্য যন্ত্র ব্যবহার করিয়া শ্রমিককে পথে বসাইতে তাহার দ্বিধা নাই।

অতএব, ভবিষ্যৎ ভারতের গণতান্ত্রিক[৬৫] রাষ্ট্রকে দিয়া যদি আমরা সকল মানুষের জীবিকার দায়িত্ব স্বীকার করাইয়া লইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের দেশে বেকারসমস্যার আশু উদ্ভবের কারণ দেখি না। আমাদের জীবিকার মান এখনও এত হীন যে আমাদের দেশকে সমাজতন্ত্র-সম্মতউপায়ে সংগঠিত করিতে পারিলে অতি শীঘ্র বেকার-সমস্যার প্রসার হওয়া অসম্ভব। অবশ্য, উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইবার পথে, এক শিল্প হইতে আর এক শিল্পে যাওয়ার পথে, কিংবা এক উৎপাদন-রীতির বদলে অন্য উৎপাদন-রীতি গ্রহণ করিবার সময়ে, কিছু লোক অল্প সময়ের জন্যও বেকার হইবে না, এমন নয়। বিশেষত, কৃষি হইতে শিল্পে আমাদের প্রবেশকে ত্বরান্বিত করিবার পথে এই বেকার-সমস্যা প্রবল বাধা হইয়া দাঁড়াইবে, সন্দেহ নাই।[৬৬] কিন্তু আমাদের উৎপাদন-ক্ষমতা

যদি বাড়াইতে হয় এবং বণ্টনের ব্যবস্থা সুচারু করিয়া ইহার ফলে সর্বসাধারণের জীবিকার মান যদি উন্নত করিতে হয়, তাহা হইলে এ বাধাকে আমাদের অতিক্রম করিতে হইবে। স্বল্প-পরিমাণ বেকার সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া কৃষি ও শিল্পের বিকাশকে পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া এবং, আবশ্যক হইলে, সঞ্চিত মূলধনের (capital resources) খানিকটা অংশ বেকার সাহায্যের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া, এ সমস্যাকে ধীরে ধীরে আয়ত্ত করিয়া আনা যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইহার জন্য যদি বিদেশের সহায়তা, বিশেষত আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন তহবিল (World Reconstruction Bank) হইতে সাহায্য, পাওয়া যায় তাহা হইলে আরও সহজে আমরা এ সংকট উত্তীর্ণ হইতে পারিব। কিন্তু যন্ত্র-শিল্প-প্রসারের ফলে আমাদের দেশে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, এই মত গ্রহণ করিয়া সেই অনুসারে পরিকল্পনা করিলে, আমরা দারিদ্র্য কিংবা কর্মহীনতা—কোনো সমস্যাকেই স্থায়ীভাবে দূর করিতে পারিব না; কিংবা কর্মহীনতা যদি-বা দূর হয় তাহাতে আর্থিক সমৃদ্ধি এমন কিছু বৃদ্ধি পাইবে না, যাহাতে আমাদের জীবিকার মান বর্তমানের চেয়ে বড়ো বেশি উন্নত হইতে পারে।

অতএব, এই অস্থায়ী বেকার-সমস্যার ভয়ে যান্ত্রিক-উৎপাদন-রীতি বর্জন করা আমাদের সংগত হইবে না। রাষ্ট্রের হাতে যদি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ভার থাকে [৬৭], তাহা হইলে এই বেকার-সমস্যার দ্বারা কাহারও স্থায়ীভাবে পীড়িত হইবার কথা নয়, কেন না, বাড়্তি উৎপাদনের একটি অংশ যাহাতে সকলেরই ভোগে আসে সে দায়িত্বও রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের নিকট হইতে এই সাহায্য-গ্রহণে ব্যক্তির কুণ্ঠিত হইবার কিছু নাই—একটি সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহাকে সাময়িকভাবে কর্মবঞ্চিত হইতে হইয়াছে মাত্র। বরং রাষ্ট্রের এই সাহায্য দান (dole) হিসাবে না আসিয়া যাহাতে সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া পারস্পরিক বীমা (mutual insurance) হিসাবে আসে, তাহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বস্তুত, প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তি তাহার উপযুক্ত কর্ম করিবার

সুযোগ পাইবে, ইহা যেমন বাঞ্ছনীয়, তাহাদের কর্ম দ্বারা স্ব স্ব জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত সমৃদ্ধির বিধান তাহারা করিতে পারিবে, ইহাও সমভাবে বাঞ্ছনীয়। পরিপূর্ণ সমৃদ্ধির ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কেবল কর্ম করিবার সুযোগ পাইলেই চলিবে না, সমৃদ্ধির একটি ন্যূনতম মান যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির করায়ত্ত হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অবশ্য, ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় অনেক লোক একটা কিছু কাজ করিয়া দু'বেলা দু'মুঠা খাইবার ব্যবস্থা হইলেই বাঁচিয়া যায়; সমৃদ্ধি বা স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের কথা তুলিয়া ইহাদের বিদ্রূপ করা হয় মাত্র, হতাশার মুহূর্তে এরূপ মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু আধুনিক জীবনধারার যে একটি বিশেষ রীতি আছে, একথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া আমরাও ভুলিয়া যাইব কেমন করিয়া? সেইজন্য স্বতন্ত্র ভারতবর্ষের আর্থিক সংগঠনে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি ন্যূনতম আর্থিক মান সংরক্ষণ করিবার আবশ্যকতাকে আমরা সকল আদর্শের উপরে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছি। তাই বলিয়া কর্মহীনতার সমস্যাকে আমরা একবারে অবহেলাও করি নাই।

আমরা দেখাইয়াছি যে, রাষ্ট্র সমাজতন্ত্র-সম্মত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইলে কেবল জনসাধারণের আর্থিক সমৃদ্ধি পর্যাপ্ত হইয়া উঠিবার পরেই প্রকৃত বেকারত্ব-সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে, কিছু লোক কি চিরদিনই নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া খাইবে, যন্ত্র আসিয়া মানুষকে সুস্থ কর্মজীবন যাপনের সুখ হইতে বঞ্চিত করিবে? আমাদের ধারণা, এরূপ আশংকার কোন ভিত্তি নাই; কিংবা থাকিলেও এখনই তাহা লইয়া বিব্রত হইবার কোনো কারণ অন্তত ভারতবর্ষে নাই। ভারতবর্ষের সম্মুখে এখনও বহুদিন পর্যন্ত পর্যাপ্ত উৎপাদনের অভাবই প্রধান সমস্যা হইয়া থাকিবে। উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণের নিয়োগ এ ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু তাহার পূর্বে রাষ্ট্র কর্তৃক উৎপাদন-পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ, বিশেষত, মূলধন-বিনিয়োগের ভার (investment) গ্রহণ প্রয়োজন, শুধু প্রয়োজন নয়, অত্যাবশ্যক। যাহাতে পর্যাপ্ত মূলধন-বিনিয়োগের অভাবে উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি ব্যাহত না হয়, এবং তাহার আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে

বেকার-সমস্যার সৃষ্টি না হয়[৬৮], ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বতন্ত্র ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইবে।

ভারতবর্ষ বর্তমানে যে হীন দারিদ্র্যের কবলে পীড়িত হইতেছে, যাদুদণ্ড চালনার দ্বারা এক মুহূর্তে তাহাকে সেই দারিদ্র্য হইতে মুক্ত করা অসম্ভব, এ কথা স্বীকার করিয়া লওয়া ভালো। কিন্তু এই দারিদ্র্যদশার মধ্য হইতেই মূলধনের সৃষ্টি (saving) ও তাহার যথাযথ বিনিয়োগের ব্যবস্থা (investment) স্বতন্ত্র ভারতের রাষ্ট্রকে করিতে হইবে—ইহা ছাড়া আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধির আর দ্বিতীয় পথ নাই।[৬৯] মূলধন-বিনিয়োগের নানা উপায় থাকিতে পারে—তাহার মধ্যে কোনো উপায়ে হয়তো বহু লোকের কর্মসংস্থান হইতে পারে, কিন্তু উৎপাদন-বৃদ্ধির আশা তাহাতে কম; আবার কোনো উপায়ে হয়তো উৎপাদন-বৃদ্ধি যথেষ্ট হয়, কিন্তু কর্মসংস্থান সে পরিমাণে হয় না। ইহার মধ্যে কোন্ উপায়টি গ্রহণীয়, তাহা ক্ষেত্র-অনুযায়ী বিচার করিতে হইবে। সাময়িকভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেকার-সমস্যা-লাঘবের জন্য প্রথম শ্রেণীর উপায় অবলম্বন করিলেও, স্থায়ী ভাবে যাহাতে উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি ব্যাহত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অবশ্য প্রথম হইতেই ভারতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে এত মূলধন সঞ্চয় বা সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না, যাহাতে জটিল যন্ত্র-রীতির সাহায্যে বাঞ্ছিত উৎপাদন-সীমায় সে অতি শীঘ্র উপস্থিত হইয়া পড়িতে পারে। প্রথমে হয়তো কেবলমাত্র মূলধনের অভাবের জন্যই তাহাকে ছোটো আকারের শিল্প লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে—তাহাতে বেকার-সমস্যার যদি কিঞ্চিৎ লাঘবও হয়, উৎপাদন-ক্ষমতা আশানুরূপ বাড়িবে না, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সেই ঈষৎ-বৃদ্ধি-প্রাপ্ত উৎপাদনের মধ্য হইতেই তাহাকে পরিপূর্ণতর বিকাশের জন্য সঞ্চয়ের সৃষ্টি করিতে হইবে। স্বতন্ত্র ভারতের আর্থিক সংগঠনের ইহাই হইবে বিকাশ-রীতি।

এই জন্য কোনো বাঁধা-ধরা ছক-কাটা নক্সার সাহায্যে ভারতের আর্থিক বিকাশের পথটি প্রথম হইতেই স্থির করিয়া লওয়া সম্ভব কিনা, সে-বিষয়ে

আমাদের সন্দেহ আছে। প্রতি পদক্ষেপে উৎপাদন-বৃদ্ধি ও কর্মহীনতা-সমস্যার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাহাকে চলিতে হইবে। জীবনযাত্রার রীতিটিকে আরও দীন না করিয়া কিভাবে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত উৎপাদন-ক্ষমতার মধ্য হইতে বিকাশের উপযোগী মূলধন-সম্পদ্ (capital resources) সংগ্রহ করিয়া লওয়া যায়, ইহা হইবে তাহার প্রধান সমস্যা। এ পথে বিকাশলাভ করিতে কিছু বিলম্ব হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে বিকাশের ভিত্তি হইবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। ইহার চেয়ে দ্রুততর সমৃদ্ধি-বিধানের জন্য হয় মুদ্রাবৃদ্ধির বিপজ্জনক পথ[10], নয়তো দ্রুততর মূলধন-সঞ্চয়ের জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতার অবাঞ্ছনীয় বিলোপ —ইহাদের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হইবে। কিন্তু আমরা যে-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কল্পনা করিয়াছি, তাহার মধ্যে ইহাদের স্থান নাই।

বর্তমানে এ-কথা মনে রাখাই যথেষ্ট হইবে যে, স্বতন্ত্র ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রধান সমস্যা হইবে উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং তাহার জন্য পর্যাপ্ত মূলধন সঞ্চয়। ইহার মধ্যে বেকার-সমস্যার উদ্ভব হইলেও তাহাকেই প্রধান সমস্যা মনে করিয়া বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা দেওয়া আমাদের উচিত হইবে না। বরং অন্য উপায়ে—এবং, সাময়িকভাবে, ছোটো কারখানার বিস্তার অনেক ক্ষেত্রে অন্যতম উপায়—এ সমস্যার সমাধান করাই বাঞ্ছনীয়।

গোঁড়া বিকেন্দ্রীকরণ-বাদী প্রশ্ন করিতে পারেন, যদি জীবিকা সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেলেও বেকার-সমস্যা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে কী? ইহার উত্তরে বলিব, আমাদের চেয়ে সমৃদ্ধিশালী অনেক দেশেও এ সমস্যার উদ্ভব আজও হয় নাই। এমন কি, আমেরিকাতেও যে বেকার-সমস্যা, তাহাতেও সকল শ্রেণীর, সকল ব্যক্তির জীবিকার মান আজও যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমেরিকার সমস্যা অবাধ-ধনতন্ত্র-সঞ্জাত, ধনবৈষম্য-পুষ্ট বেকার-সমস্যা; রাষ্ট্রনির্দেশিত মূলধন-বিনিয়োগ নীতি (investment) ইহার সমাধান করিতে পারে না, এমন সন্দেহ করার কারণ নাই। কিন্তু যদি ইহার পরও বেকার-সমস্যা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে

আমরা কি অবিরাম উপকরণ-সৃষ্টি করিয়াই এ সমস্যার সমাধান করিব? আমাদের তাহা মনে হয় না। মানুষের অবসর-সময়ে[৭১] তাহাকে নানাবিধ শিল্পকর্মের প্রেরণা জোগাইয়া তাহার উদ্‌বৃত্ত অবসর-কালকে সমৃদ্ধ করা কি একান্তই অসম্ভব? তাহার শিক্ষাসমাপ্তির কালকে প্রলম্বিত করিয়া কর্মজীবনকে হ্রস্বতর করিবার কল্পনাই বা মন্দ কী? আর যদি তেমন দুর্দিনই মানুষের আসে যেদিন কাজের অভাবে তাহাকে অলস থাকিতে হয়, সেদিন না হয় পালা করিয়া আমরা সেই দুর্দিনের কালকে নিজেদের মধ্যে বাঁটিয়া লইব। কেহ ভোগ করিবে আর কেহ করিবে না, কেহ কাজ পাইবে আর কেহ পাইবে না—এ ব্যবস্থার চেয়ে সকলেই সমান ভোগ করিবে এবং সকলেই সমান কাজের সুযোগ পাইবে, এ ব্যবস্থাই কি বাঞ্ছনীয় নয়?

—৬—

যন্ত্র-ব্যবহার-মূলক কেন্দ্রীভূত সভ্যতার আর একটি প্রধান বিপদ, ইহা জীবনকে ক্রমেই জটিল ও দুর্বোধ্য করিয়া তোলে। সাধারণ মানুষ তাহার সাধারণ বুদ্ধি লইয়া জগৎ ও জীবনকে আর আগের মতো ভালো করিয়া বুঝিতে পারে না, তাই জীবনকে অন্যের হাতে ছাড়িয়া দিয়া শুধু অস্পষ্ট ছায়ার মতো তাহার বিচিত্র সমস্যাগুলির দিকে চাহিয়া থাকাই হইয়াছে বর্তমান যুগে সাধারণ মানুষের ভাগ্যলিপি।[৭২] আজ মুদ্রাস্ফীতি, কাল আমদানী নীতির পরিবর্তন, কখনও কূটনৈতিক সংকট, কখনও বৈদেশিক সংগ্রাম—ইত্যাদি অস্পষ্টবোধ্য সংকটের দ্বারা প্রপীড়িত সাধারণ মানুষ নেহাৎ ভাগ্য-বিধাতার মতোই রাষ্ট্র-বিধাতার দিকে চাহিয়া থাকে; তিনি কখন কোন্ পথে চলিবেন, সে হিসাব রাখা তাহার অসাধ্য। বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় গণতন্ত্রের উদ্ভব হওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ যদি তাহার চারিদিকের জগৎ ও জীবনকে ভালো করিয়া বুঝিতে-ই না পারে, তাহা হইলে জীবনের সমস্যাগুলির উপর নিজের মতপ্রভাব বিস্তার করার উপায় কোথায়? অতএব, সাধারণের চেয়ে

বেশি বুদ্ধিমান যাঁহারা, তাঁহারা নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার কাড়াকাড়ি করিয়া মরিবেন এবং সে-যুদ্ধের দায় সাধারণ মানুষকে নির্বোধের মতো, অসহায়ের মতো সহ্য করিতে হইবে, ইহাই হইল বর্তমান যন্ত্র-সভ্যতায় সাধারণ মানুষের স্থান। যন্ত্র-সভ্যতার আমলে সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনো বিষয়ে নিজস্ব মত গঠন করাই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে; পৃথিবীটা এত বিশাল হইয়া গিয়াছে যে সাধারণ মানুষের পক্ষে বুদ্ধি দিয়া ইহাকে সমগ্রভাবে বুঝিয়া লওয়া এক প্রকার অসাধ্য। নিজের অজ্ঞতা লুকাইবার জন্য নানা রকমের তৈরী-করা মত গ্রহণ করিয়া তাহাকে বিজ্ঞতার ভাণ করিতে হইতেছে [৭৩]; সমস্যার প্রকৃত স্বরূপটি তাহার অপরিজ্ঞাত থাকিয়া যাইতেছে। সাধারণ মানুষের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া যাহারা অসাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন তাহারা রাষ্ট্রের ক্ষমতা, সমাজের ক্ষমতা আত্মসাৎ করিয়া লইতেছে। ফলে গণতন্ত্রের স্থলে নায়ক-তন্ত্র মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পূর্বে Burnham-এর গ্রন্থ হইতে যে-বিপদের আভাস দিয়াছি, এ বিপদ্ তাহারই সমগোত্রীয়। তবে, Burnham কেবল যন্ত্র ও তাহার চালনদক্ষতাকে প্রাধান্য দিয়াছেন, বর্তমান প্রসংগে জগতের বিরাটত্ব এবং জটিলতার কথাই বেশি করিয়া ভাবিতে হইবে। জগৎ-ব্যাপারকে সাধারণ মানুষের বুদ্ধিগম্য রাখিতে হইলে জগৎকে যত ছোটো রাখা প্রয়োজন, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া এবং তাহার অনুসরণের ফলে তাহার জগৎ আর তত ছোটো নাই। কিন্তু ইহার জন্য দুঃখ করিয়া কিছু লাভ আছে কি? জীবনকে সরলতম করিতে হইলে মানুষকে সমাজ ত্যাগ করিয়া একাকী অরণ্য-জীবন যাপন করিতে হয়। জীবন হইতে শোষণের সমস্ত সম্ভাবনা বিদুরিত করিতে হইলে মানুষের আর সমাজ বাঁধিয়া থাকা চলে না। বস্তুত, দুই জন মানুষ যদি একত্র থাকে এবং একজন অপরের চেয়ে বেশি চতুর হয়, তাহা হইলেই তো শোষণের অবকাশ ঘটিতে পারে।[৭৪] অবশ্য, সমাজের পরিধি যতই বাড়িতে থাকে, শোষণের সম্ভাবনাও তত বাড়িতে থাকে, সামাজিক গতিবিধি ততই সাধারণ

মানুষের কছে দুর্বোধ্য হইতে থাকে, এ কথাও স্বীকার্য। জগৎ-ব্যাপারের জটিলতা হইতে সাধারণ মানুষের বিহ্বলতা এবং তাহার পরাধীনতার আশংকাকে আমরা অস্বীকার করিতেছি না, বরং প্রকৃত গণতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখা যে আজিকার জগতে কত কঠিন সে-কথা বারংবার মানুষকে মনে করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন বলিয়াই আমরা মনে করি। কিন্তু জগৎটাকে আবার ছোটো করিয়া আনিয়া সাধারণ মানুষের বুদ্ধিগোচর করিয়া দেওয়া বাস্তবিকই কিছু সম্ভব নয়। একদল মানুষ নিভৃত গ্রামসমাজ গড়িয়া বাঁচিতে চাহিলেও বাহিরের মানুষ যে আসিয়া তাহার মধ্যে নাক গলাইবে না, সে কথা কে বলিবে? বাহিরের সমস্যাগুলি আসিয়া যখন গ্রামসমাজের মর্মমূলে আঘাত করিবে, তখন সে-আঘাতে তাহার ভিত্তিতল ভাঙ্গিয়া পড়িবে না কি? ইতিহাস আমাদের এই ভাঙ্গিয়া পড়ার কাহিনীটি ফলাও করিয়া বলিয়াছে। বস্তুত, সাধারণ মানুষের আশংকার নানাবিধ কারণ সত্ত্বেও, কতকগুলি অসাধারণ মানুষ কখনও জয়লিপ্সার বশে, কখনও অর্থলিপ্সার বশে, কখনও নিছক সুদূরের ডাকে মজিয়া, এই যে প্রকৃতির দেওয়াল ভাঙিয়া সকল মানুষকে মিলাইয়া দিল, ইহার মধ্য হইতেই নূতন করিয়া আবার আশা করিবার মতো কিছু গড়িয়া তোলাই হইবে আমাদের ভবিষ্যতের লক্ষ্য।

কিন্তু ইহাই শেষ কথা নয়। গড়িয়া তুলিবার উপায়টিও আবিষ্কার করিতে হইবে যে। সাধারণ মানুষকে বুঝিবার মতো, ভাবিবার মতো, নিজের প্রভাব বিস্তার করিবার মতো উপাদান কিছু দিতেই হইবে। এই 'কিছু'-টা কতদূর হইবে, সাধারণ মানুষের বুদ্ধি-পরিধির উপর তাহা নির্ভর করিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহারা যেন যন্ত্রের মতো "উপরের হুকুম" পালন করিয়া না যায়, নিজেদের প্রয়োজন এবং তাহা মিটাইবার উপায় যেন তাহারা নিজেদের বুদ্ধি দিয়া স্থির করিবার সুযোগ পায়, গণতান্ত্রিক শাসনে সে-ব্যবস্থা অপরিহার্য। এই কারণেও ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের জন্য কোনো কেন্দ্রগত, ছক-বাঁধা নক্সা (plan) আঁকিয়া দিবার কল্পনায় আমাদের তেমন আস্থা নাই। গ্রামসমাজকে পুনর্গঠিত করিয়া

তাহাদের অস্পষ্ট আশা আকাঙ্ক্ষা উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করিবার সুযোগ তাহারা যাহাতে পায়, কেন্দ্রকে সেই ভার গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য, বিভিন্ন পল্লী-সমাজের পরিকল্পনার মধ্যে যাহা অসমঞ্জস, কিংবা একেবারেই অসম্ভব, তাহার সংশোধন-ভারও রাষ্ট্রের। কিন্তু সাধারণ মানুষগুলি যাহাতে তাহাদের আর্থিক সমস্যা এবং তাহা সমাধানের উপায় বুঝিতে পারে, নিজেদের ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের ক্ষমতার সমধর্মী বলিয়া মনে করিতে পারে, গণতান্ত্রিক পরিকল্পনারীতির মধ্যে ইহার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইহাও এক ধরণের বিকেন্দ্রীকরণ, কিন্তু অন্য-নিরপেক্ষ নয়। অন্য গ্রামসমাজ এবং রাষ্ট্রের উপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য নির্ভর করার মধ্যে যে আশংকা, এ ব্যবস্থায় সেরূপ কোনো আশংকা নাই। যেহেতু গ্রামসমাজ আর্থিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিবে, সেই হেতু একমাত্র শক্তির (physical force) দম্ভ ছাড়া অন্য কোনো সূক্ষ্মতর উপায়ে গ্রামের আর্থিক জীবনকে বিপর্যস্ত করিবার আশংকা এ পরিকল্পনায় অবান্তর। বলা বাহুল্য, যেমন অন্য ক্ষেত্রে, তেমন এ ক্ষেত্রেও বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সংগঠনের সহায়ক হইতে হইলে, রাষ্ট্রবিধির দ্বারা তাহা স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্র কেবল বাহিরের কাঠামোটি তৈরি করিয়া রাখিবে, গ্রাম-সমাজগুলি পরস্পর সমবায় ও আদান-প্রদানের দ্বারা আর্থিক জীবনকে অন্তত ন্যূনতম সমৃদ্ধির স্তরে লইয়া যাইবে, আমাদের কল্পনায় ইহাই হইবে ভারতবর্ষের আর্থিক বিকাশের রীতি। রাষ্ট্র নানা তথ্য সংকলন করিয়া, নানা উপদেশ দিয়া, পরস্পর-অসমঞ্জস পরিকল্পনার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে এই পরিকল্পনার অগ্রগতিকে দ্রুততর করিয়া দিবে, সন্দেহ নাই। গ্রাম-সমাজ এবং রাষ্ট্র—কাহাকেও বাদ দিলে চলিবে না; গণতন্ত্রের সুরে এই দুইটি তারকেই বাঁধিয়া নিতে হইবে।

সেই সংগে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় গ্রাম-সমাজগুলিকে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত করা খুব সহজসাধ্য নয়। জন-সাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার সৃষ্টি না হইলে এবং তাহাদের আস্থাভাজন

নেতৃত্বের উদ্ভব গ্রাম-সমাজের মধ্যে না হইলে গণতান্ত্রিক গ্রাম-শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং তাহার সাহায্যে জনগণের কল্যাণসাধন অসম্ভব। সেইজন্য স্বতন্ত্র ভারতের রাষ্ট্রকে যদি গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে ভারতের যে-শিক্ষিত শ্রেণী সে-রাষ্ট্রের জনমত গঠন করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে গ্রাম-সংগঠনের প্রতি একটি নৈতিক দায়িত্ব জাগাইয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক। এই দিক দিয়া গান্ধীজির গঠন-কর্ম-পদ্ধতির (constructive programme) মূল্য শিক্ষিত নাগরিকদের কাছে যত অধিক, সমাজচৈতন্যহীন গ্রামবাসীদের পক্ষে ততটা নয়। ভারতের শিক্ষিত জনমত, গণতন্ত্রের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব রক্ষার খাতিরে, স্বতন্ত্র ভারতীয় রাষ্ট্রের সাহায্যে গ্রামসমাজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য চেষ্টা করিলে, ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক কর্তব্যবোধ জাগিয়া উঠিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু প্রাথমিক কর্তব্য শিক্ষিত শ্রেণীর ও তাঁহাদের দ্বারা বিধৃত রাষ্ট্রের। ভারতের শিক্ষিত শ্রেণী এতখানি দূরদৃষ্টিপরায়ণ ও শ্রেণী-স্বার্থমুক্ত হইবেন কি না, সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা চলে না। তবে রাষ্ট্রিক তত্ত্বাবধানে শিল্প-বিস্তার ও শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে জন-সাধারণের পক্ষে ক্ষমতাপরিচালনার একটি সম্ভাবনা সৃষ্ট হইতে বাধ্য। বস্তুত, গণতন্ত্র তো একটি অবস্থা নয়, একটি বিকাশপদ্ধতি; বাহিরের নানা প্রভাবে সে কখনও কিছুটা সংকুচিত, কিছুটা প্রসারিত হয় মাত্র। ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা, তাহার শাসনব্যবস্থাকে একান্ত কেন্দ্রীভূত করিবার পক্ষে নানা বাধাবিঘ্ন, তাহার ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্য গণ-আন্দোলনের দৃষ্টান্ত, সব মিলিয়া ভারতের আর্থিক পরিকল্পনাকে একান্ত কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিতে দিবে না, ইহাই আমাদের ধারণা।

ইহা সময়সাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে যদি আমরা ভারতীয় রাষ্ট্রকে দিয়া জনসাধারণের জীবন-সমৃদ্ধি বাড়ানোর দায়িত্ব স্বীকার করাইয়া লইতে পারি, তাহা হইলে মৌলিক পরিকল্পনাকে আপাতত কিছুটা কেন্দ্রগত ও কেন্দ্রনির্দেশিত করিতে আমরা বাধ্য। বিশেষত, শিক্ষার বিকিরণে, চিকিৎসা ও বেকার-

সাহায্য প্রথার ভিত্তি-স্থাপনে, মৌলিক শিল্প (key industries) সংগঠনে এবং কৃষির উন্নতির জন্য বিপুলায়তন সেচকার্যে কেন্দ্রগত রাষ্ট্রিক পরিকল্পনার স্থান করিয়াই দিতে হইবে। কিন্তু ক্রমশ গণতান্ত্রিক গ্রামশাসন ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠার সংগে সংগে ইহাদের মধ্যে অনেকগুলির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার গ্রামসমাজের উপর ছাড়িয়া দিবার জন্য রাষ্ট্রকে বাধ্য করা হইবে। গণতান্ত্রিক নীতির উপর আস্থা থাকিলে এবং শিক্ষা ও সংগঠন-অভ্যাস বিস্তৃত হইলে, ইহার মধ্যে অসম্ভব বলিয়া মনে হইবার কিছু নাই। ইহা যে বিপুল সংযম ও 'তপস্যা' সাপেক্ষ, সেকথা আমরা বরাবরই স্বীকার করিয়া আসিতেছি।

বস্তুত, যে জটিলতা এবং অস্পষ্টতার জন্য জনসাধারণ আজ জগৎ ও জীবনের সমস্যাগুলি লইয়া দিশাহারা হইতেছে, তাহাকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিবার মতো কোনো মন্ত্র আমাদের জানা নাই। বিকেন্দ্রীকরণ ইহার সমাধান—এ কথা স্বীকার করিয়া লইলেও, বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার মতো কোনো উপায় এই জ্ঞান-সমৃদ্ধ জগতে আজ আর নাই। একমাত্র জনসাধারণের বুদ্ধি ও ইচ্ছার বিকাশ এবং সচেতন সংগঠন-ই তাহাদের এই জটিলতা-জালের বিপদ হইতে মুক্ত রাখিতে পারে। সেইজন্য প্রত্যেকটি ক্ষমতাকেন্দ্রের বিরুদ্ধে এক-একটি সংগঠনকেন্দ্র গড়িয়া তোলা আজিকার পৃথিবীতে কেবল প্রয়োজন নয়, অত্যাবশ্যকও। ইহার জন্য গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার ও প্রচার একেবারে অপরিহার্য।

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, উপরে আমরা যে বিকেন্দ্রীকরণকে সমর্থন করিয়াছি, তাহা উ ৎ পা দ নে র বিকেন্দ্রীকরণ নয়, তাহা পরিকল্পনা-ব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ মাত্র। এ ধরণের বিকেন্দ্রীকরণে স্ব য়ং স ম্পূ র্ণ হইবার কিংবা অন্য-নিরপেক্ষ হইবার কোনো কথা নাই; কিন্তু প্রত্যকটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যাহাতে বিভিন্ন কেন্দ্রের দ্বারা বিবেচিত, এবং তাহাদের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা আছে। গ্রাম-কেন্দ্রগুলি যাহাতে নিজেদের ইচ্ছা প্রকাশ করিবার সুযোগ পায়, জীবনের

বিকাশকে নিজস্ব নীতির দ্বারা নিয়মিত করে—এবং, প্রয়োজন হইলে, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অস্বীকার করিয়াও নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের দাবী সমর্থন করে (পৃ. ৪৪ দ্রষ্টব্য) সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু কেবল বৃহত্তর সমবায়ের ভিতর দিয়াই গ্রামকেন্দ্রগুলি তাহাদের অধিবাসিগণের জীবনকে পরিপূর্ণতর করিয়া তুলিতে পারে।[৭৫] সেই উদ্দেশ্যে, রাষ্ট্রের ভিত্তিকে গণতন্ত্রসম্মত করিয়া তোলা হইবে আমাদের প্রধান কর্তব্য ও প্রথম সাধনা। একই কারণে, গ্রাম-কেন্দ্রগুলি যাহাতে আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিয়া রাষ্ট্রজীবনকে ব্যাহত না করে, সেদিকে দৃষ্টি রাখাও একান্ত প্রয়োজন। কেন্দ্রে এবং প্রত্যন্ত প্রদেশে এক সঙ্গে একই সুর বাজাইতে পারিলে তবেই আমাদের গণতন্ত্রের সাধনা সার্থক। আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের কল্পনা করিবার পূর্বে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার সৃষ্টি তাই অপরিহার্য।

—৭—

"প্রভাব-বিষয়ক" সমস্যাগুলির মধ্যে আমরা বিপ্লব-সঞ্জাত সমাজতন্ত্র[৭৬] ও তাহার আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলাম। (পৃ. ২৭ দ্রষ্টব্য) ভারতবর্ষের বর্তমান দুর্দশা ও দারিদ্র্য দেখিয়া যাঁহারা মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে কম্যুনিজম্-প্রতিষ্ঠার কল্পনা না করিয়াছেন, এমন নয়। বস্তুত, আজিকার ভারতবর্ষে শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, সমৃদ্ধির অভাব এবং সাধারণ সমাজবোধের অভাব এত বেশি, এবং সব-গুলিতে মিলিয়া এমন এক পাপ-চক্রের (vicious circle) সৃষ্টি করিয়াছে যে, অনেক সময়ে সুদৃঢ় নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত কম্যুনিজম্-সম্মত সমাজব্যবস্থাকেই ইহার একমাত্র সমাধান বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে কম্যুনিজম্ প্রতিষ্ঠিত হইবে কি না, ইহা যেমন নানা ঘটনা-সমবায়ের উপর নির্ভর করে, সেইরূপ কম্যুনিজম্ প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার দ্বারা সকল সমস্যার সমাধান হইবে কি না, তাহাও বিশেষ বিবেচনার বিষয়। গান্ধীজি ও তাঁহার মতাবলম্বীরা অবশ্য

কেবল শেষোক্ত প্রশ্নটিকেই লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। কম্যুনিজ্মের যে নিজস্ব কতকগুলি সমস্যা আছে, তাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়।

গান্ধীজির মতে হিংসার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। তাঁহার মতে হিংসার দ্বারা সাম্য ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলে, এ ব্যবস্থার দ্বারা যাহারা পীড়িত হয়, তাহাদের অন্তরে হিংসার আগুন কখনও নিভিয়া যায় না। তাহারা সর্বদা এ ব্যবস্থাকে প্রতিহত করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে, এবং রাষ্ট্রকে সর্বদাই দণ্ডশক্তির সাহায্যে তাহাদের ষড়যন্ত্র দমন করিতে হয়। এ ব্যবস্থায় জনসাধারণের ভোগসুখ কিছু বেশি হইতে পারে, কিন্তু শান্তি ও স্বাধীনতা লাভের আশা নাই বলিলেই চলে। শুধু তাই নয়; যেহেতু হিংস বিপ্লবে কঠোর নেতৃত্বের প্রয়োজন, সেই হেতু ইহার ফলে যে ক্ষমতা আসে, তাহা আসে মুষ্টিমেয় বিপ্লবী নেতার হাতে, জনসাধারণ সে ক্ষমতার সামান্যতম অংশও পায় না। জনসাধারণকে সামান্য আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য হয়তো দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাদের উপরে বসিয়া শাসকশ্রেণী নিজেদের ভোগের মাত্রাকে অসংযত করিয়া তোলে, তাহাদের ক্ষমতার উপর অন্য কাহারও কথা বলিবার থাকে না।

রাশিয়ার বল্‌শেভিক-বিপ্লব অবশ্য আজ পর্যন্ত ইহার একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল। হিংসার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত এই নূতন সমাজব্যবস্থার ফল কি খুব শুভ হইয়াছে? সে দেশে জনসাধারণের স্বাধীনতা কতটুকু? নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিবার অধিকারই বা কতটুকু? তাহার শাসকশ্রেণীর মধ্যে কি ক্ষমতার দম্ভ, বিস্তারের লোলুপতা আত্মপ্রকাশ করে নাই? হিংসাভিত্তি রাষ্ট্র সেখানে লুপ্ত হইবার পথে চলিয়াছে কি? রাষ্ট্রকে কি নিরন্তর দণ্ডক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইতেছে না?

এই সব প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দরকার, বলা বাহুল্য, আমাদের তাহা নাই। সপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় নানা লেখকের রচনা পড়িয়া কোনো স্পষ্ট ধারণায় উপনীত হওয়াও একপ্রকার অসম্ভব। বার্ণহামের (Burnham) গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পাই, সে দেশে জাতীয় আয়ের (national

income) অর্ধাংশ মাত্র শতকরা ১১ কিংবা ১২ জন লোকের ভোগে ব্যয়িত হয়। দরিদ্রতম ব্যক্তি সমৃদ্ধতম ব্যক্তির আশি-ভাগের এক ভাগ মাত্র উপভোগ করিতে পারে। লাইটন্ (Leighton) তাঁহার Social Philosophies in Conflict গ্রন্থে নিজের অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়াছেন যে, সে দেশের জনসাধারণ সর্বদা গুপ্তচরের ভয়ে বিব্রত ও সংকুচিত। এ সকল বিবরণ সত্য হইলে রাশিয়া সাম্য ও গণতন্ত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু প্রশ্নটি আরও সাধারণভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সুদক্ষ নেতৃত্বের অধীনে হিংসা ও রক্তপাতের পথে প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা কোনোকালেই সমৃদ্ধি ও সাম্য, শান্তি ও স্বাধীনতার লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে পারিবে কি? এ সম্বন্ধে অধ্যাপক জোড্ (Joad) লিখিয়াছেন,

"কম্যুনিজমের কল্পনা ইতিহাসের শিক্ষাকে একেবারে অস্বীকার করে। কোনো বিশেষ মুহূর্তে শাসকশ্রেণী তাহাদের ক্ষমতা পরিত্যাগ করিবে এবং একবার জনসাধারণের স্বাধীনতা হরণ করিয়া আবার তাহা ফিরাইয়া দিবে, এ ধারণার সমর্থন ইতিহাস কিংবা মনস্তত্ত্ব—কোনোটিতেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"[৭৭]

অধ্যাপক জোড্ যাহার জন্য ইতিহাস ও মনস্তত্ত্বকে টানিয়া আনিয়াছেন, গান্ধীজি তাহাকে নিজের নীতিবোধ দিয়াই প্রমাণ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য যতই ভালো হোক না কেন, উপায় যতক্ষণ নীতি-সম্মত না হয়, ততক্ষণ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, গান্ধীজির ইহাই বিশ্বাস। এ বিষয়ে ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার হাক্স্লিকে (Aldous Huxley) তাঁহার সমধর্মী বলা চলে। হাক্স্লি তাঁহার Ends and Means নামক গ্রন্থে বলিতেছেন,

"হিংসা দ্বারা শুধু হিংসামুলক ফলই পাওয়া যায়; হিংসার সাহায্যে বড়ো রকমের সমাজ-সংস্কার করিবার চেষ্টা বিফল হইতে বাধ্য।"[৭৮]

অতএব, সামাজিক সংস্কার সাধনের পক্ষে অহিংসার উপায়ই একমাত্র উপায়, যুক্তি ও ন্যায়ের পথই একমাত্র পথ।

গান্ধীজি ও হাক্স্লির সংস্কার-কল্পনায় কিন্তু একটি গুরুতর পার্থক্য আছে।

গান্ধীজির কল্পনায় অহিংসা কি ব্যক্তি, কি সমাজ—সকলের পক্ষেই ভালো; বস্তুত, অহিংস ব্যক্তিচরিত্রের গঠন দ্বারাই মৌলিক সামাজিক সংস্কার সম্ভব বলিয়া তিনি মনে করেন। কিন্তু হাক্স্‌লি কেবল সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রেই অহিংসার ব্যবহার দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। গান্ধীজির দর্শনে যেমন অহিংসার একটি সর্বব্যাপী প্রভাব রহিয়াছে, হাক্স্‌লির রচনায় তেমন নয়; তিনি কেবল স্থায়ী ও মৌলিক সামাজিক সংস্কার সাধনের জন্যই অহিংসার পথ নির্দেশ করিয়াছেন। গান্ধীনীতিতে যেমন ব্যক্তিগত পরিবর্তনের উপরে ঝোঁক, হাক্স্‌লির নীতিতে তেমন নয়; তিনি কেবল সামাজিক চেষ্টার মধ্যেই অহিংসার যথার্থ স্থান খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

গান্ধীজির বিপ্লব কল্পনাকে আমরা একটু বেশি ব্যক্তিচরিত্র-ঘেঁষা বলিয়া মনে করি। কিন্তু সামাজিক উদ্দেশ্য-সাধন কেবল সামাজিক নীতি অবলম্বনের দ্বারাই সম্ভব। সামাজিক জীবনে যুক্তি, নীতি এবং অহিংসা-মূলক পরিবর্তনকে হিংসামূলক বিপ্লবের চেয়ে বেশি বাঞ্ছনীয় বলিতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু এই প্রসংগে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রথমত, সামাজিক জীবনের নীচ হইতে যুক্তির ভিত্তিটা যখন ধ্বসিয়া পড়ে, জনসাধারণের সহিংস বিপ্লবচেষ্টা সাধারণত কেবল সেই সময়েই আত্মপ্রকাশ করে। অতএব, বিপ্লব প্রচেষ্টার অংগ হিসাবে হিংসাকে দেখিতে গেলে, তাহার পূর্ববর্তী অবস্থার পরিচয়টি অবলম্বন করিয়াই তাহাকে বুঝিতে হইবে। 'হিংসামূলক বিপ্লব নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে' এ কথা বলিয়া বিপ্লবকে ঠেকাইয়া রাখিবার উপায় নাই, বোধ হয় প্রয়োজনও নাই। সমাজতন্ত্র সহিংস বিপ্লবের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহাকে অবলম্বন করিয়া এমন একটি নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাহা বিপ্লবের পূর্ববর্তী অবস্থা হইতে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। এই দিক্ হইতে সহিংস বিপ্লবকে একেবারে দুর্নীতিমূলক কিংবা মূল্যহীন বলা সংগত কিনা, তাহাতে আমাদের সন্দেহ আছে। বরং প্রাক্-বিপ্লব অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া তাহার যথার্থ ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করার চেষ্টাই

অহিংস অথবা সহিংস—উভয়-প্রকার বিপ্লব-কামীদের পক্ষে সংগত এবং শোভন। সহিংস বিপ্লবকে কেবলমাত্র নিন্দা করিয়া তাহার উদ্ভব বন্ধ করা যায় না, এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, প্রাক্-সমাজতান্ত্রিক অবস্থা হইতে সমাজতন্ত্রে উপনীত হইবার লক্ষ্য লইয়া যে বিপ্লব চেষ্টা, তাহার পিছনে জনসাধারণের সমর্থন পূর্ণমাত্রায় থাকাই সম্ভব ; এবং জন-সাধারণের গরিষ্ঠ অংশের ইচ্ছার উপর সেই বিপ্লব-প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠিত হইবে, এরূপ ধারণা করা হয়তো অন্যায় হইবে না। বিপ্লব-প্রচেষ্টার পুরোভাগে ব্যক্তি বা দল-বিশেষের আধিপত্য থাকিলেও, আন্দোলনের ভিত্তি যে জনসাধারণের স্বাধীন ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য বিপ্লব-প্রচেষ্টা দীর্ঘায়ত হইলে, কিংবা বিপ্লবের অবসান ঘটিলে, কেন্দ্রগত ক্ষমতা সেই নেতা বা দলের হাতেই থাকিয়া যাইবে, জনসাধারণের কোনো সক্রিয় অংশ তাহাতে থাকিবে না ; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সমৃদ্ধি ও ধন-সাম্যের আদর্শ গুরুতর রূপে লংঘিত না হয়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংকোচন কেবল প্রতিবিপ্লবীদের (reactionaries) ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের ইচ্ছার পিছনে জনসাধারণের স ম র্থ ন ও থাকিবে না, এ কথা বলা অসংগত।

তৃতীয়ত, সুদক্ষ নেতৃত্বের প্রয়োজন যে কেবল হিংসামূলক বিপ্লব-প্রচেষ্টার জন্যই হয়, তাহা নয়। অহিংস বিপ্লবকে পরিচালনা করিবার জন্যও সংঘ-মনোবৃত্তি এবং নেতৃত্বের আবশ্যকতা সামান্য নয়। অতএব, নেতৃত্ব যদি জনসাধারণের কল্যাণকামী না হয় এবং ক্রমশ নিজেদের ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত না থাকে, তাহা হইলে বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য—অর্থাৎ জনসাধারণের স্বাধীনতা-বৃদ্ধি—বিফল হইতে বাধ্য। অবশ্য, সহিংস বিপ্লব-প্রচেষ্টায় যে কঠোর শৃঙ্খলা এবং শক্তিমান্ নেতৃত্বের প্রয়োজন, এবং অস্ত্রবলের সহায়তায় বিপ্লবকে জয়যুক্ত করিতে হইলে ক্ষমতার যে কেন্দ্রীকরণ আবশ্যক, অহিংস বিপ্লব-প্রচেষ্টায় ততদূর হইবার কথা নয় ; কিন্তু তাহা হইলেও প্রভেদটা যে পরিমাণগত, জাতিগত নয়, সে-কথা বুঝিবার প্রয়োজন

আছে।[৭৯] নেতৃত্বকে একেবারে বাদ দিয়া এবং নেতাদের শুভ-ইচ্ছাকে একেবারে অস্বীকার করিয়া, কেবলমাত্র জনসাধারণের স্বাধীন ও সমবেত চেষ্টার ফলে কোনো আন্দোলন প্রভূত সাফল্যলাভ করিতে পারিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তবে, আন্দোলনের সংগে সংগে জনসাধারণের স্বাধীন চিন্তা, ভবিষ্যৎ কল্পনা এবং আত্মবিশ্বাসকে প্রবুদ্ধ করাও যে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য, সে কথাও অস্বীকার করা চলিবে না।

বস্তুত, সাধারণ মানুষের সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতা-বিকাশের জন্য যে ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন, সাধারণ মানুষ যদি নিজের বুদ্ধি ও চেষ্টা দ্বারা সে ব্যবস্থাকে ধারণ করিয়া রাখিতে না পারে, তাহা হইলে কোনো উপায়েই তাহার মুক্তি আনিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। অহিংস অথবা সহিংস—উভয় প্রকার বিপ্লব-প্রচেষ্টাতেই, সেইজন্য, সাধারণ মানুষের শিক্ষাদীক্ষা ও সংগঠনের উপর জোর দেওয়া সমান আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি। গান্ধীজির অহিংস বিপ্লবের জন্য তাঁহার গঠন-কর্ম-পদ্ধতি সেইজন্য অপরিহার্য। কিন্তু সহিংস বিপ্লব-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াও জনসাধারণের শিক্ষাদীক্ষা ও সংগঠন-শক্তি এমন পর্যায়ে পৌছিতে পারে, যেখানে শাসকশ্রেণীর পক্ষে জনসাধারণের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। আজ রাশিয়াতে যদি ইহা সম্ভব না-ও হইয়া থাকে, তবে শাসকশ্রেণীর ক্ষমতা-লোলুপতা এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক বুদ্ধির অভাবের জন্যই তাহা হইয়াছে। চারিদিক হইতে প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়িয়াও হয়তো রাশিয়ার পক্ষে নূতন সমাজব্যবস্থাকে পরিপূর্ণরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা সম্ভব হয় নাই। তাই বলিয়া বিপ্লব-সঞ্জাত সমাজতন্ত্রের আমলে ক্ষমতা কেবল দলবিশেষের হাতেই কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকিবে, জনসাধারণ যতই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হোক না কেন সে ক্ষমতার মধ্যে তাহাদের কোনো অংশই থাকিবে না, এ কল্পনাকে খুব যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু তাহা হইলেও সহিংস বিপ্লবের কল্পনাকে আমরা অন্য কারণে একটু অবাস্তব ও অবাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে করি। বর্তমান শ্রেণী-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে

(বিশেষত, কোনো এক দেশে, কোনো একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে) জনসাধারণের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য কতকগুলি বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন ; ১৯১৭ সালের রাশিয়াতে এই ধরণের অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়াই সে দেশে সমাজতান্ত্রিক দল হিংস উপায়ে ক্ষমতা অধিকার করিতে পারিয়াছিল। সহিংস বিপ্লবের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া দল গঠন করার অর্থ হইল, এই ধরণের সুযোগ-সন্ধানকে স্বীকার করিয়া লইয়া সংগোপনতার আড়ালে সংগঠনকে কোনোমতে বাঁচাইয়া রাখা—কেন না, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সহিংস বিপ্লবের অধিকারকে কোনো রাষ্ট্রই স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। সেইজন্য সমাজতন্ত্রের আদর্শে যাঁহারা প্রকৃত বিশ্বাসী, তাঁহাদের সকলকে এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া এ কল্পনায় অসম্ভব। তাই, বাস্তব নীতি হিসাবে, সমাজতান্ত্রিক দলকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় হইল তাহাকে মানুষের যুক্তি ও নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করা ; এবং এই দলের নেতৃত্ব যাহাতে বিপথগামী না হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে দলের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীভূত করা। বস্তুত, ধনতন্ত্রের প্রথম যুগে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হইলে, তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সমাজতন্ত্রকে পুষ্ট করাই হইল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বাঞ্ছনীয় রীতি। কোনো দেশে কোনো কারণে হিংসামূলক বিপ্লব খানিকটা দোষেগুণে জড়িত অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া ইহাই যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের স র্বা পে ক্ষা বাঞ্ছনীয় রীতি এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। পক্ষান্তরে, হিংসার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই ইহাকে নিন্দা করিবার প্রয়োজন দেখি না। হিংসার প্রকাশ এবং সাফল্য—দুই-ই আকস্মিক ; যাহা আকস্মিক, তাহার নৈতিক মূল্য বিচার করা পণ্ডশ্রম মাত্র।

সেইজন্য বাস্তব এবং বাঞ্ছনীয় উপায় হিসাবে সমাজতন্ত্রকে যুক্তি, নীতি ও গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার আবশ্যকতা আমরা অস্বীকার করিব না। এ উপায়ে সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন ও বিস্তার দ্রুত এবং চমকপ্রদ হইবে না সত্য ; কিন্তু ইহার ভিত্তি হইবে দৃঢ়, এবং হিংসামূলক সমাজতন্ত্রের জটিল সমস্যাগুলি এ পথে

অনেকটা সরল ও সমাধান-সাধ্য হইয়াও দাঁড়াইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধনিকশ্রেণীর উচ্ছেদের কথা ধরা যাক। হিংসামূলক সমাজতন্ত্রে ধনিকশ্রেণীর উচ্ছেদ অর্থে ধনিক ব্যক্তির নির্বাসন কিংবা প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা; আমাদের কল্পনায় রাষ্ট্রের মাধ্যমে ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতা-হ্রাস এবং ধনসাম্য সংস্থাপনই মূল উদ্দেশ্য। অবশ্য, এ কল্পনার সহিত গান্ধীজির অহিংস সমাজের কল্পনা প্রায় সমান্তরাল। কিন্তু গান্ধীজির কল্পনা যেমন অহিংসানীতি এবং ব্যক্তি-চরিত্রের পরিবর্তনের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের কল্পনা তেমন নয়। আমরা রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রকে প্রসারিত করিয়া তাহার সাহায্যে ধনিকশ্রেণীকে ধীরে ধীরে ক্ষমতাচ্যুত করিতে চাই। গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচারের দ্বারা ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধতাকে জয় করা যেমন সহজ, হিংসামূলক পীড়নের দ্বারা তেমন নয়। কিন্তু মুষ্টিমেয় ধনিকের বিরুদ্ধতা যাহাতে জনসাধারণের গরিষ্ঠ অংশের ইচ্ছাকে ব্যাহত না করে, তাহার নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সেই ব্যবস্থাই গণতন্ত্র। অতএব, সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য "হিংসার তপস্যা" কিংবা "অহিংসার তপস্যা", কোনটি করিব—এ প্রশ্ন মীমাংসা করা নিষ্প্রয়োজন; প্রকৃতপক্ষে অহিংস অথবা সহিংস বিপ্লব-রীতির কথা না ভাবিয়া, গণতন্ত্রের প্রসারের জন্য কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা সংগত, তাহাই আমাদের চিন্তা করা উচিত। পূর্বে বলিয়াছি, প্রত্যেকটি ক্ষমতা-কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এক একটি সংগঠন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করাই গণতন্ত্র-প্রয়াসী দলের প্রথম সাধনা। অবশ্য, ক্ষমতার অত্যাচার দুর্বার হইয়া উঠিলে অহিংস প্রতিরোধ-রীতি অবলম্বন করিবার কথা বিবেচনা করিতেই হইবে, এবং জনসাধারণ এই রীতির সহিত পরিচিত হইতে পারে, এমন ব্যবস্থা প্রথম হইতেই করিতে হইবে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, দীক্ষা এবং সংগঠনের বিস্তার হইলে ধনিকশ্রেণীর পক্ষে ক্ষমতার অধিকার দাবি করাই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং অহিংসার মূল্য আমরা অস্বীকার করিতেছি না; অন্তত উপায় হিসাবে, ইহাদের কার্যকারিতাকে ছোটো করিয়া দেখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনার প্রসার

এবং দৃঢ়মূল সংগঠনই যে গণতন্ত্র-সাধনার প্রধান অঙ্গ, এ কথাও খুলিয়া বলা প্রয়োজন।

—৮—

বিগত কয়েক অধ্যায় ধরিয়া গান্ধী-কল্পনার আলোচনা ও সমালোচনা প্রসংগে বর্তমান লেখকের চিন্তাধারা নিশ্চয়ই পাঠকের নিকটে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। স্থায়ী আর্থিক ব্যবস্থা হিসাবে রাষ্ট্রনিরপেক্ষ বিকেন্দ্রীকরণকে তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই,—সেইজন্য রাষ্ট্রকে গণতন্ত্র-সম্মত ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার সাধনাকে তাঁহার প্রাধান্য দিতে হইয়াছে। ইহার আনুষঙ্গিক উপায় হিসাবে অহিংস প্রতিরোধ তাঁহার কল্পনায় স্থান পাইয়াছে, এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপুষ্টির জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ যে অপরিহার্য, এ কথাও তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তবে, সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতার হাতে শিক্ষা ও মৌলিক শিল্পগুলির বিস্তারের ভার তুলিয়া দেওয়াও (তাহাতে যতই বিপদ থাক না কেন) যে একান্ত আবশ্যক, এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই।

বস্তুত, অভিজ্ঞ পাঠকের কাছে বর্তমান লেখকের কল্পনাকে ফেবিয়ান্-সমাজতন্ত্র এবং গান্ধীতন্ত্রের এক অবাস্তব, অদ্ভুত সমন্বয় বলিয়া মনে হইতে পারে। ইহার জন্য কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, গান্ধীতন্ত্র ব্যক্তিচরিত্র এবং তাহার পরিবর্তনকে অনুচিত প্রাধান্য দিয়া তাহার কল্পনাকে একটু অবাস্তবের কোঠায় নিয়া ফেলিয়াছে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অহিংস হইয়া উঠিবে, প্রত্যেক ধনিক তাহার ধনকে উপনিধির মতো ব্যবহার করিবে, এ কথা স্বীকার করিয়া লইলে যন্ত্রশিল্প, ক্ষমতার অপব্যবহার, বিকেন্দ্রীকরণ, ইত্যাদির কথা প্রায় অবাস্তর হইয়া দাঁড়ায়। যদি জনসাধারণের মধ্যে অহিংস প্রতিরোধ-শক্তি এবং স্বাবলম্বন চেষ্টা জাগাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ধনিক শ্রেণীর

অত্যাচার এবং শোষণ হইতে তাহারা মুক্ত হইতে পারে হয়তো, কিন্তু তাহাদের সমবায়-শক্তি রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার দ্বারা সংহত না হইলে পরিপূর্ণ সামাজিক জীবন যাপন করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। ব্যক্তিকে এইভাবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে গিয়া গান্ধীজি ব্যক্তির প্রকৃতিকেও অস্বীকার করিয়াছেন। সাধারণ মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অনুকরণপ্রিয়। সেইজন্য ব্যক্তিকে নিজের চেষ্টায় উদার ও অহিংস হইতে বলার অর্থ, তাহার এই অনুকরণ-প্রবৃত্তিকে ছোটো করিয়া দেখা। বস্তুত, সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে মানুষ যত সহজে উদার হইতে পারে, ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ক্ষেত্রে তত সহজে নয়। সেইজন্য সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে উদারতার নীতি গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তির পক্ষে ঔদার্য কিংবা মহত্ত্বের সাধনা করা বড়ো কঠিন। অবশ্য, ব্যক্তিগত প্রভাব, ব্যক্তির সংস্কার, এবং ব্যক্তিগত উৎসাহের দ্বারাই সামাজিক নীতি গঠিত হয়; কিন্তু তাহা হইলেও ব্যক্তিকে সমাজের পাদপীঠে দাঁড়াইয়া নিজের পরিচয় দিবার সুযোগ দেওয়া না হইলে, সমাজের পরিবর্তন সহজসাধ্য হয় না। সেইজন্য ব্যক্তিচরিত্রের পরিবর্তনকে যাহাতে সামাজিক রূপ দেওয়া সম্ভব হয়, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাহায্যে তাহাই করা আমাদের কর্তব্য। পূর্বে বলিয়াছি, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধটি একটি ধারণাতিগ (imponderable) বস্তু। ব্যক্তির পরিবর্তন, অন্তত ব্যক্তিসংস্কারের পরিবর্তন, না হইলে সমাজসংস্কার সম্ভব নয়; কিন্তু এই পরিবর্তনকে সংহত করিয়া সমাজদেহে রূপ দিতে হইলে ব্যক্তির পরিবর্তনকে সমাজে পরিব্যাপ্ত ও সঞ্চারিত হইবার সুযোগ দিতে হইবে। আর অল্পসংখ্যক বিরুদ্ধবাদী যাহাতে অধিকাংশ লোকের ইচ্ছাকে প্রতিহত না করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অপরিহার্য; বস্তুত, বহুব্যাপক অথচ স্বেচ্ছামূলক সামাজিক পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তিগত পরিবর্তনকে প্রাধান্য না দিয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসাধনাকে প্রাধান্য দেওয়াই অধিকতর ফলপ্রদ উপায় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। সেইজন্য স্বতন্ত্র ভারতের রূপ কল্পনা করিতে গিয়া গান্ধীজি যেখানেই রাষ্ট্রকে উপেক্ষা করিবার

নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে, সেখানেই তাঁহার কল্পনাকে আমরা সন্দেহের চোখে দেখিয়াছি, প্রসন্নচিত্তে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু ব্যক্তিচরিত্রের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে গিয়া গান্ধীজি খুব ভুল করিয়াছিলেন কি ?

একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গান্ধীজির অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার উদ্ভবকালটি[৪০] ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসে এক সংকটময় কাল। বিদেশী ধনতন্ত্রের রসে পুষ্ট এক স্বেচ্ছাচারী শাসনের কবলে পড়িয়া জনসাধারণ নিষ্পেষিত ; এদিকে দেশীয় ধনতন্ত্র জনসাধারণের কল্যাণকে উপেক্ষা করিয়া লাভ ও লোভের ভিত্তির উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিকে শাসন, অন্যদিকে শোষণ, একদিকে রাজশক্তির উপেক্ষা, অন্যদিকে দেশী ধনতন্ত্রের নিপীড়ন—ইহার মধ্যে সাধারণ মানুষ বিহ্বল ও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। সাহায্যের জন্য তাহারা যখন বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল, তখন গান্ধীজি তাহাদের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলিলেন ; তাহারা চাহিয়াছিল রাষ্ট্রের দিকে, গান্ধীজি তাহাদের ডাক দিলেন গ্রামের দিকে। শুধু তাই নয়। গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্রনিরপেক্ষ কতকগুলি সংঘ সৃষ্টি করিয়া গ্রামবাসীদের আত্মবিশ্বাসকে ফিরাইয়া আনিতে চাহিলেন তিনি ; গ্রামের অন্নে তাহাদের ক্ষুধা দূর করিয়া, গ্রামের বস্ত্রে তাহাদের লজ্জা নিবারণ করিয়া তিনি গ্রামের মানুষকে পার্থিব সম্পদ্ আহরণ করিবার কৌশলটিও শিখাইয়া দিলেন। ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে ব্যক্তির উপর প্রাধান্য দিবারই বোধহয় প্রয়োজন ছিল, এবং সে প্রয়োজন ভবিষ্যতেও যে একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে তাহাও হয়তো নয়। "মানুষ মহৎ না হইলে রাষ্ট্র বড়ো হইতে পারে না"—এ কথা বুঝাইয়া দেওয়ার আবশ্যকতা তখন সামান্য ছিল না ; কেবল সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ চেষ্টা এবং প্রয়াসের ফলেই রাষ্ট্রক্ষমতাকে কল্যাণ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা চলে, ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কিন্তু গান্ধীজির প্রচারের ফলে যদি এই ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকে যে, কতকগুলি বিক্ষিপ্ত কেন্দ্রে যে-কোনো উপায়ে অন্নবস্ত্রের সংস্থান

করাই গঠনকর্মের মূল উদ্দেশ্য, তাহা হইলে তাহাতে মানুষের বৃহত্তর সাধনাকে উপেক্ষা করা হইয়াছে মাত্র—রাষ্ট্র-সাধনাকে অবহেলা করিয়া কোনো গঠনকর্মই পূর্ণাংগ হইতে পারে না। ব্যক্তিকে কেবল তাহার নিজের কথা ভাবিতে শিখাইলে চলিবে না, রাষ্ট্রের সহিত তাহার সংযোগ কোথায় এবং কতটুকু, সে কথাও তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। সেই সংগে তাহার নিজের ক্ষমতা ও দায়িত্বের কথা, রাষ্ট্র-বহির্ভূত সংগঠনগুলির সহিত তাহার সম্বন্ধের কথা, এবং সংঘশক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রকে সুপরিচালিত করিবার কথাও তাহাকে বুঝিয়া নিতে হইবে। ব্যক্তির চরিত্র—তাহার শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার, দায়িত্বজ্ঞান ইত্যাদি গুণই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি।

ফেবিয়ান্-মার্কা সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রশাসনের ও রাষ্ট্রিক সংগঠনকেই তাহার শেষ কথা বলিয়া ধরিয়া লইতেছে। ব্যক্তিপ্রধান ধনতন্ত্রের আমলে যাহা কিছু অসংগত, অসুন্দর এবং অশোভন, তাহাকে সুন্দর ও সংযত করিবার ভার রাষ্ট্রের। জমি-জমা ও কলকারখানার উপর কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের হাতে ছাড়িয়া দাও, সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে। রাষ্ট্রনীতির প্রতি এই অগাধ বিশ্বাসকে আমরা খুব সহজে গ্রহণ করিতে পারি না। রাষ্ট্রশাসনের অপেক্ষা রাষ্ট্রকে সংযত রাখা যে অনেক বেশি দুরূহ, ফেবিয়ান্-মার্কা সমাজতন্ত্রে তাহার আভাস নাই। রাষ্ট্রকে সংযত রাখিবার এই দায়িত্ব ব্যক্তির ও স্বেচ্ছা-সমবায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির,—তাহাদের সংগঠন ও প্রতিরোধ-শক্তির উপর রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতা নিরোধ করিবার ভার। সেইজন্য আর্থিক ব্যবস্থার কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেওয়াই যথেষ্ট নয়, রাষ্ট্র যাহাতে আর্থিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া যথেচ্ছাচার না করিতে পারে, তাহাও লক্ষ্য রাখা সমান প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ-ভারকে বিভিন্ন কেন্দ্রে ছড়াইয়া দেওয়ার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রকে বজায় রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়াই ব্যক্তির বিকাশকে ও ব্যক্তিগত দায়িত্বকে প্রাধান্য দিতে হইবে। ব্যক্তিত্বের আলোককে রাষ্ট্রের দর্পণের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। ইহাই আমাদের কল্পনা।

—১০—

উপরের আলোচনা হইতে ইহা অনুমান করা পাঠকের পক্ষে অসংগত নয় যে, সাধারণ সমাজতন্ত্র যেমন প্রত্যেক শিল্পকর্মকে রাষ্ট্রের একটি অংগ বা দপ্তর (department) রূপে পরিণত করিতে চায়, আমাদের কল্পনা তাহাকে সমর্থন করিতে পারে না। যে ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি শিল্প রাষ্ট্রের কর্মবিভাগে পরিণত হয়, তাহার মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সংকুচিত হয় এবং ব্যক্তিগত দায়িত্বকে একটা অস্পষ্ট রাষ্ট্রিক দায়িত্বে পরিণত করিবার চেষ্টা সেখানে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আগামী কালের ভারতবর্ষে প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে স্বাধীন বিকাশের সুযোগ পায়, নিজের দায়িত্বকে যাহাতে নিজে বহন করিতে পারে, সে ব্যবস্থা করিতে হইলে শিল্পের মধ্যে ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও দায়িত্বের প্রকাশকে সার্থক করিতে হইবে—অর্থাৎ, শিল্প যাহাতে রাষ্ট্রের সাধারণ অংগ মাত্র না হয়, তাহার একটি 'স্বাধীন' সত্তা রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা স্বীকৃত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। শুধু গ্রাম-সমাজের বিকেন্দ্রীকরণ নয়, শিল্প-ব্যবস্থার (তাহা গ্রামে বা নগরে, যেখানেই থাক্ না কেন) বিকেন্দ্রীকরণও আমাদের কল্পনার অংগীভূত।

বলা বাহুল্য, অবাধ ধনতন্ত্রে ব্যক্তির যে প্রাধান্য, আমাদের কল্পনায় সেরূপ প্রাধান্য তাহাকে দেওয়া সম্ভব নয়। অবাধ ধনতন্ত্রে শিল্পের উপর কর্তৃত্ব কেবল ধনিকের, সাধারণ শ্রমিকের কোনো অংশ তাহাতে নাই। সেখানে কেবল মুষ্টিমেয় ধনিকের পক্ষেই শিল্পপতি হওয়া সম্ভব, সাধারণ অবস্থার লোকের পক্ষে ধনিকের অনুগ্রহভাগী হওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। অবাধ ধনতন্ত্রে যে-কোনো ধনিক অন্য ধনিকের শিল্প কিনিয়া লইতে পারে, নিজের প্রাধান্য নিরংকুশ করিবার জন্য মিথ্যা প্রচার ও ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিবার পক্ষে তাহার কোনো বাধা নাই। আমাদের কল্পনায় শিল্পের উপর কর্তৃত্ব ধনিক ও শ্রমিকের উপর সমভাবে ন্যস্ত হইবে; সাধারণ মানুষ সমবায়-পদ্ধতিতে শিল্প

গড়িয়া তুলিতে চাহিলে রাষ্ট্র তাহাকে সহায়তা করিবে; প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে প্রকাশ্যভাবে তাহার কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করিতে বাধ্য করা হইবে, এবং বড়ো বড়ো শিল্পে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে পরিচালক নিয়োগ করিতে হইবে। ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিলেও তাহার ক্ষমতালিপ্সাকে সর্বদা রাষ্ট্র-শাসন ও সংঘ শাসনের দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। ব্যক্তিকে সর্বদা সংঘের দ্বারা নিযুক্ত কর্মচারী হিসাবে সংঘের প্রতি নিজের দায়িত্ব স্মরণ রাখিয়া কাজ করিবার অভ্যাস অর্জন করিতে হইবে। সংঘকে ব্যক্তির উপর সর্বদা এই দাবী জানাইতে হইবে। স্বতন্ত্র ভারতবর্ষে আর্থিক সংগঠন এই বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিবে, ইহাই আমাদের কল্পনা।

এ ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তিগত কৃতিত্বকে আর্থিক প্রেরণা দিবার ব্যবস্থা থাকিলেও তাহাতে খুব বেশি ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যেক সমাজে ক্ষমতার বৈষম্য ও তারতম্য থাকা স্বাভাবিক; সে ক্ষমতা যাহাতে উন্মার্গগামী হইয়া অপরের ক্ষতি সাধন করিতে না পারে সমাজের দায়িত্ব তাহাই মাত্র। ব্যক্তিগত কৃতিত্বকে ব্যক্তিগত আয়ে রূপান্তরিত করিবার স্বাধীনতা সকলেরই থাকা উচিত, কিন্তু অপরের তাহাতে ক্ষতি না হয়, সে ব্যবস্থাও থাকা সঙ্গত। আবার বক্তিগত কৃতিত্বের সাহায্যে জীবিকার ন্যূনতম মান সংস্থান করা যাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য, সামাজিক সাধ্য-অনুসারে তাহাদিগকে সাহায্য করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য। কাহাকেও অতিরিক্ত আয় হইতে বঞ্চনা করা সংগত নয়, এ কথা যেমন সত্য, অন্য কেহ ক্ষুধার্ত বা কর্মাভাবগ্রস্ত থাকিলে সেই আয় তাহাকে নিজের ইচ্ছা মতো ভোগ করিতে দেওয়া উচিত নয়, এ কথাও সমান সত্য। স্বতন্ত্র ভারতবর্ষের আর্থিক ব্যবস্থায় এই উভয় সত্যই যাহাতে সমান মর্যাদা লাভ করে, গণতন্ত্রী হিসাবে তাহা আমাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু।

আগামী কালের ভারতবর্ষে রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা এবং তাহার সীমানির্ধারণ—নীতি হিসাবে এই উভয় নীতিকেই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আর্থিক জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই নীতিগুলিকে

কী ভাবে, কতদুর পর্যন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে, আমাদিগকে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে স্বতন্ত্র ভারতের সহিত বহির্জগতের আর্থিক সংযোগ কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা ভারতবর্ষকে বহির্জগতের পটভূমিকায় নিরীক্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি নাই ; আভ্যন্তরীণ আর্থিক শৃঙ্খলার জন্যই রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য, ইহাই ছিল আমাদের মুল বক্তব্য। কিন্তু বাস্তব আলোচনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে বাহিরের জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া ধরিয়া লইলে তো চলিবে না[৮১] ; বাহিরের পৃথিবীর গতিপ্রকৃতির সহিত তাল রাখিয়াই তাহাকে চলিতে হইবে। একাদশ অধ্যায়ে স্বতন্ত্র ভারতবর্ষের আর্থিক সংগঠনের এই বহির্জাগতিক দিকটি লইয়া আমরা আলোচনা করিব।

—১১—

যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, বিকেন্দ্রীভূত শিল্প ব্যবস্থার সাহায্যে ভারতবর্ষের অগণিত জনসাধারণের ন্যূনতম আর্থিক সমৃদ্ধি সংস্থান করা সম্ভব, তাঁহাদেরও এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষ জগতের বহু দেশের মধ্যে একটি দেশ মাত্র এবং সেইজন্য অন্যান্য দেশের আর্থিক জীবন-সংগঠনের প্রণালী দ্বারা ভারতবর্ষের আর্থিক জীবন প্রভাবিত হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক।[৮২] ভারতবর্ষ যদি অতিরিক্ত আর্থিক সমৃদ্ধির মোহ পরিত্যাগ করিয়া, বিকেন্দ্রীভূত শিল্পকে বরণ করিয়া লয়, তাহা হইলেও এই সকল শিল্প যাহাতে বিদেশি শিল্পের চাপে পড়িয়া নির্মূল হইয়া না যায়, সেই দায়িত্ব এড়াইয়া গেলে তাহার চলিবে না। ইহার ফলে হয় গ্রাম-সমাজ নয় তো রাষ্ট্রকে ক্রেতার স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। ইহাতে কেবল যে সাধারণ ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত অতিরিক্ত শ্রম ও সময় ব্যয় করিতে হইবে, তাহাই নয় ; অন্যান্য ধনিক দেশের নিকট হইতে নানারূপ বাধাবিঘ্নের সম্মুখীনও হইতে হইবে। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও বিভিন্ন ধনিক শ্রেণীর প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া যে-আর্থিক

ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষকে সেই ব্যবস্থার ভিতরে থাকিয়াই নিজের আর্থিক জীবন সংগঠন করিতে হইবে। এই পরিবেশের মধ্যে বিকেন্দ্রীভূত শিল্পব্যবস্থার সংরক্ষণ একপ্রকার অসম্ভব।

আর্থিক দেনাপাওনার বৃদ্ধির সংগে সংগে পুরাতন, বিকেন্দ্রীভূত অর্থ নৈতিক সংগঠন কেমন করিয়া বিধ্বস্ত হইয়া গেল, সে ইতিহাস আজ সুপরিজ্ঞাত।[৮৩] কোনো সামাজিক বিধিনিষেধই ব্যক্তিকে সস্তায়-জিনিষ-কিনিবার-মোহ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। ব্যক্তিকে আত্মনির্ভর হইবার উপদেশ দিয়াও এই মোহ বিদূরিত করা সম্ভব হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কেন না, যে-পরিশ্রম দ্বারা ব্যক্তি সকলপ্রকারে স্বাবলম্বী হইতে পারে, তাহার চেয়ে অল্প পরিশ্রমের বিনিময়ে যদি সে সকল প্রয়োজনীয় জিনিষ পাইতে পারে, তবে সে শেষোক্ত পথই অবলম্বন করিবে। ইহা তাহার প্রকৃতি; ব্যক্তিগত অর্থ নৈতিক জীবনের ইহা মূল তথ্য। যে জিনিষগুলি সে পাইল, তাহার ইতিহাস কী, তাহার পিছনে কত অত্যাচার, কত বঞ্চনা জমা হইয়া আছে, সে সংবাদ তাহার পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, অনেক ক্ষেত্রে সে সংবাদ রাখাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। কাজেই রাষ্ট্র যদি-বা দেশীয় শিল্পব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীভূত করিতে প্রয়াসী হয়, সাধারণ মানুষ বিদেশী বণিকের নিকট হইতে সস্তায় মাল কিনিয়া তাহার সেই প্রয়াসকে বিফল করিবে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর কঠোর হস্তক্ষেপ দ্বারা ইহার প্রতিকার করিতে গেলেও তাহার ফল খুব শুভ হইবে না। জনসাধারণের দৃঢ় ইচ্ছার দ্বারা অবশ্য বিকেন্দ্রীকরণকে রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব নয়, কিন্তু অনেকাংশে অবাস্তব এবং, সাধারণ আর্থিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই তাহা অবাঞ্ছনীয়ও বটে। সেইজন্য স্বতন্ত্র ভারতের অর্থ নৈতিক .সংগঠনে উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণকে আমরা সমর্থন করিতে পারি না। ভারতবর্ষ যে সকল ভোগ্য সামগ্রী উৎপাদন করিবে তাহদের জন্য অন্য দেশের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য তাহাকে না দিতে হয়, সে ব্যবস্থা যথাসম্ভব অবলম্বন করিতেই হইবে। তবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না, এমন নয়।

এমন অনেক শিল্প আছে যেখানে ভারতবর্ষের উৎপাদন ব্যয় বর্তমান সময়ে অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ এত নগণ্য যে সেই কারণেই ব্যয়ের অংক অতিরিক্ত হইয়া দাঁড়ায়। অথচ, কিছু মূলধন নিয়োগ করিতে পারিলে এই শিল্পগুলিকে সুগঠিত ও সংস্কৃত করা অত্যন্ত সহজ। উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়া এই শিল্পগুলিকে অন্যান্য দেশের শিল্পের সমকক্ষ করিয়া তোলা হইবে আমাদের কর্তব্য। সম্ভব হইলে, কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এই শিল্পগুলির সংগঠন ও সংস্কার করাই অধিকতর সংগত। অন্যথায় সাময়িকভাবে সংরক্ষণের নীতি (policy of protection) অবলম্বন করাও অসংগত হইবে না।

ভারতবর্ষ যাহা কিছু উৎপাদন করিবে, তাহার সমস্তই নিজের ভোগের জন্য, কিংবা যাহা-কিছু ভোগ করিবে, সমস্তই নিজে উৎপাদন করিয়া লইবে, এই চূড়ান্ত স্বাবলম্বনের নীতিও (autarkic policy) আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।[৮৪]

পারস্পরিক প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য দেশের সহিত চুক্তি করিয়া সেই অনুসারে নিজের উৎপাদন-নীতি নির্ধারণ করাই তাহার পক্ষে সংগত। এ ব্যবস্থায় অবশ্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে দ্রুত-পরিবর্তনশীল (elastic) করিয়া তোলা অপরিহার্য কিন্তু শিল্প-ব্যবস্থা বর্তমান জগতে এত দ্রুত-পরিবর্তনশীল নয়। সেইজন্য বহির্বাণিজ্য যাহাতে দেশের অভ্যন্তরে গুরুতর বেকার সমস্যার সৃষ্টি না করে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্তমান জগতে যে-কোনো দেশের বেকারসমস্যা একটি আন্ত-র্জাতিক সমস্যা বলিয়া স্বীকৃত হওয়া উচিত; প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের জীবিকার মান সমভাবাপন্ন না-হওয়া পর্যন্ত সমৃদ্ধিশালী দেশের প্রাচুর্য যাহাতে দরিদ্র দেশের জীবিকাকে উন্নত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, সে ধরণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু পৃথিবীতে এতগুলি বিরুদ্ধভাবাপন্ন রাষ্ট্র থাকিতে এ কল্পনা প্রায় আকাশকুসুমের মতো। সেই জন্য, অন্তত সমৃদ্ধিশালী দেশের প্রাচুর্যের ব্যবস্থা যাহাতে দরিদ্র দেশের জীবিকার মর্মমূলে আঘাত না করে,

তাহার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার স্বাধীনতা দরিদ্র দেশগুলিকে অর্জন করিতে হইবে। অতএব, দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্য কিংবা কর্মাভাব-সমস্যার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য তাহারা যাহাতে সাময়িকভাবে বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে কর্মাভাবের সমস্যা এত গুরুতর যে তাহার পক্ষে একক এ সমস্যার সমাধান করা হয়তো কোনো-ক্রমেই সম্ভব নয়। সেইজন্য বহির্জগতের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা তাহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। অবশ্য, চারিদিকে শুল্কের (tariffs) প্রাচীর তুলিয়া নানা ছোটো আকারের শিল্পে এই বৃহৎ জনসমষ্টির কর্মসংস্থান করা হয়তো একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু তাহার জন্যও অন্যান্য দেশের সহযোগিতা আবশ্যক; এবং ইহার ফলে আর্থিক জীবনের সমৃদ্ধি নিতান্ত ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

বস্তুত, বহির্জগতের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষকে দেখিতে গেলে, তাহার আর্থিক জীবনকে কেবল অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানব্যবস্থা বলিয়া ধরিয়া লইলেই চলিবে না। ইহার মধ্যে বর্তমান অরাজক জগতের কতকগুলি অপরিহার্য দাবীরও স্থান করিয়া দিতে হইবে। আমরা দেশরক্ষার (defence) কথা বলিতেছি। যদিও 'যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিকেই শান্তির ব্যবস্থা' বলিয়া বর্ণনা করা আমাদের পক্ষে অসংগত, তবুও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার ব্যবস্থা এবং সম্মিলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার (collective security) মধ্যে নিজের অংশ গ্রহণ করিবার উপায়, অর্থ নৈতিক সংগঠনের অন্যতম অংগ বলিয়া আমাদের মানিয়া নিতে হইবে। আর্থিক জীবনের একান্ত বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা দেশরক্ষা-ব্যবস্থা ব্যাহত না হয়, ইহা লক্ষ্য রাখার বিষয়। কিন্তু সেইসংগে দেশরক্ষা উপকরণের স্তূপ যাহাতে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখকে আচ্ছন্ন করিয়া না ফেলে, তাহাও দেখিতে হইবে। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের পক্ষে এই দুই নীতির সামঞ্জস্য সাধন বোধহয় সর্বাপেক্ষা দুরূহ কর্তব্য। কেন না, ইহার মধ্যে শান্তি এবং যুদ্ধ, উভয় ক্ষেত্রেই প্রমাদ এবং অনুতাপ করিবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। শান্তির সময়ে দেশ-

রক্ষার ব্যবস্থাকে ক্ষীণ করিয়া, যুদ্ধের সময়ে হাহাকার করিবার যেমন অর্থ হয় না, তেমনি 'মাখনের পরিবর্তে আগ্নেয়াস্ত্র' নীতিও[৮৫] শান্তির সময়ে বীভৎস বলিয়া মনে হয়। যেহেতু এই সিদ্ধান্ত সর্বাপেক্ষা দুরূহ, সেই হেতু সর্বাধিক গণতান্ত্রিক উপায়ে এই সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হওয়া সংগত। তাহা হইলে, জনসাধারণ অন্তত নিজেদের সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করিয়া বঞ্চিত হইবার সুখটুকু অনুভব করিতে পারিবে।

সে যাহাই হোক্, আর্থিক উৎপাদন যাহাতে সাধারণ সমৃদ্ধি ও দেশরক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারে, রাষ্ট্রের বিধান দ্বারা তাহার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। অবাধ ধনতন্ত্রে—বিশেষত, অস্ত্র-উৎপাদন ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব না থাকিলে এই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। অতএব গণতন্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্তকে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে রূপ দিবার জন্য আর্থিক জীবনের এই অংশটির—অর্থাৎ দেশরক্ষা শিল্পের (defence industries)—উপর রাষ্ট্রের অখণ্ড কর্তৃত্ব থাকা প্রয়োজন।

—১২—

সমাজবদ্ধ জীবনের মৌলিক নীতি হিসাবে ন্যূনতম জীবিকার সংরক্ষণ, প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির উপযুক্ত কর্ম-সংস্থান এবং দেশরক্ষা ব্যবস্থার উপায় নির্ধারণ, প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রের মতো স্বতন্ত্র ভারতের রাষ্ট্রকেও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই নীতিগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া এবং ইহাদিগকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য, বিকেন্দ্রীভূত বহু সংঘ ও সংগঠনের প্রয়োজন হইবে—এবং রাষ্ট্র যাহাতে এই সংঘগুলির মর্যাদা লংঘন না করে, সমবেত সাধনার দ্বারা সর্বদা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাই হইবে ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রাথমিক কর্তব্য। এই সকল সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিদেশের সহযোগিতা কখনো অপরিহার্য, কখনো বা কেবল বাঞ্ছনীয় মাত্র; কিন্তু সে সহযোগিতা কোনো-কারণে দুর্লভ হইলেও আমাদের বিশাল দেশে নিতান্ত দুর্বল হইয়া থাকিবার

মতো কোনো কারণ আমাদের নাই। অথবা, সেই সহযোগিতার জন্য প্রাপ্তির-অধিক মূল্য দিবার প্রবৃত্তিও আমাদের আর নাই। তথাপি এ কথা স্মরণ করা ভালো যে, একান্ত স্বাবলম্বী নীতি গ্রহণের ফলে আমাদের জাতীয় আয় বর্ধিত করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ হইবে এবং আমাদের সামান্য আয় হইতে উপযুক্ত অর্থ নৈতিক সংগঠনের জন্য অত্যাবশ্যক মূলধন সংগ্রহ করিতে আমাদের অনেক সময় কাটিয়া যাইবে এবং বহু বেগ পাইতে হইবে। অতএব ভারতবর্ষ তাহার আর্থিক সংস্থাকে উন্নত করিবার জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইবে কিনা, অন্য দেশের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবে কিনা, স্বতন্ত্র ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনে ইহা এক মূল প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইবে।

প্রশ্নটি বিবেচনা করিবার আগে বিদেশের সাহায্য ছাড়া ভারতবর্ষ কী পরিমাণ মূলধন সঞ্চয় করিতে পারে, তাহা পুংখানুপুংখ রূপে অনুসন্ধান করা কর্তব্য। বিস্তারিত তথ্য ও সংখ্যার সাহায্যে এ আলোচনা সম্পূর্ণাংগ করিয়া তোলা অব্যবসায়ীর পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে, বাৎসরিক জাতীয় আয় (annual national income) আমাদের বাৎসরিক জাতীয় ব্যয় অপেক্ষা এমন কিছু অধিক নয় যে, তাহা হইতে কোনো বড়ো-রকমের মূলধন-সঞ্চয় (capital fund) গড়িয়া তোলা চলে। ব্যক্তিগত সঞ্চয় (individual hoards) আমাদের দেশে খুব অপ্রচুর নয়, বিশেষত দেশীয় রাজন্যবর্গের সঞ্চয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে নানা প্রকার কিংবদন্তী শুনিতে আমরা অভ্যস্ত; কিন্তু এই অথবা সঞ্চয় হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে মূলধনরূপে ব্যবহার করা কতদূর সম্ভব, তাহা বিবেচনার বিষয়। এই দুই উপায় ভিন্ন অন্য যে-উপায়েই মূলধন সঞ্চয় করিতে যাই না কেন, তাহার দ্বারা জীবিকা-মানকে ক্ষুণ্ন করিতে হইবে।[৮৬] ধনী এবং দরিদ্র—ইহাদের কাহার জীবিকা কতদূর ক্ষুণ্ন করা সম্ভব ও সংগত, তাহার হিসাব নির্ধারণ করিতে হইবে। আমাদের দেশে আয়বৈষম্য (inequality of incomes) কী পরিমাণ, সে সম্বন্ধেও সঠিক নির্ধারণ হয় নাই। একমাত্র এই সকল সংখ্যাতত্ত্বের অভাবের জন্যই

আমাদের পক্ষে সুনির্দিষ্ট কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা পূর্ণাবয়ব করিয়া তোলা অসম্ভব।

আমাদের প্রচলিত হিসাব অনুযায়ী ১৯৩১-৩২ সালে বৃটিশ ভারতের জাতীয় আয় ছিল ১৬৮৯ কোটি টাকার মতো।[৮৭] ইহার মধ্যে বাৎসরিক সঞ্চয় খুব বেশি করিয়া ধরিলেও শতকরা দশ টাকার বেশি হইবে না। অর্থাৎ বাৎসরিক সঞ্চয়ের পরিমাণ সাধারণত ১৬৯ কোটি টাকার বেশি হইবে না।[৮৮] ব্যক্তিগত সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ সাধারণত ৬০০ কোটি টাকা বলিয়া ধরা হয়; ইহার মধ্যে যদি অর্ধাংশও আর্থিক সংগঠনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে এই সঞ্চয় হইতে ৩০০ কোটি টাকা আমরা সংগ্রহ করিতে পারি। ভারতবর্ষের জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৫ ভাগ, মাত্র শতকরা ১ ভাগ লোকের হাতে আসে। বাকি ৩৫ ভাগের মধ্যে, ৩৩ ভাগ ভোগ করে শতকরা ৩২ জন লোক এবং অবশিষ্ট ৩২ ভাগ লইয়া ভারতবর্ষের শতকরা ৬৭ জন অধিবাসীকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এই বৈষম্য মূলক ধনবণ্টন-ব্যবস্থা হয়তো মুষ্টিমেয় লোককে বিলাসিতার সুযোগ দিয়াছে, কিন্তু এই বিলাস-ব্যয়কে করনীতি দ্বারা যথাসম্ভব সংকুচিত করিলেও আমাদের মূলধন সঞ্চয় আশানুরূপ হইবে না। কেন না, ভারতবর্ষের সমস্ত লোককে উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র মাত্র উৎপন্ন করিয়া দিতে হইলেও আমাদের অন্তত ৬০ কেটি টাকা মূলধন প্রয়োজন।

পূর্বে বলিয়াছি (পৃ পঞ্চাশ দ্রষ্টব্য), এই মূলধনের অভাবই হয়তো ভারতবর্ষের শিল্প-ব্যবসাকে বহুকাল ক্ষুদ্রাকৃতি করিয়া রাখিবে। যদি সামান্য মূলধনের সাহায্যে বিপুল জনসমষ্টির কর্মাভাব-পীড়া দূর করিতে হয়, তাহা হইলে বহু বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ আশানুরূপ করিতে হইলে এই ব্যবস্থাকে স্থায়ী ললিয়া মানিয়া লইলে চলিবে না। ভোগ্য সামগ্রী (ইহার মধ্যে দেশরক্ষা-উপকরণও অন্তর্ভুক্ত) উৎপাদনের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। সমস্ত রাষ্ট্র সমস্যা, সমাজসমস্যা ও নৈতিকসমস্যার অন্তরালে মানুষের ন্যূনতম জীবিকার দাবীটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, এ কথা অস্বীকার

করিয়া কোনো দীর্ঘমেয়াদী (long-term) সমাজ-পরিকল্পনা টিকিতে পারে না, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষ ন্যূনতম জীবিকার সংস্থান সহজে করিতে পারিবে না, ইহার আভাস এইমাত্র দেওয়া হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে বহির্জগতের নিকটে মূলধনের জন্য প্রার্থী হওয়া সংগত কি-না স্বতন্ত্র ভারতের রাষ্ট্রকে এই জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। ইহার মধ্যে বস্তুত দুইটি প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে। প্রথমত, মূলধন গ্রহণ করিবে কে? ব্যক্তিগত ঋণের ভিত্তিতে মূলধন সংগ্রহ করার চেয়ে রাষ্ট্রীয় ঋণের ব্যবস্থা করাই কি অধিকতর সংগত হইবে না?

দ্বিতীয়ত, মূলধন দান করিবে কে? বিশেষ একটি দেশের নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহ না করিয়া বিভিন্ন দেশের নিকট হইতে যৌথভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করাই কি অধিকতর সমীচীন নয়? একটি বিশেষ দেশের সহিত আমাদের আর্থিক ভাগ্যকে জড়িত না করিয়া সম্মিলিত যৌথ ঋণদান প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করাই কি অধিকতর নিরাপদ নয়?

ভারতবর্ষ আদৌ বহির্জগৎ হইতে মূলধন সংগ্রহ করিবে কি না, এবং করিলে কাহার নিকট হইতে, এবং কী প্রণালীতে, এই প্রাথমিক প্রশ্নগুলির সমাধানের উপর স্বতন্ত্র ভারতের অর্থ নৈতিক সংগঠন অনেকটা নির্ভর করিবে। ভারতবর্ষ যদি একান্তভাবে আভ্যন্তরীণ মূলধনের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে তাহার আর্থিক বিকাশ হইবে পরিমাণে সামান্য এবং তাহার গতিও হইবে অত্যন্ত শ্লথ; সেইজন্য বহির্জগতের সাহায্য গ্রহণকে বিশুদ্ধ অর্থ নৈতিক উপায় হিসাবে আমরা বিনাবাক্যে ত্যাগ করিতে পারি না। কিন্তু আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে বহির্জগতের রাজনৈতিক অবস্থা কী রূপ ধারণ করে, বাস্তবে ভারতবর্ষের সিদ্ধান্ত সেই অনুসারেই নির্ধারিত হইবে।

—১৩—

ভারতবর্ষের জনসাধারণের ন্যূনতম সমৃদ্ধি-বিধানকে আমরা সকল অর্থ নৈতিক সংগঠনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, কেন্দ্রীকরণ কিংবা বিকেন্দ্রীকরণ, যাহাই যে-মাত্রায় প্রয়োজন, তাহাকে সেই মাত্রায় স্বীকার করিয়া লইবার নির্দেশ দিয়্যছি। গান্ধীজি স্বতন্ত্র ভারতের যে-চিত্র কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে বিকেন্দ্রীকরণকেই উদ্দেশ্য বলিয়া ভুল করিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট ; কিন্তু যে-বিকেন্দ্রীকরণ মানুষকে ন্যূনতম সমৃদ্ধি এবং আত্মরক্ষার সামর্থ্য দিতে পারে না, তাহাকে উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে গেলে কতকগুলি জিনিষ পূর্বে স্বীকার করিয়া লওয়া প্রয়োজন। পৃথিবীর সকল মানুষ সর্বদা সামান্যতম ভোগ্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজন উপস্থিত হইলেও কেবলমাত্র দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবে, গান্ধী-কল্পনায় এই স্বীকৃতি অপরিহার্য। মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে এই বিপুল আস্থা পোষণ করা ইতিহাস-অভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এ কথাও পাঠকের স্মরণ থাকা উচিত যে, একবার এই কল্পনাকে স্বীকার করিয়া লইলে গান্ধীজির সিদ্ধান্তগুলিকে অ যৌ ক্তি ক (illogical) বলা চলে না।[৮৯]

বলা বাহুল্য, আমাদের কল্পনাও কতকগুলি স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত ; মানুষের সামাজিক আচরণ সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণাকে আমরা আর্থিক পরিকল্পনার ভিত্তি বলিয়া ধরিয়া নিতেছি। কিন্তু মানব-চরিত্র সম্বন্ধে গান্ধীজির ধারণার সহিত আমাদের ধারণার পার্থক্য অনেক। সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই লোভী ও অনুদার, হিংসক ও পরশ্রীকাতর। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রিক জীবনে সাধারণ মানুষও ক্রমশ ত্যাগ, সহযোগিতা, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সামাজিক গুণগুলি অর্জন করিতে শিখে, আমাদের কল্পনার জন্য এই স্বীকৃতিই যথেষ্ট। আমাদের এই ধারণাও হয়তো অতিরঞ্জিত ; হয়তো সাধারণ মানুষ ইহার চেয়েও

দুর্বলচরিত্র। সেক্ষেত্রে না টি কিতে পারে গণতন্ত্র, না হইতে পারে যুক্তিসিদ্ধ কোনো আর্থিক সংগঠন। সে ক্ষেত্রে চতুর ও শক্তিমান্ যাহারা, তাহাদের শোষণে সাধারণ মানুষ চিরদিন নিপীড়িত হইবে, দুর্বল প্রবলের দ্বারা বঞ্চিত হইবে, রাষ্ট্র হইবে শোষকশ্রেণীর যন্ত্রমাত্র। তথাপি, সাম্প্রতিক ইতিহাসে সাধারণ মানুষের সম্মান ও সুখ এমন মর্যাদা লাভ করিতেছে, গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তির প্রসার এত দ্রুত ঘটিতেছে যে, এতটা নিরাশ হইবার প্রয়োজন আমাদের নাই। আগামী কালের ভারতবর্ষ গণ-রাষ্ট্রে পরিণত হইবে এবং মানুষের সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিবে, ইহাই আমাদের কল্পনা।

গান্ধীজির মতে ছোটো ছোটো সমবায়ের ভিতর দিয়াই মানুষের স্বাধীন প্রকাশ হওয়া সম্ভব; আমরা ছোটো সমবায়গুলিকে লইয়া বৃহত্তর সমবায় গঠনের মধ্যে মানুষের স্বাধীন প্রকাশ ব্যাহত হইবার আশংকা দেখি না। তবে, সাধারণ মানুষ যাহাতে তাহার বুদ্ধি ও ইচ্ছার সহজ পরিচালনা করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বড়ো সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত ছোটো সমবায়গুলিকেও আমরা সমাজের প্রয়োজনীয় অংগ বলিয়া মনে করি। গান্ধীজির কল্পনায় স্বাবলম্বন এবং অহিংসাকে যত বড়ো করিয়া দেখা হইয়াছে, আমাদের কল্পনায় সমবায়মূলক আর্থিক জীবন এবং আত্মরক্ষা-ব্যবস্থাকে ঠিক তত বড়ো প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে সমাজ-জীবনের একটি মৌলিক প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিয়া গেল; কিন্তু এ প্রশ্নের মীমাংসা কি কোনো দিনই সম্ভব?[১০]

পরিপূর্ণ চিত্র হিসাবে গান্ধীজির কল্পনা মনোহর, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিকাশ সম্ভাবনার দিক হইতে ইহার দুর্বলতা সুস্পষ্ট। অবশ্য, আমরা রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে আর্থিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার যে কল্পনা করিয়াছি, দুর্বলতা তাহার মধ্যেও আছে। সাধারণ মানুষের ভাগ্য বহুল পরিমাণে তাহার নিজের উপর নির্ভর করে। সে যদি অজ্ঞ হয়, ব্যক্তিত্বের মোহ যদি তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহা হইলে রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং আর্থিক ব্যবস্থা দুই-ই বিকৃত হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা। অতএব, ব্যক্তিচরিত্রকে অস্বীকার করিবার আমাদের উপায় নাই।

কিন্তু সেই সংগে মানুষের অর্থ নৈতিক সংগঠনকে, ছোটো এবং সাধ্যমত বড়ো, উভয়প্রকার সমবায়ের উপর দাঁড় করাইতে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি নাই। মানুষের প্রকৃতি এবং ইতিহাস বাস্তবনিষ্ঠ অর্থনীতিবিদের উপর এইটুকু দাবি জানায়।

আধুনিক জগতের সবচেয়ে বড়ো সমবায় হিসাবেই রাষ্ট্রকে আমরা আর্থিক জীবনের নিয়ন্ত্রণভার তুলিয়া দিতে বাধ্য হই। কিন্তু সে ভার যাহাতে সে অবহেলা না করে, সে কর্তব্য পালনে যাহাতে তাহার ত্রুটি না ঘটে, অন্যান্য সমবায়ের প্রভাব দ্বারা যাহাতে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়, সে ব্যবস্থাও আমাদের কর্তব্য বলিয়া মনে করি। এই ভিত্তির উপর আমাদের পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত।

আবার, রাষ্ট্র যাহাতে মাত্র গতানুগতিক উপায়ে নিজের কর্তব্য পালন করে, সেই উদ্দেশ্যে নূতন উদ্ভাবন ও নূতন কল্পনাকে প্রেরণা দিবার ব্যবস্থা আর্থিক সংগঠনের অন্যতম প্রধান অংগ। ইহার জন্য প্রয়োজন, শিল্পব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের মূল শাসনতান্ত্রিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা। আমাদের পরিকল্পনায় এই দাবিও স্বীকৃত হইবে।

স্বতন্ত্র ভারতের অর্থ নৈতিক রূপটি কী হইবে, সে সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা এবার সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব।

—১৪—

ন্যূনতম আর্থিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করাকে যদি আমরা অর্থ নৈতিক সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে 'ন্যূনতম আর্থিক সমৃদ্ধির' একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। অধ্যক্ষ অগ্রবাল তাঁহার The Gandhian Plan নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিতেছেন—

"দৈহিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির ন্যূনতম মান বলিতে আমরা বুঝি, উপযুক্ত (balanced) খাদ্য, পর্যাপ্ত বস্ত্র, একশত বর্গফুট পরিমিত গৃহতল, অবৈতনিক ও

বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, সামাজিক সংযোগ ব্যবস্থা (public utilities) এবং আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা।"

কিন্তু ইহাকেই সম্পূর্ণাংগ মান বলিতে বাধা আছে। ইহার মধ্যে ইন্ধন (fuel), পানীয় জল, আলোক ও উত্তাপের ব্যবস্থা, প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর উল্লেখমাত্র নাই। দেশরক্ষার জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহাও যে ব্যক্তিগত আয় হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে, ইহাতে তাহার ইংগিতও দেখিতে পাই না। 'অবৈতনিক' শিক্ষা ব্যক্তির পক্ষে 'অবৈতনিক' হইলেও সমাজের পক্ষে তাহার জন্য ব্যয় করিতে হইবে, ইহা সুনিশ্চিত; কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশয়ের হিসাবের মধ্যে তাহার বিস্তারিত উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। রাষ্ট্রশাসনের ব্যয়ও যে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির জীবিকা-মানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়, অধ্যক্ষ মহাশয় তাহাও হিসাব করিতে ভুলিয়াছেন। অর্থাৎ, মোট জাতীয় আয় হইতে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাদ দিলে যাহা উদ্বৃত্ত হয়, তাহার দ্বারাই ব্যক্তির জীবিকা এবং রাষ্ট্রশাসন ও দেশরক্ষার ব্যবস্থার সংস্থান করিতে হইবে।

ব্যক্তির পক্ষে এই ন্যূনতম জীবিকার সংস্থান করিতে হইলে, অধ্যক্ষ অগ্রবালের হিসাব অনুযায়ী, তাহার বার্ষিক আয় হওয়া উচিত অন্তত ৭২৲ টাকা (প্রাক্-যুদ্ধকালীন দ্রব্যমূল্য-মান অনুসারে)। ইহার সহিত ইন্ধন প্রভৃতি অত্যাবশ্যক দ্রব্য যোগ করিলে এবং সামান্য উদ্বৃত্তের ব্যবস্থা করিতে হইলে ব্যক্তির ন্যূনতম বার্ষিক আয় আমরা ১০০৲ টাকা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ভারতবর্ষের মোট অধিবাসীর সংখ্যা যদি ৩৮ কোটি বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে ভারতবর্ষের বার্ষিক জাতীয় আয় হওয়া উচিত অন্তত ৩৮০০ কোটি টাকা। কেবল ব্রিটিশ ভারতের ২৭ কোটি অধিবাসীর কথাই যদি চিন্তা করি তাহা হইলেও জাতীয় আয় অন্ততঃ ২৭০০ কোটি টাকা পরিমাণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। বলা বাহুল্য, এই আয় সকল অধিবাসীর ভিতর সমভাবে বণ্টিত হইলে, তবেই ইহার দ্বারা ন্যূনতম সমৃদ্ধি-সাধন সম্ভব হইবে। প্রকৃতপক্ষে, সকল অধিবাসীর মধ্যে একান্ত নিপুণভাবে আর্থিক সাম্য রক্ষা করা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক আর্থিক ব্যবস্থার পক্ষে অসম্ভব।

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, ব্রিটিশ ভারতের মোট জাতীয় আয় মাত্র ১৬৯০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে একান্ত অপরিহার্য সঞ্চয়ের অংশ বাদ দিয়াই উপভোগ্য জাতীয় আয়ের হিসাব করা উচিত। উপরন্তু, এই আয় একান্ত অসমভাবে বন্টিত। যদি সমভাবেও বিভক্ত হইত, তবে এই আয় অনুযায়ী ব্রিটিশ ভারতের প্রতি অধিবাসীর গড়পড়তা বার্ষিক আয় হইত ৬২ টাকার মতো। অতএব, অসম বণ্টনের ফল সহজেই অনুমেয়। অধ্যাপক কুমারাপ্পা ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ফলে দেখিতে পাইয়াছেন যে মধ্যপ্রদেশের অনেক গ্রামে প্রতি ব্যক্তির বার্ষিক আয় গড়ে ১২৲ টাকার বেশি নয়।[৯১] এই আয়ের দ্বারা ইহারা কী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, এ প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগা স্বাভাবিক। যৌথ পরিবার প্রথা অনেক ক্ষেত্রে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করিতে সাহায্য করে; কিন্তু প্রশ্নটির প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে, ভারতের কোটি কোটি অধিবাসীর জীবনযাত্রা-মানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা একান্ত প্রয়োজন।

যেহেতু ইহাদের মধ্যে অনেকেরই বার্ষিক আয় গড়ে ১২৲ টাকার বেশি নয়, সেই হেতু ইহাদের ভাগ্যে অর্ধাশন ভিন্ন গতি নাই। অধ্যক্ষ অগ্রবাল দেখাইয়াছেন, পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থামাত্র করিতে হইলে প্রতি ব্যক্তির বার্ষিক আয় অন্তত ৬০৲ টাকা হওয়া প্রয়োজন। আচার্য এক্রয়েড্ (Aykroyd) তাঁহার গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, যদিও অন্তত ২৬০০ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা সুস্থ দেহ ধারণের পক্ষে অপরিহার্য, তথাপি উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও গ্রাম্য মজুর ২০০০ ক্যালরির বেশি খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। অতএব, অপুষ্ট দেহ লইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে গড়ে ২৩ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করাই সে বেশি বাঞ্ছনীয় মনে করে![৯২]

দেহ ধারণের পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য-সংগ্রহ করাই যাহার পক্ষে অসাধ্য, সে ব্যক্তি লজ্জা নিবারণ করিবে কিরূপে? গৃহনির্মাণ করিবার মতো সাধ্য তাহার কোথায়? বিশুদ্ধ পানীয় কিংবা স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা তাহার পক্ষে আকাশকুসুমের মতো।

অতএব, স্বতন্ত্র ভারতের প্রথম এবং মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে ব্যক্তির জীবিকা-সংস্থানের ব্যবস্থা উন্নত করা। আমরা দেখিয়াছি, যদি ভারতবর্ষের জাতীয় আয় সমভাবেও বন্টিত হইত, তথাপি তাহাতে প্রতি ব্যক্তির ন্যূনতম জীবিকা-সমৃদ্ধির বিধান করাও সম্ভব হইত না। পক্ষান্তরে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক আর্থিক ব্যবস্থায় এরূপ বাধ্যতামূলক সাম্য-প্রবর্তনের চেষ্টায় উৎপাদন-মাত্রা আরও ব্যাহত হইত। অতএব, বর্তমান অবস্থায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির দিকেই আমাদের প্রথম দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। কিন্তু সেই সঙ্গে বর্ধিত আয় যাহাতে বর্তমান ধন-বৈষম্যকে আরও বাড়াইয়া না দেয়, সে দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

এ কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বর্তমান ধনবৈষম্য কেবল যে মুষ্টিমেয় শিল্পপতির সমৃদ্ধিলিপ্সার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা নয়; রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা ও দেশরক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান প্রণালী এই ধনবৈষম্যকে গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে। ভারতবর্ষের জাতীয় আয়ের তুলনায় শাসনব্যয় এবং দেশরক্ষাব্যয় এত বেশি যে ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কে এস শেলভংকর তাঁহার The Problem of India গ্রন্থে দেখাইয়াছেন,

ভারতবর্ষে সাধারণ নাগরিক মজুরের আয় অপেক্ষা
সাধারণ কেরানির আয় ২০০ শত গুণ বেশি ;

অথচ

ইংলণ্ডে সাধারণ নাগরিক মজুরের আয় অপেক্ষা
সাধারণ কেরানির আয় মাত্র ৩০ গুণ বেশি।

কেবল তাহাই নয়। শাসনযন্ত্রের ধাপগুলি এমন ভাবে সাজানো, যাহাতে প্রতি পদক্ষেপে আয়বৈষম্য গুরুতর আকার ধারণ করিতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,

সাধারণ কেরানির আয় যদি হয় ১ ;
উর্দ্ধতম কর্মচারীর আয় ১৩৩

অথচ, ইংলণ্ডে সাধারণ কেরানির আয় : উর্দ্ধতম কর্মচারীর আয় : : ১ : ৩২।

পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এমন গুরুতর আয়-

বৈষম্য নাই। ইউনাইটেড স্টেট্‌সে (U. S. A.) সাধারণ কেরানির চেয়ে উচ্চতম কর্মচারীর আয় মাত্র ৯ গুণ বেশি। অতএব, ভারতের জাতীয় আয়ের ২৭ ভাগের ১ ভাগ যদি কেবল শাসনযন্ত্রটিকে বহাল রাখিবার জন্যই ব্যয় হয় এবং তাহার ফলে ভারতের কোটি কোটি অধিবাসীর আর্থিক সমৃদ্ধি যদি একটুও না বাড়ে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

দেশরক্ষা বাবতে ১৯৩৮—৩৯ সালে (অর্থাৎ, তথাকথিত 'শান্তি'র সময়ে) ব্যয় হইয়াছিল ৪৭ কোটি টাকা। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিলে, পরিমাণগত হিসাব মতো (absolutely) ইহার চেয়ে কম খরচে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার সুব্যবস্থা করা হয়তো অসম্ভব। কিন্তু জাতীয় আয়ের অনুপাতে এ ব্যয়ও আমাদের পক্ষে বহন করা দুরূহ।

শাসনব্যবস্থা ও দেশরক্ষাব্যবস্থার জন্য আমাদের ব্যয় এত অধিক যে, সাধারণ মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য জাতীয় আয়ের সামান্য অংশই অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু বিপত্তির কথা এই যে, স্বতন্ত্র ভারতের পক্ষেও এই ব্যবস্থাকে বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ না করিয়া ব্যয় হ্রাসের চেষ্টা করা অসম্ভব। অবশ্য, শাসনযন্ত্রের উপরের স্তরে বৃত্তির পরিমাণ হ্রাস করা স্বতন্ত্র ভারতের পক্ষে একান্ত বাঞ্ছনীয়—শাসনব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া সে ব্যবস্থা করিতে হইলে কেবলমাত্র ধীরগতিতেই তাহা করা সম্ভব। পরন্তু, দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক রীতিসম্মত করিতে হইলে ব্যয়ের পরিমাণ বর্তমান অপেক্ষা বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। এই সকল কারণে, কেবল মাত্র শিল্পপতিদের (industrialists) লাভপিপাসাকে সংযত করিলেই জাতীয় আয় বস্তুত সম-ভাগে বন্টিত হইবে, এরূপ মনে করিবার কোনো সংগত কারণ নাই।

এবং সেইজন্যই জাতীয় আয়ের পরিমাণগত বৃদ্ধি ব্যতীত আধুনিক শাসন ও দেশরক্ষাব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার অন্য কোনো উপায় আমরা দেখিতে পাই না।

বিকেন্দ্রীকৃত আর্থিক ব্যবস্থা যদি এই ন্যূনতম আর্থিক দাবী পূরণ করিতে পারে, তবে বিকেন্দ্রীকরণে আমাদের বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই, এ কথা পূর্বে

বহুবার বলা হইয়াছে। কিন্তু যদি বলা হয় যে, আর্থিক সমৃদ্ধিকে ত্যাগ করিয়াও বিকেন্দ্রীকৃত আর্থিক ব্যবস্থাকে আমরা রক্ষা করিব, তাহা হইলে আর্থিক সমৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমার নীচে চলিয়া যাওয়া মাত্র আমরা আপত্তি করিব। কিংবা যদি বলা হয় যে, দেশরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন কেবল সমৃদ্ধিশালী দেশের জন্য, দরিদ্র দেশের জন্য নয়, তাহা হইলে সমৃদ্ধিশালী দেশগুলির বিস্তার-লিপ্সাকে সংযত রাখিবার কোনো উত্তম উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে [৯৩]। বলা বাহুল্য, এরূপ কোনো উপায়, কি ব্যক্তিসমাজে, কি রাষ্ট্রসমাজে আজও স্বীকৃত হয় নাই।

অতএব, জাতীয় আয়ের পরিমাণগত-বৃদ্ধি আমাদের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষেই অপরিহার্য। সেই সংগে ব্যক্তির জীবিকা-মানকে সভ্যসমাজের উপযুক্ত করিয়া তোলার আবশ্যকতাও অস্বীকার করা চলে না।

অবশ্য, গোটা দেশের সমৃদ্ধি কিংবা রক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে না ভাবিয়া, ছোটো পল্লীসমাজকে আমাদের সমৃদ্ধি ও আত্মরক্ষার কেন্দ্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে। পূর্বে আমরা ভারতবর্ষের আর্থিক পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার মধ্যে এই কথাটাই প্রধান। কিন্তু গ্রামসমাজের পক্ষে এরূপ পরিকল্পনা করার পক্ষে কয়েকটি বাধা আছে। প্রথমত, গ্রামসমাজ যাহা উৎপাদন করিবে, তাহার পরিমাণ বিনিময়ের সাহায্যে (through exehange) কতটা বাড়ানো সম্ভব, সে-কথা তাহার পক্ষে জানা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, মাথা পিছু উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস না করিয়া গ্রামের সমস্ত সমর্থ ব্যক্তিকে গ্রামে কাজ দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই আমরা মনে করি। তৃতীয়ত, যদি গ্রামসমাজের উৎপাদন দ্বারা গ্রামকে স্বাবলম্বী করা সম্ভবও হয়, তথাপি গ্রামের শাসন-ব্যবস্থা এবং দেশরক্ষা-ব্যবস্থার জন্য তাহার করের (tax) পরিমাণ, ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য বাহিরের মুখাপেক্ষী তাহাকে হইতেই হইবে। সেইজন্য যদিও গ্রামসমাজের আর্থিক জীবন সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পরিকল্পনা—অর্থাৎ, গ্রামের যৌথ আয় ও যৌথ ব্যয়ের হিসাব—সংকলন করা বাঞ্ছনীয়, তথাপি এই পরিকল্পনাগুলির সংশোধন ও

সামঞ্জস্যবিধানের ভার রাষ্ট্রের হাতে রাখা অত্যাবশ্যক। বস্তুত, রাষ্ট্রিক ঐক্য (political unity) যদি আমরা রক্ষা করিতে পারি এবং যদি যুক্তির উপর তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তবে আর্থিক ঐক্যকে ত্যাগ করিবার কোনো সংগত কারণ নাই; বরং আর্থিক ঐক্যবন্ধন যাহাতে রাষ্ট্রিক ঐক্যকে সুদৃঢ়তর করে, ইহাই হইবে আমাদের লক্ষ্য। সারা প্রবন্ধে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এই কথাটাই বলিতে চাহিয়াছি।

অতএব, গ্রাম-সমাজের আর্থিক জীবনকে পীড়িত না করিয়া বরং গ্রাম-সমাজের আর্থিক উন্নতির জন্যই, রাষ্ট্র যাহাতে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ও সমবণ্টনের ব্যবস্থা করিতে পারে, ইহাই হইবে স্বতন্ত্র ভারতের আর্থিক সংগঠনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করা সংগত, এবার তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে।

—১৫—

আমরা দেখাইয়াছি যে ভারতবর্ষের সমস্ত অধিবাসীর জন্য ন্যূনতম জীবিকার মান সংগ্রহ করিতে হইলে ভারতবর্ষের জাতীয় আয়কে বর্তমান পরিমাণ হইতে বহুগুণে বাড়াইতে হইবে। প্রাক্-যুদ্ধকালীন দ্রব্য মূল্য-মান অনুসারে ভারতবর্ষের জাতীয় আয় অন্তত ৩৮০০ কোটি টাকা না হইলে তাহার সমস্ত লোকের পক্ষে ন্যূনতম জীবিকার দাবি মেটানো অসম্ভব। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই আয় একান্ত সমভাবে বণ্টিত হইলেই মাত্র আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, দেশরক্ষা ও শাসন ব্যবস্থার জন্য আয়ের যে অংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য, এই হিসাবের ব্যবস্থার মধ্যে তাহার উল্লেখ নাই। তৃতীয়ত, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যে হারে বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে জাতীয় আয় (এবং মাথাপিছু আয়) যাহাতে তাহার সহিত তাল রাখিয়া বাড়িতে পারে, ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক সংগঠনে ইহার ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। অবশ্য, জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টাও

বাঞ্ছনীয়; কিন্তু আর্থিক সংগতির সীমা অতিক্রম করিয়া না যাওয়া পর্যন্ত এরূপ চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা নাই।

এই সমস্ত বিবেচনা করিলে বোম্বাই-পরিকল্পনার রচয়িতৃবৃন্দ যে জাতীয় আয়ের ন্যূনতম পরিমাণ ৬৬০০ কোটি টাকা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তাহাকে অতিরঞ্জিত কিংবা অযথা বাহুল্যের বিধান বলিবার সংগত কোনো কারণ নাই। বস্তুত, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি কী পরিমাণ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও আয়ের পরিমাণ যে আরও বহুগুণ বাড়ানো একান্ত আবশ্যক, সে সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নাই।

জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিই একমাত্র পথ, কিন্তু সেই উৎপাদন-পরিমাণকে উপযুক্ত বিনিময়-ব্যবস্থা দ্বারা প্রসারিত করা চলে। উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য একদিকে যেমন কর্মাভাব-পীড়িত শ্রমিক, অনাবাদি জমি এবং অযথা সঞ্চয়কে (hoards) উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত করা আবশ্যক, অন্যদিকে তেমনি মুলধন সঞ্চয় এবং উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য মূলধন নিয়োগও আর্থিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অংগ; বস্তুত অযথা সঞ্চয়কে মূলধনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইলে, একমাত্র মুলধন সংগ্রহ এবং তাহার উপযুক্ত নিয়োগকেই আমাদের সকল ভবিষ্যৎ সমস্যার মুলবিন্দু বলা যাইতে পারে।

পুর্বে এই মুলধন সংগ্রহের সমস্যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল [৯৪]। আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতবর্ষের পক্ষে নিজস্ব তহবিল হইতে মূলধন নিয়োগ করিয়া দ্রুত আর্থিক অগ্রগতির কল্পনা করা অনেকাংশে অযৌক্তিক। এ সম্বন্ধে সুবিখ্যাত বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা যেরূপ আশাবাদী[৯৫], আমাদের পক্ষে মুলধন সংগ্রহের সম্ভাবনা সম্পর্কে সেরূপ উচ্চ আশা পোষণ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য, যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ভারতকে আর্থিক সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে তাহার বিকাশের পথ দীর্ঘতর হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু লক্ষ্য স্থির থাকিলে এবং পরিকল্পনায় মারাত্মক ক্রুটি না ঘটিলে এই উপায়েই দৃঢ়মুল আর্থিক সংস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব। বস্তুত ভারতবর্ষের

ভবিষ্যৎ আর্থিক সংস্থাকে আমরা দু ই টি সময়-বিভাগে (time-periods) ভাগ করা সংগত মনে করি। প্রথম যুগ —স্বল্প মূলধন-বিনিয়োগ এবং মূলধন সঞ্চয় গড়িয়া তোলার যুগ; দ্বিতীয় যুগ—বিপুল মূলধন-বিনিয়োগ এবং বৃহৎ শিল্প গড়িয়া তোলার যুগ। এই যুগবিভাগকে স্বীকার করিয়া লইলে আমাদের পরবর্তী বক্তব্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

প্রথম যুগে আমাদের পক্ষে বৃহদাকার শিল্প গড়িয়া তোলা কিংবা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বিশেষ ভাবে উন্নত করিবার চেষ্টা সাময়িক ভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। এই যুগে আমাদের উদ্দেশ্য হইবে, জনসাধারণের বর্তমান (existing) জীবিকামানকে আর ক্ষুণ্ণ না করিয়া বর্তমান মূলধন-সম্পদ্ যথাযথভাবে নিয়োগ, এবং ইহারই মধ্য হইতে নূতন মূলধনের সম্ভাবনা গড়িয়া তোলা। অর্থাৎ বর্তমান মূলধন-সম্পদ্ কী ভাবে, কোন্ পথে নিয়োজিত হইলে তাহার দ্বারা ভ বি ষ্য ৎ মূলধন-বৃদ্ধির সহায়তা ঘটিবে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের প্রথম যুগের পরিকল্পনা নির্ণীত হওয়া উচিত। জাতির সামান্য মূলধন-সম্পদ্ যাহাতে বিলাস দ্রব্যের উৎপাদনে কিংবা অনাবশ্যক আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত না হয়, কিংবা একেবারেই অযথা-সঞ্চয়ে (hoards) পর্যবসিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে মূলধন-বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করা হইবে স্বতন্ত্র ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য। অতএব, যে মূলধন বিনিয়োগ প্রণালী দ্বারা আভ্যন্তরীণ জীবিকামানের উন্নতি হয়, অথচ মূলধন সঞ্চয়ের সহায়তা না ঘটে, তাহা সাময়িকভাবে পরিহার করাই হইবে আমাদের কর্তব্য। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, পর্যাপ্ত মূলধন-বিনিয়োগ দ্বারা হয়তো কৃষকের আয়-বৃদ্ধি ঘটানো অসম্ভব নয়, কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে, এই আয় হইতে সঞ্চয়-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে জীবিকা সমৃদ্ধিকে সাময়িকভাবে বর্তমান অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াও, সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। পক্ষান্তরে, যেভাবে মূলধন বিনিয়োগ করিলে আমাদের রপ্তানি-বাণিজ্য (exports) বাড়িতে পারে[৯৬], তাহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া একান্ত অপরিহার্য।

অর্থাৎ, প্রথম যুগে মূলধন বিনিয়োগের প্রাথমিক উদ্দেশ্য উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ের সৃষ্টি করা মাত্র, জীবিকা সমৃদ্ধির বিধান নয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারতীয় রপ্তানি-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন, বিলাসদ্রব্যের আমদানি নিরন্দণ, ব্যক্তিগত মূলধন-বিনিয়োগের নিয়ন্ত্রণ এবং নাতি-উগ্র করনীতি একান্ত আবশ্যক। এ যুগে সঞ্চয়-সৃষ্টির জন্যই ধনিকের সহিত একটা আপোষ-মীমাংসা করিয়া চলিতে হইবে—উগ্র করনীতির দ্বারা পীড়িত হইয়া যাহাতে সে সঞ্চয়-বিমুখ না হইয়া পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অতএব, বিক্রয়-কর (Sales Tax) এবং আয়-করের সংশোধন (adjusted income tax) দ্বারা ধনিকের ব্যয়-পরিধিকে সংকুচিত করিয়া তাহার সঞ্চয়ের পরিধিকে বাড়াইবার ব্যবস্থা করা হইবে এ যুগের কর-নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সঞ্চয়েয় ভিত্তির উপরই স্বতন্ত্র ভারতের অর্থ নৈতিক সংগঠনকে দাঁড় করাইতে হইবে।

বলা বাহুল্য, এ যুগে অধিকতর উগ্র উপায় অবলম্বন করিয়া সাম্যসংস্থাপন কিংবা সঞ্চয় সংগঠনের নির্দেশ দিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম; কিন্তু যেহেতু ভারতীয় শিল্প ধনতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার সংগঠন অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি, সেই হেতু রাষ্ট্রের পক্ষে উৎপাদন-মাত্রাকে ব্যাহত না করিয়া উগ্রতর নীতি অবলম্বন করা সম্ভব হইবে বলিয়া আমাদের মনে না। বস্তুত, আমাদের কল্পনায় বর্তমান আয়মাত্রার মধ্যে থাকিয়া সাম্য সংস্থাপনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র; কেবল জাতীয় আয় বৃদ্ধির সংগে সংগে এবং বর্ধিত আয়কে রাষ্ট্রের নির্দেশ মতো নিযুক্ত করিয়াই প্রকৃত সাম্য সংস্থাপন করা সম্ভব।

আমাদের প্রথম যুগের পরিকল্পনার পক্ষে জাতীয় আয়, জাতীয় সঞ্চয়, আমদানি-রপ্তানির হিসাব এবং জাতীয় সঞ্চয়ের উপর করনীতির প্রভাব, ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক তথ্য নির্ধারণ একান্ত আবশ্যক।[৯৭] এ যুগের পরিকল্পনাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য উপযুক্ত সরকারী ঋণ-নীতি এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে জাতীয় মূলধন-বিনিয়োগ-নীতি গ্রহণ একেবারেই অপরিহার্য। রাষ্ট্রের হাতে মূলধনের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঞ্চয়কে বাধ্যতামূলক

ভাবে রাষ্ট্রীয় ঋণে পরিণত করিবার ক্ষমতাও স্বতন্ত্র ভারতীয় রাষ্ট্রের থাকা উচিত। এই প্রবন্ধে সঞ্চয়-বৃদ্ধির সমস্ত পথ নির্দেশ করিয়া দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নয়—কিংবা, সে সাধ্যও আমাদের নাই। কিন্তু প্রথম যুগে উপযুক্ত পরিমাণ সঞ্চয়ের সৃষ্টিই যে ভারতীয় আর্থিক সংগঠনের মৌলিক উদ্দেশ্য হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

দ্বিতীয় যুগে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করিবার জন্য শিল্প-সংগঠন করাই হইবে পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইবার সংগে সংগেই যে প্রথম যুগ শেষ হইয়া যাইবে, এমন নয়। শিল্প-বিকাশের ধারার মধ্যে প্রথম যুগে সঞ্চয়ের প্রাধান্য এবং দ্বিতীয় যুগে, ভোগের প্রাধান্য দিতে হইবে—ইহাই ছিল আমাদের যুগ-বিভাগ কল্পনার যুক্তিভিত্তি। কিন্তু ইহাকে একেবারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুইটি কালানুক্রম মনে করা অনুচিত হইবে। প্রথম যুগে, সঞ্চয়কে প্রাধান্য দিলেও ভোগমাত্রাকে অতিরিক্ত ক্ষুণ্ণ করা (বিশেষত, দরিদ্রের পক্ষে) যেমন আমরা সংগত মনে করি নাই, দ্বিতীয় যুগে ভোগমাত্রাকে প্রাধান্য দিলেও সঞ্চয়কে একেবারে অবহেলা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যদিও, প্রথম যুগের পরিকল্পনা কিছুদূর অগ্রসর হইলেই কেবল দ্বিতীয় যুগের পরিকল্পনা সুরু হইতে পারে, তবু, দ্বিতীয় যুগ সুরু হইবা মাত্র প্রথম যুগের অবসান ঘটিবে, এরূপ ধারণা অসংগত। কেবলমাত্র পরিপূর্ণ সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়াই দ্বিতীয় যুগের শিল্প-সংগঠনের কাজে হাত দেওয়া যাইবে, এরূপ ভ্রান্ত ধারণার যাহাতে সৃষ্টি না হয়, সেইজন্য এ কথা আমাদের স্পষ্ট করিয়া বোঝা উচিত যে, শিল্প সর্বদাই তাহার বৃদ্ধির উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ করিয়াই চলিতে থাকিবে। প্রথম যুগে এবং দ্বিতীয় যুগে, সেইজন্য, কেবল মূলধন-বিনিয়োগ-নীতির তারতম্য ঘটিবে মাত্র।

প্রথম যুগে, মূলধন-বিনিয়োগ-নীতির লক্ষ্য ছিল, যাহাতে এমন সব শিল্পে মূলধন নিয়োজিত হয়, যাহার ফলে জাতীয় সঞ্চয়ের দ্রুততম বৃদ্ধি ঘটে ; দ্বিতীয় যুগে মূলধন-বিনিয়োগ-নীতির উদ্দেশ্য অন্যরূপ। এ যুগে তাহার উদ্দেশ্য, যাহাতে

ন্যূনতম সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া, ভোগমাত্রাকে যথাসম্ভব দ্রুত উন্নত করা যায়। অর্থাৎ, এমন ধরণের শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, প্রভৃতি স্বল্প-সঞ্চয়ী শ্রেণীর আয়-বৃদ্ধি ঘটে। এ যুগে কর-নীতির উদ্দেশ্যও পরিবর্তিত হইবে। পূর্বে যেখানে সঞ্চয় সংগঠনই ছিল করনীতির লক্ষ্য, এখন সেখানে ভোগ্য-বঞ্চিত শ্রেণীর জন্য ভোগ্যের সংস্থান করাই হইবে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। বস্তুত, এ যুগে সরকারী আয় কিংবা ঋণ অপেক্ষা সরকারী ব্যয়-নীতিই হইবে অধিকতর প্রয়োজনীয়। এ যুগের প্রথম পাদে নিয়ন্ত্রণ-নীতি বহাল থাকিলেও, ক্রমে মূলধন-বিনিয়োগকে জনসাধারণের স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। অবশ্য, আর্থিক জীবনের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতেই থাকিবে, কিংবা আর্থিক জীবনের কোনো কোনো অংশে রাষ্ট্রের পরিচালনা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইবে—এ বিষয়ে পরে আমরা আলোচনা করিব। কিন্তু মূলধন-বিনিয়োগের উপরে খর দৃষ্টি রাখা এ অবস্থায় আর প্রয়োজন হইবে না।

দ্বিতীয় যুগের শিল্প-সংগঠনে মৌলিক শিল্প এবং ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের মধ্যে কী ধরণের সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে, অর্থনীতিশাস্ত্রের ভিত্তিতে ইহা খুব গুরুতর প্রশ্ন নয়। কেন না, বিশুদ্ধ অর্থনীতি শিল্প সমূহের মধ্যে গুণগত প্রভেদ দেখিতে অভ্যস্ত নয়; মূল্যের তারতম্য অনুসারেই দেশের শিল্প সংগঠন নির্ধারিত হয়, ইহাই তাহার সিদ্ধান্ত। কিন্তু জনকল্যাণের দিক দিয়া এ প্রশ্নের গুরুত্ব সামান্য নয়। স্বতন্ত্র ভারত অবশ্য লঘু মূল্যে ভোগ্য বস্তু সংগ্রহের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, কিন্তু দেশরক্ষা এবং অন্যান্য সমাজস্বার্থের খাতিরে, এ চেষ্টাকে সম্পূর্ণ ফলবতী করিয়া তোলা, যেমন অন্য দেশের পক্ষে, তেমন তাহার পক্ষেও, অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। সেইজন্য, যাহাতে মৌলিক শিল্প এবং ভোগ্য-বস্তু উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের ভার কেবলমাত্র ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর না করে, এবং প্রথম হইতেই যাহাতে একটি যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তির উপর এই উভয় প্রকার শিল্প সংগঠিত করা সম্ভব হয়, সেই উদ্দেশ্যে উৎপাদন-

ব্যবস্থাকে একটি পূর্ব-কল্পিত পরিকল্পনার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। বলা বাহুল্য, প্রথম যুগের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ শিল্প সংগঠনের কাজে হাত দিবার মতো উপযুক্ত মূলধন-সম্পদ্ যতদিন না গড়িয়া উঠে ততদিন, এই দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিবার চেষ্টা করা উচিত হইবে না। কিন্তু প্রথম হইতেই গন্তব্য পথের চিত্র আঁকিয়া না লইলে প্রথম যুগ হইতে দ্বিতীয় যুগে পৌছিতে অযথা বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা।

এই দিক দিয়া বোম্বাই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অধিকতর সার্থক বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক আর্থিক ব্যবস্থা রক্ষা করিয়া মৌলিক শিল্প ও ভোগ্যবস্তু-উৎপাদনের মধ্যে সুষ্ঠু সামঞ্জস্য রক্ষা করা একপ্রকার অসম্ভব। সেইজন্য, মৌলিক শিল্পের উৎপাদন-মাত্রা ও উৎপাদন-বিধির উপর রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক জীবনের এই অংশটি (sector) যাহাতে নিছক ব্যক্তিগত লাভালাভের বিষয়বস্তু না হইয়া উঠে, রাষ্ট্রিক জীবনের পক্ষে তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক।

মৌলিক শিল্প বলিতে বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা যাহা বুঝেন, তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে একমত হওয়া সকলের পক্ষে অসম্ভব। রাষ্ট্র সকল অবস্থায়ই এই সকল শিল্পকে যে কোনো মূল্যে সংগঠিত করিতে চেষ্টা করিবে, এরূপ ধারণা পোষণ করা ঠিক হইবে না। এমন কি, দেশরক্ষার জন্যও যে সকল শিল্প একান্ত প্রয়োজন, তাহাকেও ঊর্ধ্বতম-পরিমাণ উৎপাদনের অবস্থায় সর্বদা রক্ষা করা গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের পক্ষে অকর্তব্য। বস্তুত, রাষ্ট্রের কর্তব্য কেবল এই সকল শিল্প-সংগঠনকে টিকিয়া থাকিবার মতো অবস্থা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া, এবং প্রয়োজন হইলে, যাহাতে এই সকল সংগঠন দ্রুত প্রসার লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। সেইজন্য, বোম্বাই পরিকল্পনার প্রণয়নকারী শিল্পপতিগণ যখন সিমেণ্ট (cement) শিল্পকেও মৌলিক শিল্প বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তাহার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হইতে বলেন, তখন তাঁহাদের শ্রেণী-স্বার্থ (vested interest) নিতান্তই প্রকট হইয়া পড়ে। বস্তুত, আমাদের গৃহ-

নির্মাণ কার্যের জন্য আমরা সিমেণ্ট (cement) ব্যবহার করিব কি করিব না, এবং করিলে, তাহার সমস্তটাই দেশে উৎপাদন করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে সংগত হইবে কিনা, তাহা প্রধানত মূল্য-তুলনার (relative prices) উপর নির্ভর করিবে—ইহাই সংগত।

এই কারণেই রাষ্ট্র অর্থ নৈতিক সূত্র অবলম্বন করিয়া মৌলিক শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করুক, স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে ইহাই আমাদের কাম্য; এবং রাষ্ট্র যাহাতে অনুচিত মূল্য দিয়া এই সকল শিল্পের প্রসার সাধনে ব্রতী না হয়, সেই জন্য এই সকল শিল্পের নিয়ন্ত্রণভার যন্ত্রবিদ্, শ্রমিক এবং ক্রেতাদের দ্বারা সংগঠিত যৌথ প্রতিষ্ঠানের (boards) উপর ন্যস্ত করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু জরুরী অবস্থায়, অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাহায্যে এই সকল শিল্পকে দ্রুত প্রসারিত করিবার দায়িত্বও রাষ্ট্রকেই নিতে হইবে।[৯৮]

বলা বাহুল্য, মৌলিক শিল্পগুলিকে স্বল্পতম ব্যয়ে উৎপাদনের সুযোগ দিতে হইলে, তাহাদের কেন্দ্রীকরণ একান্ত আবশ্যক। বিদ্যুৎ উৎপাদন, খনিশিল্প, কিংবা যন্ত্রশিল্প, স্বভাবতই স্ব স্ব প্রদেশে অধিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু স্বল্পতম ব্যয় বলিতে আমরা যাহাতে কেবল কারখানা পরিচালনার ব্যয় না বুঝি, কেন্দ্রীভূত শিল্পব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ব্যয়, যেমন, নগর পত্তন, গৃহনির্মাণ এবং জনস্বাস্থ্যবিধানের ব্যয়ও যাহাতে ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। মৌলিক শিল্পের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কিংবা 'মালিকানা' (ownership) প্রতিষ্ঠিত হইলে, এরূপ ব্যয়নির্ধারণ-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হওয়া স্বাভাবিক। সম্ভব হইলে, শিল্প-নগরীগুলিকে তাহাদের সর্বাঙ্গীণ আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিতে উৎসাহ দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে। ইহাও এক ধরণের বিকেন্দ্রীকরণ।

মৌলিক শিল্পগুলির উপর রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা, ইহাদের উৎপাদন-পরিমাণ ও নীতি-নির্ধারণের জন্য যৌথ নিয়ন্ত্রণের প্রতিষ্ঠা, এবং এই যৌথ নিয়ন্ত্রণে ক্রেতার (consumer) স্বার্থ রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে ভোগ্য বস্তু উৎপাদনে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে

আমাদের মতামত অনুমান করা যাইবে। ভোগ্য বস্তু উৎপাদনের সমস্ত অংশের উপরই রাষ্ট্রের একান্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক, কিংবা সমস্ত ভোগ্য বস্তু রাষ্ট্রের পরিচালনায় উৎপাদিত হোক—আমাদের বিবেচনায় ইহা অনাবশ্যক এবং অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু যেখানেই ব্যক্তিগত পরিচালনার ফলে উৎপাদন-মাত্রা হ্রাস পাইবে এবং উৎপাদন ব্যয় অনাবশ্যক রূপে বৃদ্ধি পাইবে, সেইখানেই হস্তক্ষেপ করা রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইবে। এই হস্তক্ষেপ কোন ক্ষেত্রে কী আকার ধারণ করিবে, তাহা প্রথম হইতেই বলা অসম্ভব। কিন্তু যে সকল শিল্প স্বভাবতই বৃহৎ আকার ধারণ করিবে, তাহাদের পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য প্রকাশ্য হিসাব দাখিলের আবশ্যকতা এবং রাষ্ট্রের তরফ হইতে পরিচালনার অংশভাগী হইবার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। উপরন্তু, এই সকল শিল্পের মধ্যে কোনো কোনো শিল্পকে বিকেন্দ্রীভূত, কিংবা সমবায়-উৎপাদনের উপর প্রতিষ্ঠিত করা চলে না, এমন নয়। কিন্তু ব্যয় ও মূল্য সম্পর্কিত তুলনার দ্বারাই এই পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া লওয়া সম্ভব হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, শিল্প সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে উপযুক্ত ব্যয়নির্ধারণ-পদ্ধতির ব্যবহারই হইবে ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক জীবনের প্রথম কথা। ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে, তাহার সামান্য মূলধন সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে হইলে, যাহাতে অধিক মূল্য দিয়া উৎপাদন-পদ্ধতি-বিশেষকে রক্ষা না করিতে হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা নিতান্ত আবশ্যক।[৯৯]

ঠিক একই কারণে একান্ত-স্বাবলম্বী ভোগ্য-সংগ্রহের নীতিও (autarky) ভারতবর্ষের পক্ষে পরিবর্জনীয়। গোঁড়া স্বদেশি-বাদী যাঁহারা, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে স্বদেশের বৃহত্তর কল্যাণই অনেক সময়ে বিনিময়-নীতির সমর্থন করে। এ বিষয়ে গান্ধীজির মতামত একান্ত উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা মনে করেন যে, গান্ধীজি সমস্ত আবশ্যক দ্রব্য স্বদেশে উৎপাদন করিয়া লইবার পরামর্শ দিয়া থাকেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, গান্ধীজি এক সময়ে ঠিক বিপরীত উপদেশই আমাদের দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,

'প্রধানত বিদেশী বলিয়াই বিদেশী জিনিষকে ত্যাগ করা এবং যে-জিনিষ প্রস্তুত করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই, তাহা তৈরি করিবার জন্য সময় এবং অর্থের অপব্যবহার করা, নিদারুণ মূর্খের কাজ। ইহাতে স্বদেশীর সার সত্যকে অস্বীকার করা হয়।" ১০০

যাঁহারা অর্থনীতিশাস্ত্রের Law of comparative advantage-এর সহিত পরিচিত তাঁহারা বুঝিবেন, ইহার চেয়ে ভালো করিয়া এই law-এর ব্যাখ্যা করা স্বয়ং রিকার্ডোর (Ricardo) পক্ষেও সম্ভব হইত না। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-মূলক আর্থিক ব্যবস্থায় সকল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিনিময় এই নীতি মানিয়া চলে কিনা, তাহাতে সন্দেহ করিবার বহু কারণ রহিয়াছে।

সেইজন্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিময়কে যুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনেক সময়ে আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, রাষ্ট্র যদি দেশের অভ্যন্তরে যথাসম্ভব আর্থিক সাম্য স্থাপন করিতে পারে, আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থাকে যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণ করে, এবং বিদেশে বাণিজ্যদূত (consuls) নিয়োগ করিয়া লাভজনক বিনিময়ের দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া দেয়, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে ব্যক্তিপ্রধান ব্যবস্থার উপর ছাড়িয়া দিতে কাহারও আপত্তি হইবার কথা নয়। অবশ্য, যতদিন আভ্যন্তরীণ শিল্পকে সামাজিক ব্যয়ের (social cost) ভিত্তিতে সংগঠিত না করা হয়, ততদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা অসম্ভব; এবং যেহেতু শিল্প ব্যবস্থা নিয়ত পরিবর্তনশীল, সেই হেতু রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা যে একেবারেই কোনোদিন ঘুচিয়া যাইবে, তাহাও নয়। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ (control) এবং পরিচালনার (management) মধ্যে যে পার্থক্যটুকু আছে, তাহার সম্মান রক্ষা করিয়া চলা রাষ্ট্রের পক্ষে সেই সময়েই শুধু সম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

উপরের আলোচনা হইতে এ কথা নিশ্চয়ই পাঠকের নিকটে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, মৌলিক শিল্প কিংবা ভোগ্য-দ্রব্য-শিল্প (consumer goods

industries), কাহার উৎপাদনমাত্রা কত হইবে এবং কোন্ কোন্ ভোগ্যবস্তু আমাদের দেশে উৎপন্ন হইবে, সে সম্বন্ধে লক্ষ্য (target) এবং গতিবেগ (tempo) স্থির করিয়া দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। সকল প্রকার শিল্পের আপেক্ষিক সম্ভাবনা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য এরূপ পূর্ব-পরিকল্পনা নিরর্থক। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পরিবর্তনের সংগে সংগে, অধিকতর সাম্য সংস্থাপনের ফলে এবং উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তন হেতু, বিভিন্ন শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ত পরিবর্তিত হইতে থাকিবে; আজ যাহাকে আমরা বড়ো শিল্প বলিয়া মনে করিতেছি, কাল তাহাই হয়তো বিনা ক্ষতিতে রক্ষা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু কতকগুলি শিল্পকে অন্তত অংকুর অবস্থায় রক্ষা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য, এবং আবশ্যক হইলেই, যাহাতে ইহাদের উৎপাদন বর্ধিত করা যায়, শিল্প-ব্যবস্থাকে এই ধরণে গঠিত করা নিতান্ত আবশ্যক। এই সকল শিল্পই মৌলিক শিল্প। ইহার মধ্যে কেবল যে যন্ত্রশিল্প, খনিজ শিল্প, বিদ্যুৎ-উৎপাদন এবং যানবাহন-শিল্প ধরিতে হইবে, তাহা নয়; কৃষি-শিল্প এবং বস্ত্র-উৎপাদন ব্যবস্থাও এই হিসাবে মৌলিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

পূর্বে বলিয়াছি, (পৃ. চুয়াল্লিশ দ্রষ্টব্য) খাদ্য ও বস্ত্র শিল্পের অস্তিত্ব বজায় রাখা শুধু যে রাষ্ট্রের কর্তব্য, তাহা নয়, ইহা গ্রামসমাজেরও কর্তব্য—এবং গ্রাম-সমাজ যাহাতে নিজের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে পারে, সেইজন্য এই দুইটি শিল্পের যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ বাঞ্ছনীয়ও বটে। এই দিক্ দিয়া, গ্রাম-সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে, অন্ন ও বস্ত্র শিল্পকেই একমাত্র "মৌলিক শিল্প" বলিতে বাধা নাই।

যাহা হোক্, পরিকল্পনার এই বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে এবং দ্রুত-পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক জগতে শিল্পব্যবস্থাকে স্বল্পতম সামাজিক ব্যয়ের (minimum social cost) ভিত্তিতে সর্বদা পরি-চালিত করিতে হইলে, একটি সর্বক্ষণব্যাপী (whole-time) পরিকল্পনাকারী প্রতিষ্ঠানের নিতান্ত প্রয়োজন। এই প্রতিষ্ঠান স্বদেশ ও বিদেশের শিল্পসংস্থা ও

উৎপাদন-ব্যয়ের তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের আর্থিক সংগঠনের নির্দেশ দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। ইহার মধ্যে অর্থনীতিবিদ্, রাসায়নিক, যন্ত্রবিদ্, শিল্প-পরিচালক, শ্রমিক এবং ক্রেতার আসন থাকিবে। ইহার আলোচনা-বলী যথাসম্ভব জনমতের দ্বারা প্রভাবিত হইবে। যে কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার জন্য ডাকিবার অধিকার এই প্রতিষ্ঠানের থাকিবে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সাময়িক (ad hoc) প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার ক্ষমতা ইহার থাকিবে। ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ইহার সভাপতি হইবেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের অভিমত না লইয়া কোনো আইন পেশ করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে না। এই প্রতিষ্ঠানের দপ্তর (secretariat) হইবে স্বদেশে ও বিদেশে বহুবিস্তৃত। অর্থ নৈতিক জীবনের চাবিটি এই প্রতিষ্ঠানের হাতেই ন্যস্ত রাখিতে হইবে।

আমাদের মনে হয়, স্বতন্ত্র ভারতের অর্থ নৈতিক সংগঠনের জন্য কোনো বাঁধাধরা নক্সা (plan) তৈরি করার চেয়ে এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান কী ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিতে পারে, সেই কথা চিন্তা করাই আমাদের শিল্প-নায়ক ও অর্থনীতিবিদ্গণের বর্তমান কর্তব্য।

—১৬—

বিগত অধ্যায়ের আলোচনার মধ্যে নানা প্রসংগে বেকার সমস্যার আলোচনা উত্থাপন করিবার অবকাশ ছিল, কিন্তু সমস্যাটি এমনই গুরুতর যে একটি পৃথক্ অধ্যায়ে এ সমস্যার পর্যালোচনা করাই সংগত বলিয়া মনে হইয়াছে। পূর্বে এ কথা বলা হইয়াছে যে, জাতীয় আয়ের ন্যূনতম মাত্রায় পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত যে বেকার-সমস্যা, সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে তাহা 'প্রকৃত' বেকার-সমস্যা নয়। ইহার উদ্ভব অপর্যাপ্ত মূলধন-বিনিয়োগে, কিংবা শিল্পব্যবস্থার উপর ব্যক্তিগত এক-নায়কত্বের (monopoly) দরুণ হইতে পারে। অথবা, উৎপাদন রীতির পরিবর্তন এই ধরণের বেকার-সমস্যার জন্য দায়ী হইতে পারে। কিন্তু, প্রধানত,

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ফলেই দীর্ঘকালব্যাপী কর্মহীনতা-সমস্যার উদ্ভব হয়। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় কেবল এই সকল কারণেই কর্মহীনতা-সমস্যার উদ্ভব ঘটিতে পারে।

স্বতন্ত্র ভারতের অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রথম যুগে রাষ্ট্র কর্তৃক মূলধন-বিনিয়োগ নীতির ভার গ্রহণের আবশ্যকতা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এই যুগে কর্মহীনতা-সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হওয়া অসম্ভব। কিন্তু পরিকল্পনা-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন মূলধন-বিনিয়োগের প্রাথমিক উদ্দেশ্য (এই যুগে, সঞ্চয়সংগঠন) ব্যাহত না করিয়া যথাসম্ভব-অধিক লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ, মূলধন-বিনিয়োগের জন্য, যে-সব শিল্পের কর্মসংস্থান-সূচী (employment index) উঁচুতে, সেই ধরণের শিল্পকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্তব্য। এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মূলধন-বিনিয়োগ-নীতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য অন্যরূপ, ততক্ষণ পর্যন্ত বেকার-সমস্যার সম্পূর্ণ বিলোপ আমরা আশা করিতে পারি না। মূলধন-সঞ্চয় পর্যাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, শিল্পকে সরলতর (less round-about) করিয়া বেকার-সমস্যার সমাধান করিবার কল্পনা অদূরদর্শিতার পরিচায়ক মাত্র।[১০১] এ যুগে বেকার-সমস্যাকে যাহাতে খানিকটা লঘু করা যায়, নিতান্ত নিঃস্ব ব্যক্তিকে সামাজিক-সাহায্যের দ্বারা কোনো রকমে বাঁচাইয়া রাখা যায়, তাহাই হইবে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

এই ধরণের সামাজিক সাহায্যের দ্বারা ব্যক্তিচরিত্র যাহাতে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেই উদ্দেশ্যে বিকেন্দ্রীভূত স্বায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া এই সাহায্যের বণ্টন বাঞ্ছনীয়। লোকায়ত্ত গ্রাম-সমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য এই সাহায্য-দান ব্যবস্থাকে রাষ্ট্র যন্ত্র-স্বরূপ ব্যবহার করিতে পারে। সম্ভব হইলে, গ্রামসমাজ নিজেই যাহাতে এই সাহায্য-দানের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহার ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। আমাদের মনে হয়, এইরূপ অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর গ্রামসমাজের পত্তন হইলে, তাহার পক্ষে স্থায়ী ও লোকায়ত্ত হইবার সম্ভাবনা বেশি। এইরূপ

সাহায্যের বিনিময়ে কর্মহীন ব্যক্তিদের দ্বারা গ্রামের সাধারণ অনর্থনৈতিক (non-economic) বিকাশের কাজ করাইয়া লওয়া চলে।

যাহাই হউক্, কর্মাভাব-সমস্যাকেই প্রধান সমস্যা মনে করিবার মতো অবস্থা এখন আমাদের নয়, এ কথা বারবার স্মরণ করা প্রয়োজন। এমন কি, দ্বিতীয় যুগের শিল্পসংগঠনেও কর্মাভাবকেই প্রধান সমস্যা বলিয়া মনে না করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। তথাপি এই যুগে, যে সকল শিল্প ব্যক্তিগত ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহারা যাহাতে পূর্ণ বিকশিত অবস্থা লাভ করিতে পারে, ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার দ্বারা পীড়িত হইয়া অকারণ বেকার-সমস্যার সৃষ্টি না করে, সেদিকে নজর রাখা পরিকল্পনা-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান কাজ হইবে। আবশ্যক হইলে, ব্যক্তিপ্রধান শিল্পের পুনর্গঠনের জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপও সমর্থন করিতে হইবে। শিল্পের যে অংশেই অকারণ প্রতিযোগিতার[১০২] সৃষ্টি হইতেছে, সেই অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

পূর্ণ নিয়োগের (full employment) জন্য যে পরিমাণ মূলধন সঞ্চয়ের প্রয়োজন, কেবল তাহার ব্যবস্থা হইবার পরেই আভ্যন্তরীণ কারণে বেকার-সমস্যার সৃষ্টির প্রতি রাষ্ট্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া সংগত। কিন্তু প্রথম হইতেই বহিরাগত কারণে তাহার পরিকল্পনা যাহাতে বিধ্বস্ত না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টিদান করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। পরিকল্পনা-প্রতিষ্ঠানকে প্রথম হইতেই বিদেশী শিল্পের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া পরিকল্পনার নির্দেশ দিতে হইবে। যে জিনিস বিদেশ হইতে আমদানি করা অধিকতর লাভের, তাহা যাহাতে স্বদেশে উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা না হয়, সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকিয়া মূলধন-বিনিয়োগ নীতিকে পরিচালনা করা তাহাদের কর্তব্য হইবে। এই উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যয়নির্ধারণ নীতির আশ্রয় গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

কিন্তু শিল্প-ব্যবস্থা তো স্থাণু ((static) নয়; অতএব, প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি বিদেশী প্রতিযোগিতার চাপে দ্রুত বিধ্বস্ত না হয়, এ দিকে দৃষ্টি দেওয়াও পরিকল্পনা-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্তব্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থনৈতিক

সংগঠনকে সহজে পরিবর্তনশীল (elastic) অবস্থায় রাখার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু এক শিল্প হইতে অন্য শিল্পে কিংবা এক শিল্পরীতি হইতে অন্য শিল্পরীতিতে যাইবার পথে, যাহাতে দ্রুত বেকার-সমস্যার প্রসার না ঘটে, সেইজন্য বিধিবদ্ধ পরিবর্তনের (conditioned transition) উপায় হিসাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যরীতির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার বিস্তার করিতে হইবে। এই নিয়ন্ত্রণের অঙ্গ (technique) হিসাবে 'সাময়িক' শুল্ক (tariffs) এবং পরিমাণ নির্দেশ-পন্থার (quotas) ব্যবহারই বাঞ্ছনীয়। এখানে 'সাময়িক' বলিতে সব ক্ষেত্রেই যে কয়েক বৎসর মাত্র বুঝাইবে, তাহা নয়। কোনো কোনো শিল্পের বেলায় এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ একজীবনকালব্যাপী (generation) কিংবা তাহারও বেশি সময়ের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময় অন্তে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান কালে প্রচলিত "বিবেচনামূলক সংরক্ষণ"-নীতির সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকিবে, কিন্তু পার্থক্যও অনেক। প্রথমত, শিল্পের সংরক্ষণের জন্য তাহার নিজের পক্ষে উদ্যোগী হইবার প্রয়োজন নাই ; পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুসারে শিল্পের প্রসারণ কিংবা সংকোচন, পরিকল্পনা-প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই নিয়মিত হইবে। দ্বিতীয়ত, যে-সকল শিল্পের সংকোচন জাতীয় স্বার্থের জন্য আবশ্যক, তাহাদের সংকোচন যাহাতে কাহারও দ্রুত কর্মচ্যুতির কারণ না হয়, রাষ্ট্রের পক্ষে সেই ধরণের বিধান প্রণয়ন করা আবশ্যক হইবে। তৃতীয়ত, 'মৌলিক শিল্প' গুলির অস্তিত্ব যাহাতে একেবারে লুপ্ত না হইয়া যায় এবং আবশ্যক হইলে তাহাদের বিকাশকে সহজে ত্বরান্বিত করা চলে, পরিকল্পনাকে সেই ভাবে গঠন করিতে হইবে। সাধারণ নীতি হিসাবে, এই সকল শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রধানত মূল্যসাহায্য-নীতির (subsidy) আশ্রয় গ্রহণ করাই সংগত। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরিমাণ-নির্দেশ-পন্থার (quotas) আশ্রয় নেওয়াও অনুচিত হইবে না। বিদেশের সহিত এই মর্মে চুক্তি (commercial treaties) সম্পাদন করিবার জন্য স্বতন্ত্র ভারতকে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বর্তমান এলোমেলো (haphazard) সংরক্ষণ প্রথার অবসান ঘটিবে এবং সর্বাঙ্গীণ শিল্প-পরিকল্পনার একটি অংগ হিসাবে প্রয়োজন হইলে 'সাময়িক' সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিতে হইবে।[১০৩] সংরক্ষণের আঙ্গিক (technique)-রূপে শুল্কনীতি (tariffs) অপেক্ষা পরিমাণ-নির্দেশ-নীতি (quotas) কিংবা মূল্য-সাহায্য-নীতিই অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

পূর্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, গ্রামসমাজের আর্থিক জীবনে অন্ন ও বস্ত্র শিল্পকে মৌলিক শিল্প বলা চলে। এই হিসাবে, এই সকল শিল্পকে উপযুক্ত আকারে রক্ষা করিবার ক্ষমতা গ্রামসমাজের উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত। লোকায়ত্ত গ্রামসমাজের বিকাশ হইবার সংগে সংগে অন্ন ও বস্ত্র ব্যাপারে গ্রামকে যথাসম্ভব স্বাবলম্বী করিবার চেষ্টা আরম্ভ হওয়া সংগত। কিন্তু উপর হইতে জোর করিয়া স্বাবলম্বন শিক্ষা দিবার চেষ্টাও ব্যর্থ হইতে বাধ্য। সাধারণ নীতি হিসাবে, মূল্যের তারতম্যই গ্রামসমাজের আর্থিক সংগঠনের প্রকৃতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবে। ক্রমে গ্রামসমাজের স্বাতন্ত্র্য-চেতনা বাড়িবার সংগে সংগে এই ধরণের অর্থ নৈতিক মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগা অসম্ভব নয়।[১০৪] গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইলে নিছক মূল্যতুলনার দিক্ দিয়াও হয়তো তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু থাকিবে না। যাহাই হোক, সমাজ ক্ষুদ্রই হোক আর বৃহৎ-ই হোক, স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে অতিরিক্ত মূল্য দিয়া স্বাবলম্বন অর্জনের কল্পনাকে আমরা সমর্থন করিতে পারি না। কিন্তু যেখানে বিকেন্দ্রীভূত এবং কেন্দ্রীভূত বস্ত্র উৎপাদন রীতির মধ্যে ব্যয়পার্থক্য সামান্য, সেখানে মূল্য-সাহায্য-নীতির (subsidy) সহায়তায় বিকেন্দ্রীভূত বস্ত্র-শিল্পকে উৎসাহ দেওয়াকে মারাত্মক ত্রুটি বলিয়াও মনে করি না। তবে, এই মূল্যসাহায্য (subsidy) গ্রামসমাজ নিজস্ব তহবিল হইতে নিজের মুক্তিপন্থা বজায় রাখিবার জন্য ব্যয় করিবে, ইহাই স্বাভাবিক ও সংগত।

—১৭—

স্বতন্ত্র ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের জন্য একটি উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান, যথাযথ মূলধন-সঞ্চয় ও মূলধন-নিয়োগ-নীতি এবং ক্রমাগত-পরিবর্তনশীল (dynamic) শিল্প সংগঠন-রীতি, ইত্যাদির আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমরা গত দুই অধ্যায় ধরিয়া অনেক কিছু বলিয়াছি ; কিন্তু ইহার সংগে সংগে, সমান্তরাল নীতি হিসাবে, উগ্র সম্পত্তি-বৈষম্য (inequality of property) এবং গুরুতর আয়-বৈষম্য (inequality of incomes) দূর করিবার উপায়ও যে অবলম্বন করা আবশ্যক, সে কথা এই অধ্যায়ে স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। বস্তুত, যে মূল্য ও ব্যয়ের ইংগিতে আর্থিক জীবনকে গঠন করিতে হইবে, তাহাই যদি আয়-বৈষম্য এবং সম্পত্তি-বৈষম্যের দ্বারা বিকৃত হয়, তাহা হইলে আর্থিক জীবনকে যুক্তিসিদ্ধ উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করিবার কোনো উপায় থাকে না। সেইজন্য পরিকল্পনার অংগ ও নির্দেশক হিসাবে, আয়ের তারতম্য সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান সংকলন করা পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অপরিহার্য।

সাম্য-সংস্থাপনের চেষ্টা বিশেষ ভাবে আমাদের পূর্বকথিত "দ্বিতীয় যুগের" গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের বিবেচনায়, ভারতবর্ষে আয়ের তারতম্য অপেক্ষা সম্পত্তির তারতম্য দূর করা অধিক আবশ্যক—এবং অধিকতর দুরূহ। বস্তুত, গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সাম্য-সংস্থাপনের চেষ্টা কতদূর পর্যন্ত সফল হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করাও সংগত। এ পথে দ্রুত এবং চমকপ্রদ সাম্য সংস্থাপনের আশা নিতান্তই অবাস্তব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যেহেতু, উগ্র কম্যুনিজমের উদ্ভব হইবার মতো কোনো আভাস এ দেশে পাওয়া যাইতেছে না, এবং যেহেতু কম্যুনিজমকে সর্বাংগসুন্দর ব্যবস্থা বলিতেও গুরুতর আপত্তি আছে, সেই হেতু সাম্য-সংস্থাপনের জন্য গণতান্ত্রিক উপায়কেই একমাত্র পথ বলিয়া আমাদের ধরিয়া লইতে হইতেছে। যদি তাহাই হয়, তবে সাম্য সংস্থাপনের বর্তমান সম্ভাবনা কতদূর, তাহাই আমাদের এই অধ্যায়ে বিবেচনার বিষয়।

ভারতবর্ষে সম্পত্তি-বৈষম্যের প্রধান কারণ জমিদারি-প্রথা। আধুনিক যুগে, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যন্ত্রশিল্পের প্রসারও এই বৈষম্যকে বাড়াইয়া দিয়াছে। অথচ, এই দেশেরই অনেক অংশে জমিদারের দেয় রাজস্বের পরিমাণ স্থায়িভাবে নির্ধারিত; এ দেশে মৃতের সম্পত্তির উপর কোনো কর নাই। এ দেশে অর্থবানের হাতে অর্থ নির্বিবাদে সঞ্চিত হইতে পারে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির এমনই মহিমা! এই সকল ত্রুটি অবশ্য এক দিনে দূর করিয়া দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু স্বতন্ত্র ভারতের পক্ষে মৃতের সম্পত্তির উপর কর (death duties) ধার্য করা অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য; এবং এই কর যথাসম্ভব উচ্চ হারে নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। এই করকে নানা উপায়ে স্তর-বিন্যস্ত (graduated) করিবারও আবশ্যকতা আছে। বর্তমান প্রবন্ধে বিস্তৃত কর-নীতি নির্ধারণ করিয়া দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নয়—কিন্তু স্বতন্ত্র ভারত যাহাতে এই "মৃত্যু-কর"কে আয় বাড়াইবার উপায় মাত্র মনে না করে, যাহাতে ইহার সাহায্যে উগ্র সম্পত্তি-বৈষম্য প্রশমিত হয়, তাহার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

পূর্বে বলিয়াছি, আয়বৈষম্যকে আমরা সম্পত্তিবৈষম্যের চেয়ে কম গুরুতর সমস্যা বলিয়া মনে করি। কারণ, সম্পত্তিবৈষম্য হইতে বিচ্ছিন্ন যে আয়বৈষম্য, তাহার পরিমাণ ভারতবর্ষে অত্যন্ত নগণ্য। বিশেষত, সে আয়বৈষম্য যে ক্ষেত্রে ক্ষমতার তারতম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ক্ষেত্রে তাহাকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দেওয়াও আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। সেইজন্য, আয়করের (Income Tax) ভার যদি মোটামুটি অধিক-আয়-বিশিষ্ট লোকের উপর পড়ে, তাহা হইলেই আমরা সন্তুষ্ট। কিন্তু শিল্প প্রসার যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে আয়বৈষম্য যাহাতে উগ্রতর আকার ধারণ না করে, পূর্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়, এ ক্ষেত্রে আয়করের সাহায্য লইবার আগে শিল্পব্যবস্থার ভিতর দিয়া আর্থিকসাম্য কতদূর রক্ষা করা সম্ভব, তাহা বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ, রাষ্ট্র ধনিককে অবাধ অর্জন করিবার সুযোগ দিয়া পরে তাহার নিকট হইতে আয়ের মোটা অংশ আদায় করিয়া

লইবে,—এ ব্যবস্থার চেয়ে প্রথম হইতেই ধনিক যাহাতে শ্রমিকের সঙ্গে আয় ভাগ করিয়া নিতে বাধ্য হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা অধিকতর ন্যায়সংগত। অন্য কথায় বলিতে গেলে, শিল্প ব্যবস্থার উপর শ্রমিকের সমকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পূর্বে এক স্থানে, ইহাকেই আমরা নি য় ন্ত্র ণে র বি কে ন্দ্রী-ক র ণ বলিয়াছি।

পরবর্তী অধ্যায়ে শিল্পব্যবস্থার আলোচনা প্রসংগে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য শিল্পকে রাষ্ট্রের সম্পত্তি (property) কিংবা দপ্তর (department) বিশেষে পরিণত করিবার আবশ্যকতা নাই। শিল্পের উপর শ্রমিক সাধারণের সমকর্তৃত্ব স্থাপিত হইবার সুযোগ দেওয়াই রাষ্ট্রের পক্ষে যথেষ্ট। ধনিকের আয়কে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখিবার পক্ষেও এ কথা সমান সত্য। অবশ্য, কোনো কোনো শিল্পে ধনিক ও শ্রমিক উভয়েই ক্রেতার নিকট হইতে অতিরিক্ত লাভের দাবি করিতে পারে। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করিতেই হইবে। কিংবা, আকস্মিক কারণে অতিরিক্ত আয়ের (windfalls) উদ্ভব হইলেও রাষ্ট্রকে সে আয় 'জব্দ' করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণ নীতি হিসাবে কঠোর আয়কর নীতি অবলম্বন করার আগে আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধির সাহায্যে সাম্য কতদূর সংস্থাপিত হইতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ শিল্প-ব্যবস্থাকে দেওয়া রাষ্ট্রের একান্ত কর্তব্য।[১০৫]

উপরের কথাগুলি বাণিজ্য-ব্যবস্থা সম্বন্ধে নির্বিচারে প্রযোজ্য নয়। কিংবা শিল্প যেখানে নিতান্ত ক্ষুদ্রাকৃতি (যেমন, চাষের কাজে) সেখানেও আয়বৈষম্য দূর করিবার জন্য শ্রমিকের সংগঠনের উপর নির্ভর করা সম্ভব নয়। কিন্তু ছোটো ছোটো শিল্পে সরকারি বৃত্তি-প্রতিষ্ঠান (wages board) গড়িয়া এবং বাণিজ্যগত আয়ের উপর বিশেষ কর ধার্য করিয়া (ইহা অসম্ভব হইলে সমবায়বদ্ধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান [co-operative trading agencies] গঠনে সহায়তা করিয়া), এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। মোট কথা, স্বাধীন আয়ের উপর কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ এবং প্রয়োজন যত অল্প হয়, ততই ভালো। এই দিক দিয়া

বিকেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের অধীনে শিল্প সংগঠনের প্রসারে উৎসাহ দেওয়াই রাষ্ট্রের পক্ষে সাম্য-সংস্থাপনের প্রকৃষ্টতর উপায়।

—১৮—

স্বতন্ত্র ভারতের শিল্পব্যবস্থার উপর সমাজতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমাদের মতামত স্পষ্ট করিয়া বলা কর্তব্য। ভারতবর্ষের শিল্প-ব্যবস্থা একান্ত অবাধ ধনতন্ত্রের ভিত্তির উপর স্থাপিত হোক্ ইহা আমাদের কাম্য নয়। শিল্প-ব্যবস্থার উপর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ, শিল্পবিকাশের গতি-নিয়ন্ত্রণ, এবং সংকোচনশীল শিল্প হইতে প্রসারণশীল শিল্পে প্রয়াসবিস্তার, ইত্যাদির দায়িত্বভার গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করা ভিন্ন আমাদের অন্য উপায় নাই। কেন না, রাষ্ট্রের ভিত্তিকে গণতন্ত্রসম্মত করিবার আগে, স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে, রাষ্ট্রনিরপেক্ষ কোনো আর্থিক সংগঠনকে ধরিয়া রাখিবার মতো ক্ষমতা আমাদের নাই। যদিও বা নানা ক্ষুদ্র কেন্দ্রে সমবায়বদ্ধ আর্থিক জীবন গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করি, তথাপি তাহাতে উপযুক্ত আর্থিক সিদ্ধি লাভ করা অসম্ভব; পরন্তু শ্রেণী রাষ্ট্রের পীড়নে সে-ব্যবস্থা দ্রুত ভাঙিয়া পড়িতে বাধ্য। এ কথা স্মরণ করা ভালো যে, রাষ্ট্রের দিকে যখন আমরা আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য তাকাই, তখন, প্রকৃত পক্ষে নিজেদের দিকেই তাকানো হয়—অতএব রাষ্ট্রকে 'পর' মনে করিয়া আর্থিক জীবনকে তাহার হাত হইতে মুক্ত করার চেষ্টা নিজেদের জীবনকে অনাবশ্যক দুই খণ্ডে বিভক্ত করিবার চেষ্টা মাত্র। বোধ হয়, ইহা সম্ভবও নয়।

কিন্তু রাষ্ট্রের সাধারণ এবং সর্বাংগীন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণ হইবে বিকেন্দ্রীকৃত। ইহার অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্র তাহার ক্ষমতা অন্যান্য সংগঠনের হাতে তুলিয়া দিবে,—ইহার অর্থ শুধু এই যে, জনসাধারণের স্বাধীন সমবায় সমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে গড়িয়া উঠিলেও, যেহেতু রাষ্ট্র গণতন্ত্রসম্মত, সেই হেতু এই সকল সমবায় ক্ষমতার অংশ নিজেরাই আকর্ষণ করিয়া লইবে। শিল্পের সংগঠনে এই সকল সমবায়ই প্রধান অংশ গ্রহণ করিবে, রাষ্ট্র কেবল

নির্দেশ দিবে ও সামঞ্জস্য বিধান করিবে মাত্র। রাষ্ট্রের ইচ্ছা এই সকল সমবায়ের ইচ্ছার সমন্বয়মাত্র হইবে, এবং বিরোধের আভাস কখনো কখনো দেখা দিলেও প্রকৃত বিরোধের উদ্ভব কখনোই হইবে না।

এই সকল সমবায়ের মধ্যেই ব্যক্তি তাহার প্রকৃত স্থান খুঁজিয়া পাইবে। ব্যক্তিপ্রধান ধনতন্ত্রে যে ধরণের ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়, এ ব্যবস্থায় সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ব্যক্তি যাহাতে তাহার সমীপবর্তী সমবায়ের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তাহার পরিপূর্ণ সুযোগ তাহাকে দেওয়া হইবে। বস্তুত, কেবল আর্থিক ব্যবস্থা হিসাবে নয়, শিক্ষার অংগ হিসাবে এবং গণতন্ত্র-বিকাশের জন্যও ইহা আবশ্যক। অধ্যাপক জোড্ (Joad) সত্যই বলিয়াছেন,

"রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে আকারে ছোট করিতে হইবে, যাহাতে মানুষ তাহার নিজের চেষ্টার ফলাফল বুঝিতে পারে। যেন সে বুঝিতে পারে যে, সমাজ তাহার ইচ্ছার দ্বারাই পুনর্গঠিত হইতে পারে, কেন না, সমাজ তো তাহারাই।" ১০৬

স্বতন্ত্র ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা ও আর্থিক ব্যবস্থার সংগঠনে এই নীতিটিকে প্রাধান্য দিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্যে শিল্প-ব্যবস্থার নূতন কাঠামো গড়িয়া তোলা আবশ্যক। অবাধ ধনতন্ত্রে যেমন ধনিকের ইচ্ছার দ্বারাই শিল্পের গতিবিধি নিরূপিত হয়, কিংবা সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় যেমন রাষ্ট্র নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের দ্বারা শিল্প-পরিচালনার কল্পনা করা হয়, আমাদের বিবেচনায় তাহার কোনোটিই বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের মনে হয়, নূতন শিল্প এবং নূতন প্রণালী পরীক্ষা করিবার জন্য ব্যক্তির যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকা উচিত। ব্যক্তি যেন রাষ্ট্রনিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক-রূপে নিজের দায়িত্ব লঘু করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা কর্তব্য। সেইজন্য, শিল্পগঠনের উদ্যোগকে ব্যক্তির হাতে তুলিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আর্থিক সংগঠনের প্রাথমিক অবস্থায়, রাষ্ট্রীয় মূলধন-বিনিয়োগ-নীতির দ্বারা এই উদ্যোগ নিয়ন্ত্রিত হওয়াও অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ, ব্যক্তির পক্ষে যে কোনো পথে মূলধন-বিনিয়োগ করিবার স্বাধীনতা আর স্বীকৃত হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, শিল্প-

ব্যবস্থার তত্ত্বাবধায়ককে একান্তভাবে নিজের খুসিমতো চলিতে দেওয়াও অসম্ভব। সেই উদ্দেশ্যে, শ্রমিক সংস্থার বিকাশে রাষ্ট্রের উৎসাহ এবং শিল্পের নিয়ন্ত্রণভার অংশত শ্রমিক সংস্থার উপর ন্যস্ত করা আবশ্যক। বস্তুত শিল্প প্রবর্তনের অল্প সময়ের মধ্যে ধনিককে শ্রমিক সংস্থা (trade unions) মানিয়া লইবার (recognise) জন্য বাধ্য করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। যেসকল শিল্প অত্যন্ত বৃহদাকার, তাহার পরিচালনা-সংসদে ধনিক ও শ্রমিকের প্রতিনিধি ব্যতীত ক্রেতার (কিংবা, ক্রেতার পক্ষ হইতে রাষ্ট্রের) প্রতিনিধি থাকাও অত্যন্ত আবশ্যক। মৌলিক যন্ত্র-শিল্প-গুলির উপর যন্ত্রবিদ্, শ্রমিক ও ক্রেতার যৌথ পরিচালনা-সংসদ্ স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

কুটির-শিল্পগুলির সংগঠনে সমবায় প্রণালীর (co-operation) ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু স্বেচ্ছামূলক সমবায় গড়িয়া না উঠা পর্যন্ত, অতিলোভী বণিকের হাত হইতে কুটির শিল্পকে বাঁচাইবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। অবশ্য, বাস্তবে এ কাজের ভার প্রধানত গ্রামসমাজকেই নিতে হইবে।

ব্যক্তিগত বাণিজ্যের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা প্রথম হইতেই বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্যে প্রদেশে প্রদেশে কতকগুলি বাণিজ্য-সভা (Trade commissions) গড়িয়া তুলিতে হইবে—এবং, যেখানেই অবাধ ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ফলে অকারণ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইতেছে, সেখানেই উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বনের ভার ইহাদের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে। পাইকারি বণিক, খুচরা বণিক, শিল্পসভা এবং ক্রেতার প্রতিনিধি লইয়া এই সভা গঠিত হইবে।

মূলধন বিনিয়োগ নীতিকে সার্থক করিতে হইলে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অর্থ প্রতিষ্ঠানের (financial institutions) উপর রাষ্ট্রের একান্ত কর্তৃত্ব থাকা আবশ্যক। উপযুক্ত মুদ্রানীতি অবলম্বনের দ্বারা এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কিনা, অথবা, ইহার জন্য ব্যাঙ্ক সমূহের উপর রাষ্ট্রের মালিকানা (ownership) প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক কিনা, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা অসম্ভব। ভারতবর্ষে টাকার বাজারের বর্তমান বিশৃংখল অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাহায্যে মূলধন

বিনিয়োগের উপর দৃঢ় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। সেইজন্য সাময়িকভাবে স্টক্ এক্সচেঞ্জ (Stock Exchange) বন্ধ করিয়া দিয়া, মুলধনের অযথা বিনিয়োগের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ঋণের (Public debt) সৃষ্টি করিয়াই মুলধন বিনিয়োগকে নির্ধারিত পথে চালিত করিতে হইবে।

—১৯—

কৃষিশিল্পের পুনর্গঠন এতই প্রয়োজনীয় যে, ইহার জন্য স্বতন্ত্র ও বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক। প্রকৃতি যদিও ভারতবর্ষকে কৃষিশিল্পের উপযুক্ত করিয়া গঠন করিয়া ছিলেন, তথাপি নানা কারণে ভারতবর্ষের হীনতম শিল্পগুলির মধ্যে কৃষি অন্যতম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষিকে পূর্ণাবয়ব শিল্পে পরিণত করিবার জন্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন, ভারতবর্ষে তাহার একান্ত অভাব। এখানে কৃষিক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণ জমির অভাব, ভালো বীজ ও সারের অভাব, সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থার অভাব, এবং সর্বোপরি শিল্পবুদ্ধির অভাব,—সমস্ত মিলিয়া এক দুঃসাধ্য সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। উপরন্তু, ভারতবর্ষে কৃষিশিল্প অত্যন্ত স্থাণু; অভ্যস্ত কৃষিশিল্পকে পরিত্যাগ করিয়া শিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে অনেকেই নারাজ। সেইজন্যে কৃষিশিল্পের উপর সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

ইহার জন্য প্রথম প্রয়োজন, জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন। জমিদারি সম্পত্তির উপর কেবল মৃত্যু-কর ধার্য করাই যথেষ্ট নয়, (পৃ. একশো পাঁচ) জমির উপর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা একেবারে লোপ করিয়া দেওয়াই আমাদের কাম্য।[১০৭] জমিতে কী ফসল চাষ হইবে, কোন্ জমি কে চাষ করিবে এবং জমিতে কত লোকের কর্মসংস্থান হইবে, তাহার যৌথ নির্ধারণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতএব, কৃষিশিল্পের পুনর্গঠনের জন্য দ্বিতীয় প্রয়োজন, গ্রামসমাজের পুনরুজ্জীবন। গ্রামসমাজের অন্তর্ভুক্ত জমিসমূহের বিলিবন্দোবস্ত গ্রামসমাজের

পরিকল্পনা অনুসারেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু, গ্রামসমাজের স্বতন্ত্র বিচারক্ষমতা (discretion) বজায় রাখিয়াও কেন্দ্রীয় (কিংবা প্রাদেশিক) পরিকল্পনার দ্বারা গ্রাম্য পরিকল্পনা-সমূহের সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি ভ্রাম্যমান (itinerant) জমি-শাসন-সভা (Land-control Commission) প্রত্যেক প্রদেশে গঠন করিতে হইবে। ইহার মধ্যে জমিবিজ্ঞানী অর্থনীতিবিদ্, কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকের প্রতিনিধি থাকা বাঞ্ছনীয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে জমির ব্যবস্থা নির্ধারিত হইলে, গ্রামসমাজের অনুমতি ব্যতীত, জমি হস্তান্তরিত করা নিষিদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। জমির চাষ এবং মালিকানা ব্যক্তির হাতেই থাকিবে, জমির আয় ব্যক্তিই ভোগ করিবে, কিন্তু সমাজগত নির্ধারণ অনুসারেই তাহাকে চলিতে হইবে। আবার, চাষের যন্ত্রপাতি কিনিবার জন্য এবং ফসল বিক্রয় করিবার জন্য সমবায় পন্থার (co-operation) আশ্রয় গ্রহণ করাই সমীচীন। এইরূপে ব্যক্তিগত চাষ এবং সামাজিক স্বার্থরক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

কৃষিশিল্পের পুনর্গঠনে কেন্দ্রেরও কতকগুলি বিশেষ কর্তব্য আছে। বৃহদাকার সেচ ব্যবস্থা, রাসায়নিক সার সংগ্রহের ব্যবস্থা, কৃষিসংক্রান্ত গবেষণা এবং নূতন ধরণের শস্য উৎপাদনে উৎসাহ দান,—ইহাই বিশেষভাবে রাষ্ট্রের কর্তব্য। এ জন্য বিভিন্ন গ্রামসমাজে বহুসংখ্যক আদর্শ কৃষিক্ষেত্র (model farms) স্থাপন করা, কৃষিশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে সহজে জমি পাইবার সুযোগ দেওয়া—রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়া উচিত। সেই সংগে, বিক্ষিপ্ত, ব্যক্তিগত উদ্ভাবন যেন উৎসাহের অভাবে লুপ্ত না হইয়া যায়, সেজন্য বিশেষ পুরস্কার ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক।

শিল্প ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার ছিল, তাহা সম্পূর্ণ করিয়া বলা এই প্রবন্ধে অসম্ভব। কিন্তু শিল্প-ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও তুলনামূলক ব্যয়ের (comparative costs) ভিত্তির উপর রাখিয়াও, যে সামাজিক নির্ধারণ সমূহ কার্যে পরিণত করা সম্ভব, আশা করি, গোঁড়া সমাজতান্ত্রিকও সেকথা

বুঝিতে প্রয়াসী হইবেন। আমাদের কল্পনায় এই কথাটিকেই প্রাধান্য দিতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি। বস্তুত, ইহাকেই আমরা সমাজতন্ত্রবাদের (Socialism) সারসত্য (essence) মনে করি।[১০৮] পক্ষান্তরে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীভূত করিয়া গান্ধীপন্থী সমালোচকের আপত্তি নিরসন করিতেও আমরা ত্রুটি করি নাই।

উপরে তুলনামূলক ব্যয় সম্বন্ধে একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। তাহা এই যে, ব্যক্তিপ্রধান আর্থিক ব্যবস্থা যে-রীতিতে তুলনামূলক ব্যয়ের হিসাব করে, সমাজসম্মত রীতিতে তুলনামূলক ব্যয়ের হিসাব তাহা হইতে ভিন্ন উপায়ে করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, কোনো শিল্পে উৎপাদন ব্যয় হয়তো অন্য শিল্প অপেক্ষা কম, কিন্তু ইহার কারণ, উভয় শিল্পে শ্রমিকের আয়-বৈষম্য। সে ক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম আয়ের ভিত্তিতে উভয় শিল্পের ব্যয়-নির্ধারণ করিতে হইবে। শ্রমিকের গৃহনির্মাণ যদি রাষ্ট্র করিয়া দেয়, তাহা হইলেও শিল্পের ব্যয়-সংকলনে, গৃহনির্মাণ-ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এই ভাবে একটি সংগত সামাজিক ব্যয় নির্ধারণ-রীতির উদ্ভব হইবার সংগে সংগে পূর্বকল্পিত পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের কাজ অনেক সহজ হইয়া আসিবে।

—২০—

এবার প্রবন্ধের উপসংহার করিবার পালা। বুঝিতে পারিতেছি, এ প্রবন্ধে ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থ নৈতিক সংগঠনের জন্য কোনো প্রশস্ত পথ নির্দেশ করিয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই ; কিন্তু যাঁহারা পথ নির্দেশ করিয়াছেন তাঁহারাও যে সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন, প্রধানত তাহার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করাই এ প্রবন্ধের প্রথম প্রয়োজন। বস্তুত, তাঁহারা যে পথের প্রতি ইংগিত করিয়াছেন, সে পথে আকর্ষণ করিবার মতো বস্তু অনেক থাকিলেও, বিধিবদ্ধ সমাজজীবনের লক্ষ্যস্থলে সে পথ আমাদের পৌছাইয়া দিতে পারে না, এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক। আবার, সমাজজীবনকে রাষ্ট্র নামক কেন্দ্রের দ্বারা সর্বদা শাসিত

করিবার কল্পনাকেও আমরা বড়ো বেশি শ্রদ্ধা জানাইতে পারি নাই। যদিও বর্তমান জগতের বৃহত্তম সমবায়-কেন্দ্র হিসাবে রাষ্ট্রকে সর্বদাই আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি, তথাপি সেই কেন্দ্রকে অনুচিত প্রাধান্য দিয়া দ্রুত উন্নতির স্বপ্ন দেখা অপেক্ষা, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের দীর্ঘতর পথকেই আমরা বরণ করিয়া লইয়াছি।

এই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণকে বাস্তবে রূপ দিবার দায়িত্ব কে লইবে? পূর্বেই বলিয়াছি, গণতন্ত্র একটি অবস্থামাত্র নয়,—ইহা একটি বিকাশ পদ্ধতি। অতএব, ইহার সৃষ্টি সহসা হওয়া অসম্ভব। কিন্তু বাহিরের নানা সংঘাত, ব্যক্তিত্বের প্রভাব, এবং অবিশ্রান্ত প্রচারের দ্বারা গণতন্ত্রের প্রসার হইতে পারে। ইহার মধ্যে, প্রচারের কাজে নানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের স্থান সর্বাগ্রে। গণতান্ত্রিক চেতনার সৃষ্টির জন্য গান্ধীজির "গঠন-কর্ম পদ্ধতির" মূল্য সামান্য নয়। কিন্তু যে সকল নিঃস্বার্থ কর্মী এই পদ্ধতির বিস্তারে সাহায্য করিতেছেন, ইহার মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তাঁহারা যাহাতে গঠনকর্মকে ক্ষুদ্র উৎপাদন-পদ্ধতির প্রতি একান্ত আকর্ষণ বলিয়া ভুল না করেন, সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, স্বতন্ত্র ভারতে কী কী শিল্প থাকিবে, তাহারা দেশের কোন্ অংশে অবস্থিত হইবে, তাহাদের উৎপাদন মাত্রা কত হইবে এবং সে-মাত্রা কী হারেই বা বাড়িয়া যাইবে, এই সকল পরিচিত প্রশ্নের কোনো জবাব আমরা দিতে পারি নাই। আমরা কেবল কতকগুলি শিল্পকে "মৌলিক" আখ্যা দিয়া, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার এবং, আবশ্যক হইলে, প্রসারিত করিবার ভার রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিয়া কর্তব্য শেষ করিয়াছি। শিল্প ব্যবস্থাকে যথাযথ নির্দেশ দিবার জন্য একটি স্থায়ী পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান গঠনের কথাই আমরা বেশি করিয়া বলিয়াছি; কোনো নির্দেশ দিবার দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করি নাই। ইহার প্রধান কারণ অবশ্য এই যে, সচল (dynamic) আর্থিক জীবনে এক ধরণের নির্দেশই যে সর্বদা সামাজিক স্বার্থের বিধান করিবে, তাহা দুরাশা মাত্র।

যথাসম্ভব দ্রুত নির্দেশের সংশোধন ও পরিবর্তন সেই জন্যই বাঞ্ছনীয়। আর একটি কারণ এই যে, আর্থিক সংগঠনবিধির নির্দেশ দিবার জন্য যে পরিমাণ সংখ্যা ও তথ্যের আবশ্যক, বর্তমান লেখকের পক্ষে তাহা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই; বস্তুত, কোনো ব্যক্তির পক্ষেই একক এরূপ নির্দেশ প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে কিনা, সন্দেহ। তৃতীয় কারণ, অবশ্যই, অর্থনীতিশাস্ত্রে লেখকের পারদর্শিতার অভাব; এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

পরিশেষে এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলা ভালো যে, স্বতন্ত্র ভারতের আর্থিক সংগঠন কিরূপ হওয়া উচিত, প্রধানত তাহা লইয়াই আমাদের আলোচনা। কিন্তু 'যাহা হওয়া উচিত' এবং 'যাহা হইবার সম্ভাবনা'—এ দুইএর মধ্যে পার্থক্য অনেক। আমরা কেবল 'ঔচিত্যের' প্রশ্নটিকেই বিবেচনা করিয়াছি—সম্ভাবনার প্রশ্নটিকে বিবেচনা করিবার জন্য স্বতন্ত্র আলোচনা প্রণালী অবলম্বন করিতে হইত। বাস্তবিক পক্ষে স্বতন্ত্র ভারতের অর্থ নৈতিক সংগঠন, নানা শ্রেণীস্বার্থ, অগণিত ব্যক্তিত্বের প্রভাব, এবং বহির্জাগতিক ঘটনাবলীর দ্বারাই নির্ধারিত হইবে। এই বিচিত্র সমুদ্র মন্থনের ফলে স্বতন্ত্র ভারতের আর্থিক জীবন কী রূপ ধরিয়া দেখা দিবে, সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতে আমাদের ভরসা হয় না। আর্থিক-জীবনের যে আদর্শকে আমরা বাঞ্ছিত মনে করিয়াছি, তাহার আলোকে ভারত-বর্ষের আর্থিক বিকাশের পথ সুগম হইয়া উঠুক, ইহাই আমাদের কামনা।

স্বাধীন ভারতের আর্থিক সংগঠন

পরাধীনতার প্রকারভেদ ও স্বাধীনতার জন্য প্রয়াস

স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক সংগঠনের এক মনগড়া ছবি এঁকে তোলার আগে পরাধীনতার প্রকারভেদ এবং আর্থিক ইতিবৃত্তে স্বাধীনতার জন্যে প্রয়াস বিষয়ে দু এক কথা বলা দরকার। বিগত দু শ বছরের রাজনৈতিক ভাঙ্গা গড়ার যে ইতিহাস, তা থেকে পরাধীনতার প্রকারভেদ বেশ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যান্ত্রিক বিপ্লবের আগে যখন আর্থিক বিষয়ে সবাই প্রায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিল তখনকার দিনের যে সব যুদ্ধাভিযানের কথা আমরা পাই, তাতে রাজনৈতিক কারণে রাজ্যবিস্তার অথবা অন্যের উপর আপন কর্তৃত্ব বিস্তারের উদ্দেশ্যই প্রধান বলে দেখা যায়; কেউ কেউ আবার অশোকের মত ধর্মবিজয়কেও সম্মুখে রেখে আপন আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছেন। লোকসংখ্যার বৃদ্ধির জন্যেও মানুষ স্বদেশ ছেড়ে নূতন নূতন দেশের উদ্দেশ্যে অভিযান করেছে। কিন্তু গত দু শ বছরে যখন আর্থিক সমস্যাই প্রধান হয়ে উঠলো, যান্ত্রিক বিপ্লব যখন পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশের আর্থিক ব্যবস্থাতে আগাগোড়া একটা পরিবর্তন এনে দিলো, তখন থেকে রাজনৈতিক ইতিহাসে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এক নূতন যুগের আরম্ভ হয়েছে, একথা বেশ বলা চলে। এই নূতন সম্পর্কের গোড়ার কথাই হলো অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ। অর্থনৈতিক ইতিবৃত্তে প্রগতিশীল দেশগুলোর একটা বিশেষ স্তরে এই সাম্রাজ্যবাদ একেবারেই অপরিহার্য। শিল্প যখন কিছু কিছু গড়ে উঠেছে তখন বাজার চাই, কাঁচামাল বা কারখানার উপযোগী ঐ জাতীয় অন্যান্য সামগ্রী চাই, আর এই সবের জন্যেই চাই সাম্রাজ্য। তাই এখন থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিন প্রকারের দেশ দেখা দিল—প্রথম, যাদের সাম্রাজ্য রয়েছে, দ্বিতীয়, যাদের সাম্রাজ্য চাই, এবং তৃতীয়, যাদের নিয়ে

সাম্রাজ্য। গত দু শ বছরের ইতিহাসে এই তিন প্রকার দেশের কথাই মূর্ত হয়ে উঠেছে, তা সে রাজনীতির দিক থেকেই হোক, আর অর্থনীতির দিক থেকেই হোক। কিন্তু এই সম্পর্কের পেছনে মুখ্য কারণ হিসাবে যে আর্থিক ঘটনা-সংঘাত কাজ করছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আজও ঠিক একই ব্যাপার চলেছে। যাদের সাম্রাজ্য আছে এবং যাদের সাম্রাজ্য চাই, এই দুই দলের পারস্পরিক সংঘর্ষ, ব্যবসায়-চক্রাবর্তের মত প্রায় নিয়মিত কালব্যবধানে আবির্ভূত হয়ে কিছুদিনের জন্যে পৃথিবীব্যাপী অশান্তির সৃষ্টি করে; সংঘর্ষের অবসানে কিছুদিন শান্তির কথা শোনা যায়, কিন্তু সে শান্তি উদ্যোগপর্বেরই নামান্তর। আর এই সংঘর্ষে যে বিষ উঠে আসে, তা পরাধীন দেশগুলোকেই নীলকণ্ঠের মত ধারণ করতে হয়—দুঃখ দুর্দশা তাদেরই সব চেয়ে বেশি।

তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়ে গেছে। আর এ কথাও ঠিক যে, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে অর্থনৈতিক নববিধানই আসবে তা নয়, সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদও তার প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে বসবে। বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের এই যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এ সম্বন্ধে দু এক কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার। এই যোগাযোগের প্রথম কথাই হচ্ছে, প্রত্যেক দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্দ্রীভাব। অবশ্য, তার অর্থ এই নয় যে, কোন ক্ষেত্রেই ছোট খাটো উৎপাদনব্যবস্থা থাকবে না। কিন্তু সাধারণ ভাবে বলা চলে, যে সব যায়গায় সম্ভব সে সব যায়গায় কেন্দ্রীভাবই হয়েছে। ফলে, উৎপাদন ব্যবস্থার বেশি ভাগই গিয়ে পড়ছে একচেটিয়া উৎপাদকের হাতে, বা উৎপাদকসংঘের হাতে। বিভিন্ন দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থার কেন্দ্রীভাব বিষয়ে বহু রচনা ও গ্রন্থ একাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও খোঁজ-খবর নিয়ে আমি যে সব তথ্য আবিষ্কার করতে পেরেছি তা কিছুদিন আগে প্রকাশ করেছি (ইণ্ডিয়ান্ জারনল অব্ ইকনমিকস্, অক্টোবর, ১৯৪৫ সংখ্যা

দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অবস্থার এই কেন্দ্রীভাব বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছে। প্রত্যেক দেশের আর্থিক জীবনে উৎপাদনের কেন্দ্রীভাবজনিত একচেটিয়া অধিকার প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণে আজ দিকে দিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার আকার ধারণ করে দিনের পর দিন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সব চেয়ে বড় খুঁটিই হলো বিদেশে পুঁজি খাটানো। এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিল ইংলণ্ড। তাই এককালে ইংলণ্ড প্রায় দেশেই কম বা বেশি টাকা ছড়িয়েছে। তবে এই পুঁজি খাটাবার দুটো দিক আছে। কতকগুলো দেশ টাকা ধার নিলেও বিদেশী প্রভুত্বকে দেশে আমদানী হতে দেয় নি। এরাই আমাদের উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় দলের লোক, যারা আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের সর্বহারা জ্ঞান করতে শিখেছে; এদের সাম্রাজ্য চাই, উপনিবেশ চাই। আর যারা সেদিন বিদেশী টাকার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নিল, তারা আজও তার বোঝা বহন করে চলেছে; সাম্রাজ্যবাদী দেশের পাওনা আজও তারা সুদে আসলে মেটাতে পারেনি।

তারপরই আসছে দুনিয়ার ভাগ বাটোয়ারার কথা। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এ বিষয়ে অনেক কথাই বলা চলে। সে নিয়ে আমরা আমাদের আলোচনাকে অযথা বাড়াবো না। আর্থিক দিক থেকে এই বখরার নাম হলো অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ; আর এরই নিকৃষ্টতম রূপ হচ্ছে সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত। অর্থ-নৈতিক সাম্রাজ্যবাদ যেমন একালের সাম্রাজ্যবাদের প্রথম স্তর, সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত তেমনি এর দ্বিতীয় স্তর। অর্থনৈতিক ঘটনা সংঘাতে বর্তমান জগত এমন একটা অবস্থায় আজ এসে পৌছেছে যেখানে, যে সব রাষ্ট্র "যা হচ্ছে হতে দাও" নীতির ধুয়া ধরে চলেছিল, তারাও আজ প্রকাশ্য দিবালোকে এই অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে। এ স্তরকেও আজ আমরা ছাড়িয়ে আরও অগ্রসর হয়ে চলেছি—এ হলো আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ উবে যাবার পথে প্রথম ধাপ। প্রত্যেক দেশেই আজ কলকজার বিস্তার শুরু হয়েছে—এমন কি উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলোতেও। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত কিন্তু পৃথিবীর কয়েকটি

দেশ মাত্র আধুনিক শিল্পের বিস্তার করতে পেরেছিল, এবং এদের মধ্যেও কেউ কেউ আবার আপন আপন দেশের উন্নতি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বহির্বাণিজ্যের দিকে খুব বেশি নজর দিতে পারে নি। তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে সেরা অংশই ছিল ইংরাজের; মার্কিন, জার্মান ও জাপানী বাণিজ্য সবে কিছু কিছু আনাগোনা করতে শুরু করেছিল এ বিষয়ে। ১৯১৪ সালের মহাসমরের সুযোগ নিয়ে পৃথিবীর অনেক যায়গাতেই শিল্পব্যবস্থা মাথা চাড়া দিল। এই ভাবে আজ আমরা এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছি যাতে প্রায় প্রত্যেক দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় আধুনিক শিল্প কম বা বেশি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে। এমন কি, এদেশে আমরাও নানা বাধাবিঘ্ন সত্বেও আজ কতক কতক বিষয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে পেরেছি। অর্থাৎ, একাল পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিবৃত্ত আলোচনা করলে দেখা যায় যে ধনতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থার প্রসারে আন্তর্জাতিক লেনদেন ও শিল্প খানিকটা সাহায্য করে বটে; কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাবার পর আন্তর্জাতিক লেন-দেনের ক্ষেত্র ক্রমশই সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ হয়। যতদিন বাজার এবং চাহিদা রাজনৈতিক গণ্ডীর বাহিরেও ছড়িয়ে থাকে, ততদিন কোন একটা দেশে শিল্পের প্রসার সেই দেশের লোকের ক্রয়শক্তিকে অবহেলা করেও চলতে পারে, দেশের লোকের ক্রয়শক্তি থাক বা না থাক, পৃথিবীজোড়া বাজারে ধনিক আপন সামগ্রী চড়া লাভে বিক্রি করতে পারে; দেশে পূর্ণনিয়োগ থাকা না থাকায় তার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছু নেই। কিন্তু আজ আমরা এমন একটা জটিল পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছেছি, যেখানে বর্তমান উৎপাদনব্যবসাকে চালু রাখতে হলে শুধু বিদেশের বাজার এবং চাহিদার উপর নির্ভর করলেই চলে না; নির্ভর করতে হয় দেশের লোকের বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদার উপর, তাদের ক্রয়সামর্থ্যের উপর। এই ক্রয়সামর্থ্যের সেদিনই বৃদ্ধি সম্ভব, যেদিন দেশের লোক যথেষ্ট টাকা আয় করেছে, যেদিন তাদের পূর্ণনিয়োগ হয়েছে; তার আগে নয়। ধনতন্ত্রের গণ্ডীটাই আজ সীমাবদ্ধ; প্রত্যেকটি দেশ তাই আজ আপন আপন পূর্ণনিয়োগের প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত; এই সমস্যার সমাধান নিয়েই আজ প্রত্যেক দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারা

নিয়োজিত হয়েছে। আজকার সামগ্রী কে কেনে? নিজেদের আজ বাঁচতে হবে, এবং তার জন্যে দেশের আর্থিক ভিত্তি মজবুত করতে হবে। দেশের অধিকাংশকে বাদ দিয়ে তাই আজ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা বাঁচতে অক্ষম। এখনও যে সব দেশ আন্তর্জাতিক বাজারের স্বপ্ন দেখছে, বহির্বাণিজ্যের বিস্তারের প্রয়াস করে কথার জাল বুনছে, তাদের ভুল অচিরেই ভাঙ্গবে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—রক্তের টানই সব চেয়ে বড় টান। কিন্তু যে সব দেশ উপনিবেশের উপর একাল পর্যন্ত নির্ভর করে ছিল, সেই সব উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শিল্প গড়ে ওঠায় সে সব যায়গাতেও এদের আর খুব সুবিধা হবে না। তাই বলছি যে আমরা আজ এমন একটা অবস্থায় এসে পৌছেছি, যেখানে বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থারই কল্যাণে দেশের মধ্যে পূর্ণনিয়োগ আনবার জোরদার নীতি অবলম্বন করতে হবে। আজ প্রগতিশীল স্বাধীন দেশগুলোতে এই কারবারই চলছে। কিছুদিন আগে যে সব ছোট ছোট বাধাকেও গুরুত্ব দেওয়া হতো, আজ পূর্ণনিয়োগ আসবার জন্যে তার চাইতে অনেক বড় বড় বাধাকেও ঠেলে অস্বীকার করে প্রগতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলো এগিয়ে চলেছে। অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই যে নূতন অধ্যায়, নূতন উত্থানপতন, এতে যে সব দেশ পূর্ণনিয়োগ আনতে পারবে, নিজেদের আর্থিক ব্যবস্থাকে গুছিয়ে নিতে পারবে, তারাই হবে জয়ী, তারাই নেতৃত্ব করবে অনাগত কালের আর্থিক জগতে। আর আজ যারা অবস্থাবিপাকে পিছিয়ে রইল, পূর্ণনিয়োগ যাদের পক্ষে আজ সম্ভব হলো না, তাদের আর্থিক ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। এই জন্যেই আজ পূর্ণনিয়োগের এতখানি উপযোগিতা, প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্যে। পূর্ণনিয়োগের ফলে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাই যে শুধু বজায় থাকবে তাই নয়, সেই সঙ্গে দশের হাতে স্বচ্ছলতা আসায় দেশের শ্রীও ফিরবে। প্রত্যেক দেশ যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করতে থাকে, এবং ধনবিতরণ বৈষম্য যদি নির্দিষ্ট সীমারেখার বাহিরে না যায়, তাহলে এমন সব রাষ্ট্র বিনা রক্তপাতে বিনা পরিশ্রমে পৃথিবীর বুকে গড়ে উঠবে যারা সমাজতান্ত্রিক

ব্যবস্থার স্বপ্নকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই সফল করতে পারবে। এই নূতন ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সামগ্রী বিনিময় যে থাকবে না তা নয়; কিন্তু এই বিনিময়ের চেহারা হবে অন্যরকম। এতে বিনিময় হবে শুধু প্রয়োজনীয় সামগ্রীর—এদেশে যা উৎপন্ন করতে পারে না অন্যদেশের সেই সামগ্রীর বাড়তি অংশ এই দেশে আসবে। বিনিময়ে এদেশ অন্য দেশকে সেই সব সামগ্রী সরবরাহ করবে, যা তারা উৎপন্ন করতে পারে না। এই ভাবে বহুদেশের মধ্যে যে বিনিময় গড়ে উঠবে তা হবে সত্যিকারের আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। আজকের কৃত্রিম শ্রমবিভাগ—যেখানে এক দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে চেপে রাখার প্রয়াস করা হয় এবং যে ভাবেই হোক আপন বাড়তি সামগ্রী অন্যের স্কন্ধে চাপানো হয়—এ আর থাকবে না। প্রত্যেকটি দেশ যদি স্ব স্ব এলাকায় পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা করতে পারে এবং সে অধিকার পায়, তাহলে শুধু যে পৃথিবীর চেহারাই ফিরবে তা নয়, সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যলিপ্সা, বাজারের জন্যে কামড়াকামড়ি বন্ধ হয়ে গিয়ে পৃথিবীতে শান্তি আসবে। আজও যাঁরা রাজনৈতিক দিক থেকে এক একটা দেশকে ছিন্ন ভিন্ন বিভক্ত করে দিয়ে বা চেপে রেখে পৃথিবীতে শান্তি আনার চেষ্টা করছেন, তাঁরা পণ্ডশ্রম করছেন মাত্র।

সমস্যা ও সমাধান

পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার পর ভারতের পক্ষে যে আর্থিক নীতি সব চেয়ে কাম্য হবে, সেটি হল সম্প্রসারণশীল অর্থনীতি। গত দেড়শ' বছর ধরে আমাদের আর্থিক পরিস্থিতিতে সঙ্কোচনই হয়ে এসেছে। বিগত কয়েক বছর থেকে কিছু কিছু কাজকর্ম শুরু হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশই বিদেশী টাকায়, বিদেশীয়দের কর্তৃত্বাধীনে। তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর পরই অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা লাভ আমাদের প্রধান কাম্য হওয়া চাই। তাই বলছিলাম, স্বাধীন ভারতে আমাদের সম্প্রসারণমূলক অর্থনীতির প্রবর্তন করতে হবে, এবং তার জন্য চাই একটা সুচিন্তিত সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনা। কিন্তু এখন কথা

হচ্ছে এই যে, পরিকল্পনা যখন চাই তখন সেই পরিকল্পনাটি কেমন হবে এবং কি ভাবেই বা এর প্রবর্তন হলে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হবে? কারণ পরিকল্পনাই তো পরিকল্পনার শেষ নয়। যেখানে 'যা হচ্ছে হতে দাও' নীতিতে এবং তথাকথিত অবাধ প্রতিযোগিতায় দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন হচ্ছে না, সেখানেই আসে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা। অতএব দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণই যেখানে পরিকল্পনার লক্ষ্য, সেখানে দেশের সত্যিকারের স্বার্থের সঙ্গে তার যোগসূত্রটি থাকা চাই খুব মজবুত। অর্থাৎ কোন দেশে কি পরিকল্পনা হলে দেশের স্বার্থ এগিয়ে দেবার পক্ষে সুবিধা হবে, একথা কোন ধরা বাঁধা মাপকাঠি দিয়ে মেপে নেওয়া চলে না। তার মধ্যে যদি আবার আদর্শের দোহাই এসে পড়ে, তাহলে বিষয়টি হয়ে দাঁড়ায় যেমনি ঘোরালো তেমনি অবাস্তব। তাই আমাদের দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনার কথা মনে হলে একথাই মনে আসে যে, এই পরিকল্পনা গঠনমূলক হওয়া চাই, এবং এর লক্ষ্য হবে আর্থিক সম্প্রসারণ। অন্যান্য স্বাধীনদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে একথা বেশ বোঝা যায় যে কি স্বাভাবিক এবং কি যুদ্ধকালীন, সমস্ত পরিস্থিতিতেই তারা তাদের দেশের সর্বসাধারণের প্রয়োজন বেশ ভালভাবেই মেটায় বা মেটাবার চেষ্টা করে। আদর্শ তাদের যাই হোক, দেশের রাজনৈতিক গঠনে তাদের যতখানি পার্থক্যই থাকুক, এ বিষয়ে কিন্তু সবাই কম বেশি একই নীতির অনুসরণকারী। এ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একাল পর্যন্ত নগণ্যসংখ্যক জনসাধারণের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পেরেছে; বাকি সবাই অভুক্ত, অনশনক্লিষ্ট, প্রায় বস্ত্রহীন অবস্থায় ঘুরছে। গত দেড়শ বছরের বিদেশী শাসন-তন্ত্রে এদের একটা বিধিব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। আমাদের অর্থশাস্ত্রীরা প্রায়ই কপচে থাকেন যে, ভারতের দারিদ্র্য একটা চিরন্তন ব্যাপার। ভারতের মূলধন অকেজো,—কিছুতেই উৎপাদন ক্ষেত্রে আসতে চায় না; ভারতের জমি এক ক্রমহ্রস্বমান উৎপাদন হার বিষয়ক এক তথাকথিত শক্তির প্রভাবাধীন; ভারতে যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষ সুশিক্ষিত কারিগরের অভাব। অর্থশাস্ত্রীদের এই

সব যুক্তির পেছনে দেড়শ বছর আগেকার ইতিহাসের কতখানি সমর্থন রয়েছে সে কথা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয়; কিন্তু যে কারণেই হোক, আজকের অবস্থা যে কতকটা এই প্রকারই, সে কথা অর্থশাস্ত্রীরা বলে না দিলেও সর্ব-সাধারণের অবিদিত নেই। কিন্তু শুধু এই সব কারণই আমাদের অন্নহীন বস্ত্রহীন অবস্থার জন্য পুরোপুরি দায়ী নয়। অন্যত্র প্রকাশিত এক ইংরাজী প্রবন্ধে আমি এই বিষয়ের উপর জোর দিতে গিয়ে বলেছি যে, যে দেশ বিগত যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বিদেশের স্বার্থে কোটি কোটি টাকা, মানুষ ও সম্পদ ব্যয় করেছে, সে দেশের যদি আর্থিক উন্নতি না হয় তাহলে তার কারণ দেশের দারিদ্র্যের মধ্যে পাওয়া যাবে না। দারিদ্র্যের অজুহাতে দেশের অর্থনীতিকে অগ্রসর হতে না দেওয়া বা দেশের সম্পদ ও কলকারখানা বিদেশী মূলধন ও বিদেশী ধনতন্ত্রের হাতে সঁপে দেওয়া নিজেদের অসহায় অবস্থারই পরিচায়ক মাত্র। এই কারণেই আমি গঠনমূলক পরিকল্পনার পক্ষপাতী, যে পরিকল্পনার বলে আমাদের সম্পদের ব্যবহার হবে ষোল আনা, দেশের শিল্পবিজ্ঞানের হবে উৎকর্ষ, আর সেই সঙ্গে দেশের সর্বসাধারণের হবে শ্রীবৃদ্ধি, তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠবে, যে হাসি গত দেড়শ বছর ধরে এ দেশ থেকে লোপ পেয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সারাটা পৃথিবী এমন এক আর্থিক পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছেছে যেখানে প্রত্যেকটি দেশে স্বতন্ত্র পরিকল্পনা কায়েম করতে না পারলে যে সব অসুবিধার ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি সে-সবের অবসান ঘটবে না। প্রত্যেকটি দেশের সামনেই মোটামুটি দুটি সমস্যা রয়েছে—একটি হলো বেকার সমস্যা এবং অপরটি ব্যবসায়ক্ষেত্রে মন্দা বা সঙ্কট। আর সব চেয়ে মজার কথা হলো এই যে, যে কোন দেশে এই সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে উঠুক না কেন, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে না পারলে তার প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উপরও গিয়ে পড়বে—সে কমই হোক আর বেশীই হোক। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অধুনালুপ্ত বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ কিছু অর্থনৈতিক সাহিত্য প্রচার

করেছেন ; বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভাসমিতি ও বৈঠকেও এই সব বিষয় নিয়ে অনেক মাথা ঘামানো হয়েছে। কিন্তু একেবারে খাঁটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সব সমস্যার সমাধান তো হয়নি ; এর কোন ফলপ্রসূ সূত্রও এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে বলে মনে হয় না। কিছুদিন আগে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের হিড়িক পড়েছিল তাতেও বিফলতার একই সুর বেজেছে। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে এই বিফলতার কারণ কি ? কারণ অতি সহজ। এই সব সম্মেলনের নেতৃস্থানীয় যাঁরা, তাঁরা আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বলতে কেবল মাত্র এই কথাই বোঝেন যে, কি ভাবে তাঁদের দেশের পণ্য যেন তেন প্রকারেণ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে, এবং দেশী বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ে হারের তারতম্য করে কি ভাবে নিজের দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখা যেতে পারে, দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু এই সমাধানের মধ্যে মস্ত ছিদ্র রয়ে গেছে—অন্য একটি দেশের ঘাড় ভেঙ্গে কোন একটি দেশের বেকার সমস্যার যখন সমাধান করা হচ্ছে তখন সে সমাধান ক্ষণস্থায়ী ছাড়া কিছু নয়। কেননা এক দেশের রপ্তানীর ফলে যদি অন্য দেশের কলকারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যায়, এবং তার ফলে বেকার সমস্যা দেখা দেয় ও লোকের ক্রয়শক্তি কমে যায়, তাহলে সে দেশ কিছুতেই অন্য কোনো দেশ থেকে সামগ্রী আমদানী করতে পারবে না। এ অবস্থায় পরবর্তী দেশের তো সমূহ ক্ষতি হবেই, পূর্ববর্তী দেশও লাভবান হতে পারবে না। বিগত বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্কট থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ আর্থিক নীতি বিষয়ে যদি কিছু মাত্র শিক্ষা হয়ে থাকে, তাহলে সেই বিষয়টি হলো এই যে, তথাকথিত আন্তর্জাতিক অবাধ বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে এক দিকে যেমন বেকারত্ব এবং ব্যবসায় সঙ্কট প্রভৃতি সমস্যার সমাধান হয় না, অন্যদিকে এর ফলে যে কোন অবস্থাতেই "বাস্তব" মূলধনের সর্বোচ্চ পরিমাণ নিয়োগও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এই কারণে অর্থনীতির একাল পর্যন্ত গৃহীত মূলসূত্র—অর্থাৎ কোন দেশে বিদেশী বাণিজ্যের পরিমাণের উপর পুঁজি-নিয়োগ নির্ভর করে—এর সঙ্গে আমি

কিছুতেই একমত হতে পারছি না; বরং একথাই আমার মনে হয় যে, দেশীয় পুঁজি নিয়োগের পরিমাণই বিদেশী বাণিজ্যের পরিমাণ ও গতির নির্ধারণ। যদি সত্যি হয় তাহলে একথা স্বভাবতই পাওয়া যায় যে, অন্য দেশের পূর্ণনিয়োগ বিষয়ক নীতির পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে বরং তার যদি কোন প্রকারে সহায়তা করতে হয়, তাহলে তার সব চেয়ে কার্যকর উপায়ই হলো প্রত্যেকটি দেশের নিজের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাকে পুষ্ট সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা, তার নিজের সত্যি-কারের পুঁজিনিয়োগকে যথাসম্ভব সর্বোচ্চহারে নিয়ে যাওয়া, এবং এইভাবে পূর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা করা। আমরা এমন একটা আর্থিক পরিস্থিতে বসবাস করছি যেখানে সঙ্কোচমূলক নীতি মূঢ়তারই পরিচায়ক মাত্র। গত বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্কটের পর ঠিক এই বিষয় নিয়েই অনেকে বেশ ভুল করে ফেলেছিল। তাদের মনে এই কথাই উদয় হলো যে প্রসার-মূলক নীতিতে দেশের যে উন্নতি দেখা দেয় তার সবটা এখন কোনোক্রমে দেশে রাখা যায় না, এবং খানিকটা যখন স্বতই অন্য দেশের স্বার্থে নিয়োজিত হয় তখন "সংহরতে কুর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ" হয়ে বসে থাকলে ভাল। কিন্তু এর ফলে পেটের বিরুদ্ধে হাত পা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসহযোগে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে ছিল, এই সব দেশেরও হলো তাই। অথচ এরা যদি একথা বুঝতো যে তাদের দেশের উন্নতি যেমন তারা অন্যের পাতে খানিকটা তুলে দিচ্ছে, অন্যের পাতের খানিকটাও ঠিক একইভাবে তাদের অজ্ঞাতেই তাদের নিজেদের পাতে এসে পড়ছে, তাহলে এত অসুবিধার সৃষ্টি হতো না। অতএব সব দেশই যদি একযোগে স্ব স্ব আর্থিক ব্যবস্থাকে উন্নততর করার প্রয়াস পায় তাহলে তাতেই হবে আন্তর্জাতিক কল্যাণ। এই কারণে সব দেশেরই—এবং সেই সঙ্গে ভারতেরও—আপন আপন অবস্থানুযায়ী প্রসারমূলক নীতির অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক।

সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতির উপযোগিতা বিষয়ে উপরে কিছু বলা হলো। কিন্তু সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতি বলতে ঠিক কি বোঝায়, তা এখনও পরিষ্কার করে বলা হয় নি; আভাসমাত্র দেওয়া হয়েছে। আমরা উপরে বলেছি যে

প্রত্যেক দেশের সামনে আজ দুটি সমস্যা—প্রথম, বেকারসমস্যা, এবং দ্বিতীয়, ব্যবসায়ক্ষেত্রে মন্দা বা সঙ্কট। এই দুটি সমস্যা এমন ভাবে বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে, এদের প্রায় স্বাভাবিক বলে বর্ণনা করলেও অত্যুক্তি হবে না। অথচ বর্তমান ধনতান্ত্রিক আর্থিক সংগঠনের ভবিষ্যৎ এইসব সমস্যার সমাধানের উপরই নির্ভর করছে। তাই আজ প্রত্যেকটি দেশ এই দুটি সমস্যার সমাধান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। একালের অর্থশাস্ত্রে তিনপ্রকার বেকারের কথা বলা হয়েছে—প্রথম, সংঘর্ষজনিত বেকার, দ্বিতীয়, স্বেচ্ছাকৃত বেকার এবং তৃতীয় অনিচ্ছাকৃত বেকার। বাস্তবের দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে গেলে অবিচ্ছিন্ন পূর্ণনিয়োগের পথে যে সব অসামঞ্জস্য এবং গরমিল দেখা যায়, তারই ফলে দেখা যায় সংঘর্ষজনিত বেকরের দশা। নিম্নোক্ত প্রকারগুলি এই অবস্থার উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে ; পরিমাণ নির্ধারণে ভুল বা অসংলগ্ন চাহিদার ফলে উৎপাদন-উপকরণের পারস্পরিক পরিমাণের হারের সাময়িক ব্যতিক্রম-জনিত বেকার ; অথবা অ-দৃষ্ট পরিবর্তনে সময়ের পার্থক্য জনিত বেকার। এছাড়া একটি নিয়োগ ব্যবস্থা থেকে আর একটিতে পৌছান ব্যাপারে খানিকটা কালক্ষেপ অপরিহার্য ; এই অবস্থায় এই দুটি ব্যবস্থার ভিতর গতিশীল সমাজে কতক-গুলো উপকরণ বেকার থাকবেই। এ-ও সংঘর্ষজনিত বেকার। স্বেচ্ছাকৃত বেকার আইনের জোরেই হোক, বা সামাজিক বিধিব্যবস্থার জোরেই হোক, সংগঠনের ভিতর দিয়ে পারিশ্রমিকের হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গঠিত সংঘের মারফতেই হোক, বা পরিবর্তনের সঙ্গে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে নেবার ফলেই হোক, অথবা মানুষের নিছক একগুঁয়েমির জন্যেই হোক, এই প্রকার বেকার অবস্থার পেছনে রয়েছে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের মুল্যের সমান পারিশ্রমিক গ্রহণে তার অস্বীকৃতি বা অসামর্থ্য। উপরি উক্ত দুইপ্রকার বেকার তো আর্থিক ব্যবস্থার সমস্যা নয় ; কেন না এরা কম বেশি যে কোন আর্থিক পরিস্থিতেই অপরিহার্য। বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার পক্ষে যে সমস্যা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সে হোলো অনিচ্ছাকৃত বেকার। এইপ্রকার বেকার

সমস্যা যে শুধু মন্দার সময়েই দেখা দেয়, তা নয়; ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিশেষত্বই হলো এই যে, কতকগুলো লোক সব সময় তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেকার হয়ে থাকবে। এবিষয়ে বিলেতের জন্য কোল যে সংখ্যা সংগ্রহ করেছেন তা তাঁর 'ব্রিটিশ সামাজিক ও আর্থিক নীতির পরবর্তী দশ বৎসর' গ্রন্থে পাওয়া যাবে। বিলেতের পক্ষে একথা যেমন সত্যি, পৃথিবীর যে কোন দেশের পক্ষেও ঠিক তেমনি। ১৯৩৭ সালে যখন মন্দা কেটে গিয়ে শিল্পপ্রধান দেশগুলোতে 'তেজী' চলতে আরম্ভ করেছে, এবং যুদ্ধের আশঙ্কায় কোন কোন দেশ উৎপাদনের উপর জোর দিয়েছে তখনও কিন্তু একদল লোক বেকারই আছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, মন্দার অব্যবহিত পূর্বে এবং মন্দার সময়, যে পরিমাণ লোক গড়ে বেকার ছিল তার সঙ্গে ১৯৩৭ সালের বেকার শ্রমিকের পরিমাণের খুব বেশী পার্থক্য দেখা যায় না। কিছুদিন আগে প্রকাশিত 'আর্থিক প্রগতির অবস্থা' গ্রন্থে কলিন ক্লার্ক এবিষয়ে বিভিন্ন দেশের যে সংখ্যা সংগ্রহ করেছেন, তা উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত লোকের তুলনায় বেকারদের শতকরা পরিমাণ :—

দেশ	১৯২৫-৩৪ গড়	১৯৩৭	দেশ	১৯২৫-৩৪ গড়	১৯৩৭	দেশ	১৯২৫-৩৪ গড়	১৯৩৭
মার্কিনদেশ	১৪.৭	২১.৪	ক্যানাডা	১১.৮	১০.২	নরওয়ে	১২.৬	১০.৩
গ্রীস	১১.০	—	গ্রেটবৃটেন	১২.৬	১০.৪	অষ্ট্রেলিয়া	১২.৪	৭.০
হাঙ্গারী	১৬.৭	১০.০	নিউজিল্যাণ্ড	৮.১	৬.৩	জার্মানী	১৮.৮	১১.৯
সুইডেন	৮.৬	৬.৮	চেকোশ্লোভা	৬.৯	৯.৩	ইতালী	৪.৪	—
ফরাসী প্রায়	৪.৪	প্রায়২৪.০	অষ্ট্রিয়া	১৪.৩	১৭.৩			

আমাদের দেশ এখনও কৃষিপ্রধান। ফলে, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে কৃষকদের মধ্যে সাময়িক বেকারের ভাব দেখা দেয়। এ বিষয়ে সঠিক সংখ্যা সংগ্রহের ব্যবস্থা আমাদের দেশে এখনও হয়নি। তবে এই প্রকার বেকারসমস্যা যে হয় তার প্রধান কারণই হলো এই যে, ভারতের বহু স্থানেই জমি একফসলা; তা ছাড়া কুটির-

শিল্পের অবনতির ফলে বৎসরের বাকি সময় এরা বেকার থাকে। নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও যে সামান্য শিল্প এদেশে গড়ে উঠেছে তাতে অন্যান্য দেশের অনুপাতে না হলেও কিছুটা সংঘর্ষজনিত বেকার থাকবেই। আর, স্বেচ্ছাকৃত বেকার যে আমাদের দেশে নেই তা নয়। কিন্তু আমাদেরও সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এই অনিচ্ছাকৃত বেকারদের নিয়ে। কাজ চাই, অথচ কাজেরই অভাব। পারিশ্রমিকের টাকার হার ও জীবনযাত্রার মান এদেশে ধারণাতীত ভাবে নেমে গেছে; অথচ কাজের অভাব তো আজও ঘুচল না।

বেকারসমস্যা ছাড়াও, যে কোন আর্থিক সংগঠনের সামনে আরও একটি বড় সমস্যা রয়েছে; সেটি হলো ব্যবসায় চক্রাবর্ত ও সঙ্কট। ধনতান্ত্রিক অর্থশাস্ত্রীরা এর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য লক্ষ্য করে শিউরে ওঠেন, আর সমাজতান্ত্রিকেরা উৎফুল্ল হন। বিগত শতাব্দীতেও ছোটোখাটো চক্রাবর্ত দেখা গেছে। কিন্তু গত বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্কটের মত এত বড় সঙ্কটের সম্মুখীন বোধ হয় জগতের আর্থিক ব্যবস্থাকে কোনদিনই হতে হয়নি। তাই এযুগের অর্থশাস্ত্রীদের প্রধান আলোচ্যই হলো ব্যবসার চক্রাবর্ত—কিসে থেকে এর উদ্ভব এবং কি করেই বা এর সমাধান হতে পারে। আগেকার দিনে অর্থশাস্ত্রীদের ধারণা ছিল এই যে, মুদ্রানীতিতেই এর প্রধান কারণ পাওয়া যাবে; তাই তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, মুদ্রানীতির যথাযথ নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়েই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু বিগত মহাসঙ্কটের পর থেকে একথা বেশ স্পষ্ট হলো যে, মুদ্রানীতির ভিতর এর সব কারণ পাওয়া যাবে না; টাকার প্রভাবাতিরিক্ত অন্যান্য কারণও ব্যবসায় চক্রাবর্তের মূলে রয়েছে; যতদিন এই সব কারণের সমাধান না হবে, ততদিন ব্যবসায়-চক্রাবর্ত রোধ করার ব্যাপারে মুদ্রানিয়ন্ত্রণ নীতি ব্যর্থ হতে থাকবে। সবাই মাথা ঘামাতে লাগলেন, এই সব টাকার প্রভাবাতিরিক্ত কারণ খুঁজে বের করবার জন্যে। কেউ বললেন, এই চক্রাবর্তের কারণ হলো বেশি পরিমাণে পুঁজিনিয়োগ; কেউ বললেন, এর কারণ কম ভোগব্যবহার; কেউ বা মনস্তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন; কেউ বা আবার গণিতের

মারফতে এর কার্যকারণ নির্ধারণে মেতে উঠলেন। একালে যে মতবাদ সব চেয়ে বেশি সমর্থন লাভ করেছে সেটি হলো কেইনসের (Keynes) মতবাদ। কেইনস্ ব্যবসায়-চক্রাবর্তকে মূলধনের প্রান্তিক কর্মক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, মূলধনের প্রান্তিক কর্মক্ষমতার আকস্মিক হ্রাসের মধ্যেই এর কারণ নিহিত রয়েছে। তেজির চরম অবস্থায় লোকের ধারণা এত বেশি আশাবাদী হয়ে পড়ে যে, উৎপাদন উপকরণের বর্তমান প্রাচুর্য, খরচা, বা সুদের হারের বৃদ্ধি, এদের কোনটিই এই ধারণাকে বাগে আনতে পারে না। ভবিষ্যতের দিকে এদের খেয়াল থাকে না; ক্ষিপ্তপ্রায় অবস্থায় এরা অগ্রসর হতে থাকে। এতে সঙ্কট হয়ে ওঠে অনিবার্য। লোকে যখন অতিরিক্ত আশাবাদী হয়ে উঠেছে তখন যদি নিরাশার কোন কারণ ঘটে, তাহলে তেজির অবসান যেমন আকস্মিক হবে তেমনিই হবে প্রচণ্ড রকমের। মূলধনের প্রান্তিক কর্মক্ষমতার হ্রাস হয়ে পড়বে এবং ভবিষ্যত বিষয়ে যে একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে তাতে যে যার মতো আপন আপন পুঁজি গুটাতে শুরু করবে। কাঁচা টাকার প্রতি লোকের অনুরাগ যাবে বেড়ে। এর ফলে সুদের হার বাড়তে আরম্ভ করবে। একদিকে মূলধনের প্রান্তিক কর্মক্ষমতা কমে গেছে; অন্য দিকে সুদের হার বাড়ছে। এই ভাবে ঐ দুয়ের পার্থক্য যতই বাড়তে থাকে ততই নিয়োগও কমতে থাকে। কেউ কেউ হয়তো বলে বসবেন যে, মূলধনের প্রান্তিক কর্মক্ষমতা যখন কমে গেছে, সুদের হারও সেই সঙ্গে কমিয়ে দাও; তাহলেই তো আবার এ দুয়ের সাম্য ফিরে আসবে, এবং যে সঙ্কট দেখা দিয়েছিল তার অবসান ঘটবে। বলা যত সহজ, কাজে ততটা হয় না। ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ মানসিক সংঘটনের উপর এত বেশি নির্ভর করে যে, একবার যদি এতে আঘাত লাগে তাহলে সে যা সহজে সারে না। সঙ্কটের সময় মূলধনের প্রান্তিক কর্মক্ষমতা এত বেশী কমে যায় যে, সুদের হারের যে কোন সম্ভবপর হ্রাসেও কাজ এগোয় না। কেইনসের ভাষায়, "শুধু সুদের হার কমালেই যদি কাজ হত, তাহলে মুদ্রানিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের হাতে যে সব ক্ষমতা বা পরোক্ষ উপায়

রয়েছে তাদের প্রয়োগ করে কিছুমাত্র কালক্ষেপ না করেই তেজীর সূত্রপাত করা চলতো। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সাধারণত তা হয় না, এবং মূলধনের প্রান্তিক কর্মক্ষমতার উদ্ধারও এত সহজসাধ্য নয়। কেননা, এই কর্মক্ষমতা নির্ধারিত হচ্ছে ব্যবসায় জগতের অবাধ্য এবং নিয়ন্ত্রণাতীত মানসিক গঠন দিয়ে। সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে, স্বতন্ত্র ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায়, আস্থার পুনরুদ্ধার নিয়ন্ত্রণের বাইরে।" সংক্ষেপে একথা বলা চলে যে, ব্যবসায় চক্রাবর্তে মন্দার সূত্রপাত হয় মুলধনের প্রান্তিক কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ায়, এবং এই কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণই হলো এই যে, উপকরণের মজুত যতই বাড়তে থাকে ততই এ থেকে প্রাপ্তি হ্রাস হবার লক্ষণ দেখা যায়। লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমুল হতে থাকে যে, এই সব উপকরণ তৈরী করতে যে টাকা লাগছে সে টাকাতো উঠবেই না, বরং ভবিষ্যতে উৎপাদন বিষয়ক খরচা কমে যাবে। তাহলে বলা চলে যে, উৎপাদন উপকরণের বৃদ্ধিতে উৎপাদকদের মানসিক অনুমানের যে পরিবর্তন হচ্ছে তারই জন্যে মুলধনের প্রান্তিক কর্মক্ষমতা লোপ পাচ্ছে এবং তা থেকেই আসছে ব্যবসায়ক্ষেত্রে মন্দা। যে সব অর্থশাস্ত্রী উৎপাদক উপকরণকেই ব্যবসায়ক্ষেত্রে মন্দার কারণ বলে ধরে নিয়েছেন তাঁরা এই সমস্যা সমাধানের জন্য সুদের হারের বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু তাতে সমস্যা বাড়বে বৈ কমবে না। কেননা, একথা ঠিক যে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে পূর্ণনিয়োগ এখনও হয় নি। পূর্ণনিয়োগ থেকে আর্থিক ব্যবস্থা এখনও অনেক দুরে সরে রয়েছে। এই অবস্থায় সুদের হারের বৃদ্ধি করার অর্থই হবে যথাযথ পুঁজিনিয়োগকে পূর্ণনিয়োগের দিকে অগ্রসর হতে না দেওয়া। এতে সমস্যার সমাধান তো হবেই না; বরং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মন্দা পাকাপাকি ঘাঁটি গেড়ে বসবে। এতে কোন দিনই পূর্ণনিয়োগ সম্ভব হবে না। অতএব সুদের হার কমিয়ে রাখাই যুক্তিযুক্ত। গত পনের বছর ধরে টাকার বাজারে মুদ্রার যে পরিস্থিতি চলছে ভবিষ্যতেও একে বজায় রাখতে হবে, বিশেষ করে পূর্ণনিয়োগ যদি আমাদের লক্ষ্য হয়। সুদের হার কমিয়ে রাখলে

একদিকে যেমন মূলধনের প্রান্তিক কর্মক্ষমতার যে কোন হ্রাসে এ দু'এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারবে না, অন্যদিকে পুঁজিনিয়োগের পথে কোন বিঘ্ন না থাকায় অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা অনাবিল গতিতে পূর্ণনিয়োগের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে।

স্বাধীন ভারতের আর্থিক সংগঠনের পক্ষে উপরিউক্ত আলোচনার বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। শিল্পের অগ্রগতি এখনও বিশেষ হয় নি। এই অবস্থায় সুদের হার যদি কমিয়ে রাখা হয়, এবং সুদের হারের চাইতে মূলধনের প্রান্তিক কর্মক্ষমতা যদি অনেক বেশি থাকে, তা হলে পুঁজিনিয়োগ সম্ভবপর হবে। তার জন্য চাই এমন মুদ্রানীতি যে, সুদের হার যেন কিছুতেই বেশি না হয়ে পড়ে। এর জন্যে দরকার হলে অর্থসম্প্রসারণ নীতি বা inflation সমর্থন করা চলতে পারে। কেননা, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি মাত্রই খারাপ নয়; ইনফ্লেশনের পেছনে যদি আর্থিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণের কাজ চলতে থাকে তাহলে কোন অসুবিধাই নেই। আজ আমাদের যা অবস্থা তাতে মুদ্রাহ্রাসের নীতি আত্মঘাতী নীতির সমতুল্যই হবে। প্রগতির পথে এতে বিঘ্ন পড়বে। আমাদের উদ্দেশ্য এমন হওয়া উচিত যে, লোকের সঞ্চিত এবং গচ্ছিত পুঁজি যেন কার্যকরী ভাবে উৎপাদন ব্যবস্থায় খাটতে থাকে,—বর্তমানে যে পরিমাণে টাকা আর্থিক ব্যবস্থায় রয়েছে অন্তত সেই পরিমাণে আর্থিক ব্যবস্থার প্রসার হয়। প্রগতিশীল দেশগুলির পক্ষে অবশ্য সমস্যাটি অন্যরকম। সেসব দেশে উপকরণ শিল্পে এত বেশি পুঁজিনিয়োগ হয়ে গেছে যে, আর কিছু দিন ধরে পুঁজিনিয়োগ বাড়লেই পূর্ণ পুঁজিনিয়োগ সম্ভবপর হবে—অর্থাৎ পুঁজিনিয়োগ তার চরম সীমায় এসে পৌঁছাবে। এ অবস্থায় যদি লোকের ভোগ ব্যবহার না বাড়ে, তাহলে পুঁজিনিয়োগ টিকবে কি করে? পুঁজিনিয়োগের হয়ে পড়বে আধিক্য, আর ভোগব্যবহারের বেলায় দেখা দেবে অনাধিক্য। এতে যে অসামঞ্জস্য ঘটবে তা অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে মোটেই শুভ হবে না। তাই যাঁরা ইউরোপ বা আমেরিকায় শিক্ষা লাভ করে এই সব দেশের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আমাদের সমস্যার বিচার করতে

বলেন, তাঁরা আমাদের দেশের সমস্যাটিকে সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন না, একথা বলতেই হবে। বিলিতি দৃষ্টিভঙ্গীই যদি আমাদের গ্রহণ করতে হয়, তাহলে সে দৃষ্টিভঙ্গী হবে দেড়শ বা একশ বছর আগেকার, আজকের নয়।

(৩) নিয়োগের নির্ধারণ

উপরের আলোচনা থেকে একথা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, স্বাধীন ভারতের আর্থিক পরিস্থিতিতে যে ছুটো সমস্যা প্রধান আকার ধারণ করবে, তাদের সমাধান হতে পারে যদি দেশে পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা করা যায়। মতবাদের দিক থেকে অর্থশাস্ত্রে পূর্ণনিয়োগ নূতনও বটে, পুরাতনও বটে। সেকেলে অর্থশাস্ত্রীরা যেভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করছেন তাতে তাঁদের মতবাদে পূর্ণনিয়োগকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের মতে, অনিচ্ছাকৃতভাবে বেকার কেউ বসে নেই, এবং তা যদি কেউ থাকেও তাহলে এই সাময়িক অর্থনৈতিক গতি আর্থিক ব্যবস্থাকে আবার ঠেলে স্থিতির দিকে নিয়ে যাবে—সেই তার লক্ষ্য। এদিক থেকে মতবাদটি পুরোনো। আসলে কিন্তু এ পর্যন্ত সর্বব্যাপক পরিকল্পনা যে সব দেশে গৃহীত হয়েছে তাদের, এবং যুদ্ধরত দেশগুলোর, কথা বাদ দিলে যে সব দেশ বাকি থাকে তারা পূর্ণনিয়োগের আস্বাদই পায়নি। এই জন্যেই এত লেখালেখি, এত পরিকল্পনা, এত মাথা ঘামানো; সবার মূলেই লক্ষ্য এক— কি ভাবে পূর্ণনিয়োগ আনা যায়।

এইবারে আমরা নিয়োগের নির্ধারণ বিষয়ে ছ'চার কথা বলব। এ বিষয়ে এ যুগে যে আর্থিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে সেটি যেমন জটিল তেমনি ব্যাপক ও প্রাচুর্য সম্পন্ন। আমরা সংক্ষেপে সেই বিষয় বোঝাবার চেষ্টা করবো। অন্যান্য নির্ধারকের মধ্যে যে তিনটি একালের অর্থশাস্ত্রে নিয়োগের পরিমাণের প্রধান নির্ধারক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে, তা হলো ভোগব্যবহারের ইচ্ছা, মূলধনের প্রান্তিক কর্মক্ষমতার গতি-রেখা, ও সুদের হার। এই তিনটি নির্ধারকই প্রধান, এবং এদের দ্বারাই নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। এই

তিনটি প্রধান নির্ধারককে যদি আমরা একদলভুক্ত করি তাহলে এ ছাড়া আরও দুটি বিষয়ের উপর আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। এই দুটি হলো নিয়োগকারী ও নিযুক্ত, এদের দর কষাকষিতে নির্ধারিত পারিশ্রমিকের হার, এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতি অনুসারে নির্ধারিত টাকার পরিমাণ। এই সব শক্তি দিয়ে নিয়োগের পরিমাণ তো নির্ধারিত হবেই; কিন্তু সেই সঙ্গে এদের যথাযথ-ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চাই নবগঠিত ভারতীয় রাষ্ট্রের পুরোপুরি সমর্থন ও সুসংযত নিয়ন্ত্রণ। অবশ্য এ ছাড়াও ছোট খাটো বহু নির্ধারকই আছে, যাদের প্রভাব তুচ্ছ মনে করা চলে না। বাস্তবিক পক্ষে এদের কোন্‌টিকে আমরা মৌলিক নির্ধারকের পদে বসাবো, এবং কোন্‌টিকে গৌণস্থান দেবো তা নির্ভর করবে আমাদের অভিজ্ঞতার উপর। যাদেরই আমরা মৌলিক নির্ধারক বলে ধরি না কেন, অবশিষ্ট গুলোকে যবনিকার অন্তরালেই রাখতে হবে। নইলে এদের জটিলতায় প্রধান প্রসঙ্গ হয়তো চাপাই পড়বে।

এই যে সব নির্ধারকের কথা বলা হলো, নিয়োগক্ষেত্রে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি? প্রথমেই প্রধান তিনটি নির্ধারকের সম্বন্ধ বিষয়ে দুএক কথা বলা দরকার। ভোগব্যবহারের ইচ্ছা এবং পুঁজি খাটাবার ইচ্ছা, এ দুটি কাজ বাহ্যত পৃথক হলেও এদের উৎস মোটামুটি একই। কেন না, সমাজের আয়েরই একটা অংশ ভোগব্যবহারে লাগছে, এবং অপর অংশ পুঁজির আকারে খাটানো হচ্ছে। অর্থাৎ সমাজে ভোগব্যবহারকারীও যে, সঞ্চয়কারীও সেই। শুধু তাই নয়। সমাজের ভোগব্যবহার ও সঞ্চয় বিষয়ক সিদ্ধান্তের সঙ্গে নিয়োগের পরিমাণ বা নিয়োগ বিষয়ক চাহিদারও একটা প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়ে গেছে! একথা সর্বজনবিদিত যে, সমাজে দুই প্রকার সামগ্রী উৎপন্ন হয়—ভোগব্যবহার সামগ্রী, এবং উৎপাদন উপকরণ। মনে করা যাক, উপকরণশিল্পে নিয়োগ বাড়ানো গেল। তার ফলে, এই সব শিল্পে যারা চাকরী পেল, তাদের হাতে এসে জমলো খানিকটা ক্রয়শক্তি, এবং এর ফলে সমাজের ভোগব্যবহারের পরিমাণ বাড়লো। এর প্রতিক্রিয়া গিয়ে পড়বে ভোগব্যবহার শিল্পে। আরও

বেশি ভোগব্যবহার্য সামগ্রী তৈরী করতে হবে। এইভাবে এখানেও নিয়োগ বাড়বে। আবার এইখানে নিয়োগ বাড়াতে হলে চাই নূতন কলকব্জা প্রভৃতি। অতএব এর চরম প্রতিক্রিয়া হবে উপকরণশিল্পের উপর। উপকরণশিল্পকে আরও বাড়াতে হবে, আরও উৎপাদন-উপকরণ তৈরী করতে হবে। এইভাবে চলবে উৎপাদন ব্যবস্থার কাজ; ধাপে ধাপে উৎপাদন ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে পূর্ণনিয়োগের দিকে। রাজনৈতিক স্বাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য যখন এদেশে আসবে, উপরের কথাগুলোর উপযোগিতা তখন আরও বাড়বে। কেননা, উপকরণশিল্প এদেশে নেই বললেই চলে। যে সব ভোগব্যবহার সামগ্রীশিল্প এদেশে আছে, তাদেরও অনেক রকম ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়; নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় পূর্ণনিয়োগের কল্পনাও আমরা করতে পারি না। অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য যখন আসবে তখন আমাদের প্রধান লক্ষ্যই হবে উপকরণ শিল্প বাড়িয়ে দিয়ে নিয়োগের বৃদ্ধির দিকে পা বাড়ানো। একটা কথা এখানে বলে রাখি। কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, আমি উপকরণ শিল্পের উপর এত জোর দিচ্ছি কেন। তাঁরা বলবেন, আমাদের প্রধান এবং সর্বপ্রথম লক্ষ্যই হওয়া উচিত, জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান বাড়ানো, তাদের অর্থ নৈতিক কল্যাণের পথ পরিষ্কার করা। এই প্রকার যুক্তি যাঁরা দিয়ে থাকেন, গোড়ায় তাঁদের সঙ্গে আমার বিশেষ পার্থক্য নেই। কিন্তু যখন এদেশে উপকরণ শিল্প গড়ে ওঠে নি, তখন কেবলমাত্র ভোগব্যবহার বাড়াতে যাবার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। রুশ পরিকল্পনা থেকে যদি কিছু-মাত্র শিক্ষা আমাদের গ্রহণীয় থাকে, তাহলে সেই শিক্ষা হলো এই যে, উপকরণ-শিল্প যতদিন গড়ে না উঠছে, ভোগব্যবহার ততদিন কিছুতেই বাড়ানো যেতে পারে না, অবশ্য উপকরণশিল্পের প্রসারের সঙ্গে ভোগব্যবহার্য সামগ্রী শিল্পের যেটুকু প্রসার অপরিহার্য, তার কথা বাদ দিয়ে। বস্তুত উপকরণশিল্প যতদিন ভালভাবে গড়ে না উঠছে, যতদিন উপকরণের সরবরাহ বিষয়ে আমরা স্বাতন্ত্র্য ও প্রাচুর্য লাভ না করছি, ততদিন ভোগব্যবহার বাড়াতে যাওয়া মূঢ়তারই পরিচায়ক

হবে মাত্র! ভবিষ্যতের স্বতন্ত্র আর্থিক সংগঠন গড়ে উঠবে নবজাগ্রত জাতির আত্মবলিদানের ভিতর দিয়ে। এই অগ্নিপরীক্ষায় যে কল্যাণের পথ পরিষ্কার হবে, সেটি হবে শাশ্বত, সনাতন।

যে কোন সময়ে কোন দেশের ভোগব্যবহারের ইচ্ছার পরিমাণ মোটামুটি সুনির্দিষ্ট। সমাজের লোকের হাতে আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোগব্যবহার কিছু বাড়বে; কিন্তু ভোগব্যবহারের এই বৃদ্ধি আয়ের বৃদ্ধির অনুপাতে হয় না, বরং তার চাইতে অনেকটা কমই হয়। এ অবস্থায় যদি ভোগব্যবহার্য সামগ্রী বেশি বেশি তৈরী হতে থাকে, তাহলে সেগুলো অবিক্রীতই পড়ে থাকবে। এদিক থেকেও পুঁজি এমন সব ক্ষেত্রে খাটানো দরকার যেখানে এর যথাযথ ব্যবহার হতে পারে। অর্থাৎ এই টাকা লাগবে উৎপাদন উপকরণ প্রস্তুত করবার ক্ষেত্রে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এই যে, এই সব ক্ষেত্রেই বা পুঁজির নিয়োগ কতদূর পর্যন্ত হতে পারে? কেননা, পুঁজি যদি পূর্ণনিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত অবাধে খাটানো যায়, তাহলে অবশ্য কোন কথাই নেই। কিন্তু তা সম্ভব হয় কি করে? এখানে মোট বিষয়টি দেখতে হবে উৎপাদকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। উৎপাদক তো কেবলমাত্র পুঁজি খাটাবার জন্যই পুঁজি লাগাচ্ছে না; তার চাই লাভ—অর্থাৎ পুঁজি খাটিয়ে তার কিছু পাওয়া চাই। এই প্রাপ্তি যদি তার পক্ষে সন্তোষজনক হয়, এবং যতদিন পর্যন্ত এই প্রাপ্তি সন্তোষজনক থাকে, ততক্ষণই উৎপাদক নিয়োগের বিস্তার করতে রাজী হবে। অর্থশাস্ত্রের গণিতবহুল ভাষা বাদ দিয়ে সাধারণভাবে বলা চলে যে, বর্তমানে দাঁড়িয়ে উৎপাদক তার উৎপাদন ব্যবস্থায় তৈরী সামগ্রী বা উপকরণের এমন একটা সরবরাহ-মূল্য অনুমান করতে পারছে যা থেকে তার উৎপাদনের ব্যয় উঠবে, এবং সেই সঙ্গে ভবিষ্যত প্রাপ্তি বিষয়ে তার কল্পনাও সত্যে রূপান্তরিত হবে। এইভাবে সে ততক্ষণ অগ্রসর হয়ে চলতে থাকবে যতক্ষণ না এই সরবরাহ মূল্য, এবং উৎপাদন-ব্যয়, এদুটি পরস্পর সমান হয়ে পড়ছে। এই যে একটা স্থিতির অবস্থা এতে সুদের হারও যা, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদিকা শক্তিও ঠিক তাই। এর বেশি পুঁজি আর উৎপাদন ক্ষেত্রে

খাটানো চলে না। কেননা, তাহলে টাকার বাজারে সুদের যে হার পাওয়া যায়, উৎপাদনক্ষেত্রে টাকা খাটিয়ে সে পরিমাণ লাভ পাওয়া যাবে না। সুদের হার হয়ে পড়বে বেশি ; উৎপাদনক্ষেত্রে টাকা খাটিয়ে শতকরা প্রাপ্তি হয়ে পড়বে কম। তাই এ দুটি যে পর্যন্ত সমান না হচ্ছে, সেই পর্যন্তই নিয়োগের বিস্তার চলতে পারে।

এই কারণে স্বতন্ত্র আর্থিক ব্যবস্থায় আমাদের তিনটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। এদের একটি হলো সুদের হার ; দ্বিতীয়, পারিশ্রমিকের হার ; এবং তৃতীয়, টাকার পরিমাণ। কেননা, এদের উপর পূর্ণ নিয়োগ এবং সেই সঙ্গে সুদের হার ও পুঁজি খাটিয়ে যা প্রাপ্তি হবে তা নির্ভর করবে। বিষয়টির উপযোগিতা একটি সামান্য উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। টাকার পরিমাণ কম থাকার জন্য যদি সুদের হার বেশি হয়ে পড়ে, তাহলে পূর্ণনিয়োগে পৌছবার আগেই উৎপাদন ব্যবস্থায় নিয়োগের পরিমাণকে থামিয়ে দিতে হবে। মনে করা যাক, শতকরা দু টাকা সুদের হারে পূর্ণনিয়োগে পৌছান সম্ভবপর হচ্ছে, এবং এই পূর্ণনিয়োগ হচ্ছে দশের কোঠায়। সে যায়গায় যদি সুদের হার হয় শতকরা চার টাকা, তহলে পাঁচের কোঠায় পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গেই অথবা তারও আগে নিয়োগের পরিমাণ থমকে দাঁড়াবে, আর তাকে কিছুতেই বাড়ানো চলবে না। কেননা তাহলে উৎপাদন ক্ষেত্রে পুঁজি খাটিয়ে যে মুনাফা পাওয়া যাবে তা বাজারে সুদের হারের চাইতে হবে কম। এ অবস্থায় কেই বা ঝুঁকি ঘাড়ে করে উৎপাদন ক্ষেত্রে টাকা খাটাবে ? এই অবস্থায় উৎপাদকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পাঁচের কোঠায় নিয়োগের পরিমাণ যা হচ্ছে তা চরমতম হলেও সমাজ বা পূর্ণনিয়োগের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই পরিমাণ নিয়োগই চরম নয়। তাই বলছি, আমাদের যদি পূর্ণনিয়োগে পৌছাতে হয়, তাহলে তার জন্যে আমাদের স্বতন্ত্র আর্থিক ব্যবস্থায় সুদের হারকে সব সময়েই কমিয়ে রাখতে হবে।

বর্তমানে আমাদের যা অবস্থা, তাতে সুদ বিষয়ে এ প্রকার নীতি অবলম্বনে বিশেষ অসুবিধার কারণ আছে। কেননা, পূর্ণনিয়োগে পৌছানো আমাদের

পক্ষে যেমন প্রয়োজন, আমাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করাও ঠিক একই ভাবে প্রয়োজন। কিন্তু পূর্ণনিয়োগে পৌঁছাবার জন্য যেমন সুদের হার কম হওয়া বিধেয়, সঞ্চয় বাড়াবার জন্য ঠিক তার বিপরীত হওয়া চাই, বিশেষ করে আমাদের যখন ব্যক্তির সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশগুলো অবশ্য এ বিষয়ে অন্যরকম অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয় এবং ক্ষয়পূরক তহবিল এসব দেশে এত বেশি হয়েছে যে, এসব দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তি-বিশেষের সঞ্চয়ের একটা তোয়াক্কাই রাখে না। তাছাড়া, এসব দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা এমন একটা পরিস্থিতিতে এসে গেছে যে, সুদের হার যতই কম হোক না কেন, ব্যক্তিও সঞ্চয় না করে পারে না। আমাদের অবস্থা কিন্তু তা নয়। আমাদের দেশে ব্যক্তির সঞ্চয়ই উৎপাদন ব্যবস্থাকে এখনও চালু রাখছে। প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয় বা ক্ষয়পূরক তহবিল আমাদের দেশে এখনও সামান্যই। কিছুদিন আগে আমি এবিষয়ে কিছু সংখ্যা সংগ্রহ করেছিলাম, তাতে প্রতিষ্ঠান-গত সঞ্চয় ও গচ্ছিত তহবিলের নিম্নোক্ত প্রকার অবস্থা দেখতে পেয়েছি:—

(লক্ষ টাকায়)

শিল্প	প্রতিষ্ঠানসংখ্যা	মোট মুলধন	গচ্ছিত তহবিল	ক্ষয়পুরণ তহবিল
বস্ত্রবয়ন	৭৩	২৩২২	৮৩৬	১১৬৫
ব্যাঙ্ক	১৭	১০০৭	১০১৩	—
কয়লা	৫৩	৫৬১	২০২	৫১
পাট	৬০	২১০৬	৮৯৬	২
চা	৬২১	৪৯৫	২৩১	—
কলকজ্বা	২৬	২০৩৫	৭৬০	১৫৪৩

এ থে[illegible] সঞ্চয়ের প্রয়োজন তা যদি পেতে হয় তাহলে হয় আমাদের ব্যক্তির সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করতে হবে, নৈলে এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে ব্যক্তির সঞ্চয়কে অবহেলা করলেও টাকার ঘাটতি হবে না। ব্যক্তির সঞ্চয়ের উপর

আমাদের যদি নির্ভর করতে হয় তাহলে আমাদের সুদের হার বেশি রাখতে হবে ; নৈলে তারা সঞ্চয় করবে কেন ? এবং করলেই বা উৎপাদনক্ষেত্রে তারা টাকা খাটাবে কেন ? তাছাড়া, আমাদের উৎপাদনব্যবস্থা এমন কোন স্তরে এসে পৌঁছায়নি, যেখানে ব্যক্তি সঞ্চয় না করে পারে না। এই অবস্থায় ব্যক্তির সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করা সুদের হার বৃদ্ধি করারই নামান্তরমাত্র হবে। অথচ এই মাত্র আমরা বললাম যে, সুদের হার যদি বৃদ্ধি করা হয় তাহলে পূর্ণনিয়োগে পৌঁছিবার অনেক আগেই এমন এক অবস্থার উদ্ভব হবে যেখানে নিয়োগকে থামিয়ে রাখতে হবে। যদি পূর্ণনিয়োগে পৌঁছাবার কাল পর্যন্ত আমরা টাকার পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুসারে বাড়িয়ে সুদের হার কম রাখতে পারি এবং পারিশ্রমিকের আর্থিক হার অর্থাৎ মজুরীকে সুস্থির রেখে উৎপাদন ক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ যা সম্ভব কম রাখবার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা এই অবস্থার হাত থেকে রেহাই পেতে পারি। শ্রমিকের ভাগ্য আমি একবারে অবহেলা করতে বলছি না ; আমার বক্তব্য কেবল এইটুকু যে, পরোক্ষভাবে শ্রমিক কল্যাণের যে বিভিন্ন উপায় আছে, তাদের মারফতে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি অবশ্য কর্তব্য হবে, কিন্তু পূর্ণনিয়োগে পৌঁছাবার কাল পর্যন্ত মজুরী মোটামুটি অপরিবর্তিত রেখে উৎপাদন ব্যয় যাতে সুস্থির থাকে সেদিকটা ভুলে গেলে চলবে না। মজুরীর সঙ্গে উৎপাদন ব্যয়ের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়ে গেছে। মজুরীর অস্থিরতার দরুণ যদি উৎপাদন খরচা বেড়ে যায়, তাহলে সুদের হার কমিয়েও কোন ফল হবে না; পূর্ণনিয়োগ আলেয়ার আলোর মত ক্রমেই দূর থেকে দূরে সরে পড়তে থাকবে। তাই কিছু কালের জন্য মজুরীর হারকে সুস্থির রাখা আমাদের স্বাধীন আর্থিক ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে।

তারপরই টাকার পরিমাণের কথা। আমরা যতই বলি না কেন যে, টাকার প্রভাবাতিরিক্ত অনেকগুলি কারণ আমাদের আর্থিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে, তবু একথা সর্ববাদীসম্মত যে, টাকাই আর্থিক ব্যবস্থার কেন্দ্রস্বরূপ। তাছাড়া পূর্ণ-নিয়োগে পৌঁছাবার জন্যও আমাদের দেশে টাকার পরিমাণ বাড়াতে হবে। সময়-

কালীন তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে কেউ কেউ হয়তো অর্থপ্রসারণ নীতির উপর খড়্গা-হস্ত হয়ে আছেন। কিন্তু অর্থের সম্প্রসারণ মাত্রেই যে খারাপ নয়, এইটেই আমার বক্তব্য। যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণনিয়োগে পৌঁছানো না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত টাকার পরিমাণের সঙ্গে সম্প্রসারণমূলক অর্থনীতির একটা বিশেষ যোগ থাকেই। টাকা যে কেবল সম্প্রসারণশীল আর্থিকব্যবস্থায় উৎপাদন-ব্যয় যোগাবার জন্যই চাই, তা নয়; উৎপাদক গোষ্ঠির মতিগতির উপরও এর প্রভাব রয়েছে। মনে করা যাক, সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতি অবলম্বন করার আগে দেশে দশটি টাকা আছে, এবং দশটি সামগ্রা আছে। তারপর সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতিগৃহীত হলো, অথচ টাকার পরিমাণে কোন ব্যতিক্রম করা হলো না। মনে করা যাক, উৎপাদন ব্যবস্থার বিস্তারের ফলে এখন কুড়িটি সামগ্রী তৈরী হচ্ছে। টাকার পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকায় প্রথমোক্ত ব্যবস্থায় সামগ্রী পিছু এক টাকা মূল্য ধরা হয়; পরবর্তী ব্যবস্থায় এই মূল্য আপনা থেকেই হয়ে পড়বে আটআনা। এই অবস্থায় উৎপাদক কেন এত পরিশ্রম স্বীকার করে এত ঝুঁকি নিয়ে উদ্যম করতে বসবে? বেশি সামগ্রী উৎপাদন করার চাইতে অল্প উৎপাদনে যদি লাভ হয়, অথবা সমানও হয়, তাহলেও তো তার পক্ষে উৎপাদনব্যবস্থার বিস্তার করা ঠিক নয়। কিন্তু এই সময় যদি আর্থিক ব্যবস্থায় আরও দশ টাকা ছাড়া হয় তাহলে সামগ্রী পিছু মূল্য ঠিকই থাকবে। অথচ পাইকারী উৎপাদনে উৎপাদন-ব্যয় সামগ্রী পিছু কমে যাওয়ায় সামগ্রীমূল্য এক থাকা সত্বেও লাভের অঙ্ক মোটা হয়ে উঠবে। আর এ থেকেই আসবে উৎপাদনব্যবস্থাকে বিস্তার করে পূর্ণনিয়োগের দিকে নিয়ে যাবার পক্ষে অনুপ্রেরণা। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, টাকার পরিমাণের বৃদ্ধি মাত্রেই অমঙ্গলের সূচক নয়; টাকার পরিমাণের বৃদ্ধির সঙ্গে যখন আর্থিক ব্যবস্থা পূর্ণ-নিয়োগের দিকে এগিয়ে চলবে, তখন সে টাকা অযথা মূল্যস্ফীতির সহায়ক ত হবেই না; বরং মূল্যকে অপরিবর্তিত রেখে বা কিছুটা কমিয়ে দিয়ে সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি করার পক্ষে সে টাকা আনুকূল্যই করবে, এবং সামগ্রীর যদি পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, তাহলেই আমরা উন্নততর জীবনযাত্রার মানের কথা চিন্তা করতে পারবো।

কিন্তু এই টাকা আসবে কোথা থেকে? সুদের হার কমিয়ে ফেলায় যদি ব্যক্তি-গত সঞ্চয়ের উৎসমুখে পাথর চাপা পড়ে, তাহলে তো আর্থিক ব্যবস্থায় টাকার প্রবাহে একটা ভাঁটা পড়তে থাকবে। তাই আমাদের আর্থিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে, এবং অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুসারে টাকা ছাড়তে হবে। এ বিষয়ে অবশ্য আমাদের সংখ্যাশাস্ত্রের উন্নতির উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। কোন্ বৎসর কিভাবে কতখানি অগ্রসর হতে চাই বা অগ্রসর হতে পারবো সেই অনুসারে নূতন নূতন টাকার সৃষ্টি করতে হবে। অযথা বেশি টাকা এক যোগে ছাড়লে একটা তেজিমন্দার, একটা অহৈতুক উত্থান পতনের মারফতে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করে আর্থিক ব্যবস্থার গোড়া শিথিল করে ফেলতে পারে। তাই অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে টাকার বাজারের যথাযথ যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য স্বাধীন ভারতের নবগঠিত রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে তার সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে, তার সুসংযত পরিকল্পনাকে সামনে রেখে।

পরিকল্পনার প্রাণপদার্থ

'পরিকল্পনা' বা 'আর্থিক পরিকল্পনা' এই শব্দগুলোর ব্যবহার এত ব্যাপক হয়ে উঠেছে যে, অতি সাধারণ শিক্ষিত লোকও এই সব শব্দের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু কোন শব্দের সঙ্গে পরিচয় এক কথা, এবং সে বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক কথা। তাই বর্তমান প্রসঙ্গে পরিকল্পনার প্রাণপদার্থ নিয়ে আমরা দুএক কথাদর্থ বলব। 'পরিকল্পনা' শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে একথা আমাদের মনে আসে যে কোন একটা বিষয়কে 'যা হচ্ছে হতে দাও' নীতি অনুসারে ছেড়ে না দিয়ে কোন বিশেষ উপায় অনুসারে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে, অর্থাৎ একে একটা নির্দিষ্ট সুচিন্তিত সুসংযত উপায় অনুসারে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করা হচ্ছে। আর্থিক পরিকল্পনা তখনই দরকারি হয়ে উঠবে যখন দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে এক বিশেষ উপায়ে বিশেষ ভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হবে। যখন আর্থিক

ব্যবস্থায় অপচয়ের মাত্রা একটা সীমারেখা ছাড়িয়ে যায় অথবা যখন আর্থিক ব্যবস্থাকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ ভাবে গড়ে তোলার প্রয়াস করা হয়, তখনই আর্থিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পৃথিবীতে কয়েকটি সামগ্রীর কথা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে তাদের কোনোটারই পরিমাণ অফুরন্তও নয়, সহজলভ্যও নয়। অনেক জিনিসের আবার কিছুকাল ব্যবহারের পরই নিঃশেষ হয়ে যাবারও সম্ভাবনা রয়েছে। এই জন্যই প্রত্যেক জিনিসের ব্যয়সঙ্কোচ করবার আবশ্যকতা আছে। এদের ব্যবহার এমন ভাবে করা চাই, যাতে এরা যথাসম্ভব বেশি দিন চলতে পারে, অথবা এদের থেকে যথাসম্ভব বেশি কাজ আদায় করা যায়। এইটিই হলো আর্থিক পরিকল্পনার স্থূল কথা। এতে ভোগব্যবহার থেকে শুরু করে উৎপাদন, পুঁজিনিয়োগ, ব্যবসায়বাণিজ্য, এবং সমাজে আয় বণ্টন পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারেই কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শ অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন। পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা শুধু যে আর্থিক দিক থেকেই তা নয়, এবং শুধু জীবন যাত্রাকে সহজ স্বচ্ছল করতে হলে, সভ্যতার দিকে আর এক ধাপ অগ্র'র হতে হলেও চাই আর্থিক পরিকল্পনা।

তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, স্বাধীন ভারতে আমাদের পরিকল্পনা একটা খাড়া করতেই হবে, এবং এই পরিকল্পনার পেছনে থাকবে রাষ্ট্রের পূরোপুরি সমর্থন। এই পরিকল্পনার চরম লক্ষ্য হবে পূর্ণনিয়োগে পৌছান এবং বেকারসমস্যা ও ব্যবসায়-চক্রাবর্তের সমাধান করা। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এই যে, এই পরিকল্পনার প্রাণপদার্থ কি হবে, এবং এর মাত্রাই বা হবে কতখানি ? পরিকল্পনার মাত্রা বিষয়ে পরে কিছু আলোচনা করা যাবে। এর প্রাণপদার্থ বিষয়ে দু'এক কথা বলা দরকার। পরিকল্পনার প্রাণপদার্থ বিষয়ক প্রশ্নের সমাধান অন্যান্য দেশের চাইতে আমাদের দেশে অধিকতর দুরূহ। শুধু পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা বা বেকারসমস্যার সমাধানই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়; সেই সঙ্গে আমাদের দেখতে হবে যে, আমাদের বহুমূল্য সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার হচ্ছে না। এই মোট বিষয় নিয়ে যে পরিকল্পনা, তাকে তো আবার বিভিন্ন অঞ্চল বা প্রদেশের বিভিন্ন আর্থিক

পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে! সমষ্টিগত ভাবেও পরিকল্পনার কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু আশা করবার আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত যে সব পরিকল্পনার খসড়া তৈরী হয়েছে সেগুলো সবই পক্ষপাতদুষ্ট। এদের কোনোটিতে জোর দেওয়া হয়েছে কৃষির উপর ; এবং কোনোটিতে জোর দেওয়া হয়েছে শিল্পের উপর। কিন্তু আমাদের দেশে পক্ষে যে পরিকল্পনা সব চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় তাতে চাই এ দুয়ের সমন্বয়। কেননা, কৃষি যেমন আমাদের দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয়, শিল্পও ঠিক তেমনই। এ দুয়ের সমন্বয় করতে পারলে তবেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ফলপ্রদ হবে। যে সব দেশ শিল্পপ্রধান, সে সব দেশেও কিছুকাল যাবৎ কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। কেননা, আজ আমরা এমন একটা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করছি যেখানে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা একান্ত প্রয়োজন। পূর্ণনিয়োগ যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহলে কেবল মাত্র কৃষির উৎকর্ষেই দেশের মোট লোকসংখ্যা কাজে নিযুক্ত হতে পারবে না। কৃষিতে যারা কাজ পেলো তাদের বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত যারা থাকবে তাদের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে শিল্পে। এতে একদিকে যেমন বেকার লোকেরা কাজ পাবে এবং তাদের হাতে ক্রয়শক্তি বাড়বে, অন্য দিকে আবার জাতির সম্পদ বৃদ্ধি হওয়ায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ, প্রভৃতি যে সববিষয়ে আমাদের দেশের সম্মিলিত স্বার্থের তরফ থেকে অভাব রয়ে গেছে, সেগুলো পূরণ করবার পক্ষে যে অর্থের প্রয়োজন তারও সরবরাহ হবে। শিল্পের কথা না হয় আপাতত বাদই দিলাম, কৃষি বিষয়েও আজও আমরা স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে পারিনি। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণই হলো বিগত মন্বন্তর ও বর্তমান খাদ্যসমস্যা। এ অবস্থায় ভবিষ্যত পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে দুটি—প্রথম, কৃষিজাত সামগ্রী সরবরাহ ব্যাপারে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা এবং দ্বিতীয়, শিল্পের প্রসার ও যথাসম্ভব স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভ। এছাড়া কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক পরিমাণ নির্ধারণেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা এদুয়ের পারস্পরিক অনুপাত যদি ঠিক হয়, তাহলে একদিকে শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যেমন দেশের মধ্যে থেকেই সরবরাহ হতে পারবে, অন্যদিকে

ব্যবসায় ক্ষেত্রে চক্রাবর্ত এবং সঙ্কটও বিশেষ উগ্র আকার ধারণ করতে পারবে না।

তাই বলছি, বর্তমান পরাধীন ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তে স্বাধীন ভারত যখন তার ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রাপ্ত হবে, তখন আর্থিক নীতির আমূল একটা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। একথা আমাদের সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে, পরিকল্পনার চেহারা নির্ভর করবে এর মাত্রার উপর। যদি রাষ্ট্রব্যবস্থা 'যা হচ্ছে হতে দাও' নীতির অনুসরণ করে তাহলে পরিকল্পনার চেহারা হবে একপ্রকার, আর সেই যায়গায় রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি অধিক পরিমাণে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে এর চেহারা হবে ভিন্ন প্রকার। অর্থাৎ যাকে আমরা পরিকল্পনার মাত্রা বলতে পারি, সেইটিই হলো আসল। এই পরিকল্পনার মাত্রাও আবার সব দেশে এক নয়—দেশ স্বাধীন কি পরাধীন, এইটিই হয় পরিকল্পনার মাত্রার মৌলিক নির্ধারক। যাদের উপর বিদেশী শক্তির প্রভুত্ব বোঝার মত চেপে বসে আছে তাদের সব বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়, এবং উপরন্তু সবার সুযোগ সুবিধা করে দিয়ে বঞ্চিত অবস্থাতেও নিজেকে কৃতার্থ মনে করতে হয়। পরাধীনতার দুর্বহ অভিশাপে আমাদের অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু হয়ে উঠেছে। পদে পদে বিদেশীর স্বার্থকে এত বাঁচিয়ে চলতে হয় যে, তার ফলে নিজের নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে পড়ে। তবুও নিস্তার নেই। আইনগত বাধা ছাড়াও পরাধীন দেশের আরও নানা রকমের বাধ্যবাধকতা থাকেই। কিছুতেই সাম্রাজ্যবাদী দেশের দেনাপাওনা শেষ হতে চায় না। তাছাড়া এদেশে কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্য বিষয়ক কোন প্রচেষ্টা করতে গিয়ে যদি সাম্রাজ্যবাদী দেশের স্বার্থহানি হয় তাহলে নিস্তার নাই। এই সব বাধা বিঘ্নের যেদিন অবসান ঘটবে, সেদিনই আমরা এমন একটা পরিকল্পনা খাড়া করতে পারবো, যেখানে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য সবাই যথাযোগি মূল্য পাবে। এ বিষয়ে পৃথিবীর অনেক দেশের চাইতে আমাদের সুবিধা অনেক বেশি। ইংলণ্ডের কথাই ধরা যাক। গত দেড়শ বছরে ইংলণ্ডে লোকসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে,

১৭৯৩ সালে যে দেশ কৃষিজাত সামগ্রী বিষয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিল আজ সে দেশ শত চেষ্টাতেও সেই স্বয়ং-সম্পূর্ণতা ফিরে পেতে পারছে না। গত দেড়শ বছর ধরে ইংলণ্ড কেবল শিল্প ও বাণিজ্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে। কিন্তু প্রথম মহাসমরের পর থেকে এদেশও কৃষি বিষয়ে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে। আমাদের দেশ এবিষয়ে ভাগ্যবান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তৎকালীন লোকসংখ্যার অনুপাতে আমরা যেমন স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিলাম, আজ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা যে একেবারে অসম্ভব নয়, একথা সর্ববাদীসম্মত। অবশ্য, পরাধীনতার অভিশাপ থেকে এদেশ যতদিন একেবারে মুক্ত হতে না পারবে, ততদিন বর্তমান লোকসংখ্যাই বোঝার মতন হয়ে থাকবে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে অর্থ নৈতিক ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণ যখন আমাদেরই করায়ত্ত হবে, তখন শুধু এর চাইতে বেশি পরিমাণ লোকের ভরণ-পোষণ দেশের সম্পদেই সম্ভব হবে, শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠবে। আজ পাশ্চাত্য দেশগুলোর সামনেও ঠিক এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই সব দেশের সামনে আজ যেমন এই সমস্যাই প্রধান আকার ধারণ করেছে যে কি করে ক্ষয়িষ্ণু জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, আমাদেরও ঠিক সেই অবস্থাই হবে। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে কেবল-মাত্র কৃষির উপর নির্ভর করায় আমাদের অর্থ নৈতিক জীবনে একটা অনিশ্চয়তা সব সময়ই চেপে রয়েছে। তাছাড়া, কৃষি প্রাকৃতিক বিধানের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় আর্থিক জীবনের অনিশ্চয়তা বেড়ে গেছে অনেকখানি। এদেশে শিল্প সামান্য কিছু গড়ে উঠেছে বটে ; কিন্তু এর মোটা একটা অংশ আজও বিদেশীয়দের হাতে। তাছাড়া, শিল্পের বর্তমান বিস্তারে দেশের লোকসংখ্যার সামান্য একটা অংশই কাজ পেয়েছে। স্বাধীন ভারতে দিকে দিকে যখন আমাদের শিল্প গড়ে উঠবে, বাণিজ্যের হবে বিস্তার, সেদিন আজকের এই দৈন্য, এই অনিশ্চয়তা আর থাকবে না। সেদিন কৃষি যেমন সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে, শিল্পবাণিজ্যও ঠিক তেমনি। আজ যে পরিমাণ লোক কৃষিক্ষেত্রে ভীড় জমিয়েছে, তাদের পুনর্বিতরণ

হবে—তারা কাজ পাবে শিল্পে, বাণিজ্যে, সামরিক কাজে এবং এই প্রকার আরও শত শত নূতন নূতন ক্ষেত্রে। তাই স্বাধীন ভারতের পূর্ণনিয়োগ বিষয়ক পরিকল্পনার লক্ষ্যই হবে, কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য এই তিনটিকে যথাযথ স্থান দিয়ে আর্থিক ব্যবস্থাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা, যাতে এদের কোন একটির উপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে। এতে যে শুধু বেকারসমস্যারই সমাধান হবে তা নয়; সেই সঙ্গে সর্বাঙ্গীন আর্থিক উন্নতি হবার ফলে ব্যবসায় চক্রাবর্তের অনেকখানি গুরুত্ব কমে আসবে। যখনি কোন দেশ শিল্প অথবা কৃষি এ দুয়ের একটিকে তার প্রধান উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে, তখনি ব্যবসায়-চক্রাবর্ত গুরুতর আকার ধারণ করে। কারণ ব্যবসায়ক্ষেত্রে তেজি বা মন্দা সমস্ত রকম কাজকর্মের বেলায় এক সঙ্গে এক প্রকার গুরুত্ব নিয়ে দেখা দেয় না। এ অবস্থায় দেশে যদি জীবিকা উপার্জনের দশ রকমের উপায় থাকে, তাহলে তেজি বা মন্দায় দুএকটি ক্ষেত্রে প্রভাবিত হলেও বাকিগুলোর তা হয় না, বা তাদের উপর তেজি বা মন্দার প্রভাব অনেক কম হয়। কিন্তু দেশের লোক সবাই যদি একই উপজীবিকা নিয়ে থাকে অথবা একই উপজীবিকার উপর প্রধানত নির্ভর করে এবং তাতে যদি তেজি বা মন্দার আবির্ভাব হয়, তাহলে সবাই একই সঙ্গে একই প্রকার অবস্থার সম্মুখীন হবে। পূর্ণনিয়োগ তো কেবল মাত্র শিল্পের বিস্তার করেও সম্ভব হতে পারে, কিন্তু তার গোড়া খুব মজবুত হবে না। তাই বলছি, পূর্ণনিয়োগের পিছনে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থাকে সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হবে, এর উৎকর্ষ করতে হবে সমস্ত ক্ষেত্রে—বিশেষ, আমাদের যখন সে প্রকার সুযোগসুবিধা, সম্পদ ও লোকবল রয়ে গেছে। তাই আমাদের পরিকল্পনার প্রাণপদার্থ হবে সু-সমঞ্জস অর্থনীতি।

কৃষির ভবিষ্যৎ

অতীতে আমাদের আর্থিক পরিস্থিতি যতই সহজ সচ্ছল থাকুক না কেন, বর্তমানে কৃষিই এদেশে অধিকাংশ লোকের জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায়।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় শতকরা ৭০ জন লোক এদেশে কৃষির উপর নির্ভরশীল। যৎসামান্ত শিল্প যা এদেশে গড়ে উঠেছে, তা-ও প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল, যেমন—বস্ত্র-বয়ন, পাট-শিল্প, চিনির কারখানা প্রভৃতি। কৃষিকে বাদ দিয়ে যেসব শিল্প, তা এখনো গড়ে উঠে নি; যেমন—কলকজা, রাসায়নিক পদার্থ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রস্তুত করার শিল্প। কেবলমাত্র টাটা কোম্পানীর লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা এর একটা প্রধান ব্যতিক্রম, এ কথা বলা চলে। মোট কথা হলো এই যে, শিল্পের উপর নির্ভরশীল লোকেরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষির ভবিষ্যতের উপর নির্ভরশীল। এ অবস্থায় কৃষির ভবিষ্যৎ নিয়েই আমদের প্রধানত মাথা ঘামাতে হবে, তার সবগুলি সমস্যা খুঁজে বের করতে হবে, এবং তাদের সমাধানের উপায়ও উদ্ভাবন করতে হবে। যে কোন দিক থেকেই ধরা যাক না কেন, সে আর্থিক সংগঠনের দিক থেকেই হোক, অথবা জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করার দিক থেকেই হোক, কৃষি সব সময়েই একটা মোটা যায়গা জুড়ে রয়েছে। অতএব কৃষির ভবিষ্যত বিষয়ে আলোচনা করার আগে আমাদের একবার কৃষির বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখা আবশ্যক।

দেশীয় রাজ্য বাদে ভারতের মোট যা আয়তন তার মধ্যে শতকরা ৩৫ ভাগ জমিই আবাদী, এবং প্রতি বৎসর চাষ হয়। শতকরা .২ বা .৩ ভাগ জঙ্গল, শতকরা ২২'৮ ভাগ পতিত জমি হলেও চাষের উপযুক্ত এবং শতকরা ৭ ভাগ প্রতি বৎসর জমির উৎকর্ষ বাড়াবার জন্য পতিত রাখা হয়। অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৭৭ ভাগ জমিই কোন না কোন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। মাত্র বাইশ কি তেইশ ভাগ জমি অকেজো। এদিক থেকে পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের চাইতে আমাদের অবস্থা যে অনেক ভাল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, জাপান প্রভৃতি দেশে শতকরা পনের ভাগের বেশি জমি কাজে লাগানো যায় না। এদেশের আবাদকে স্থূলত দুভাগে ভাগ করা যায়—খাদ্যশস্য এবং পণ্য-শস্য। খাদ্য শস্যের মধ্যে চাল, গম, জোয়ার, বাজরা, বিভিন্ন প্রকারের ডাল উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া যব, ভুট্টা প্রভৃতি খাদ্য-শস্যও কিছু পরিমাণে উৎপন্ন হয়। খাদ্য-শস্য ছাড়াও ভারতে আরও অনেক প্রকার কৃষিজাত সামগ্রী উৎপন্ন হয়। প্রথমেই ইক্ষুর কথা বলা যাক। ইক্ষুর চাষ এদেশে নূতন নয়। কিন্তু ১৯২৯ সাল পর্যন্ত চিনির কারখানা এদেশে স্থাপিত না হওয়ায় ইক্ষুর চাষের পরিমাণ কম ছিল। গত পনের বছরের মধ্যে চিনির এত কারখানা এদেশে গজিয়েছে যে, চিনির সরবরাহ বিষয়ে আজ আমরা অন্য দেশের মুখাপেক্ষী তো নই-ই, বরং অন্য দেশকে সরবরাহ করতে পারি। এই শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিগত পনের বছরে ইক্ষুর চাষও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে নানা উপায়ে এই ইক্ষুকে সব দিক দিয়ে ভাল করবার, এর মধ্যে চিনির পরিমাণ বাড়াবার এবং বিঘা প্রতি ইক্ষুর ফসলের পরিমাণ বাড়াবার জন্যও নানারূপ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হচ্ছে। ইক্ষুর মতো তুলার চাষও এদেশে বহুদিন থেকে হয়ে আসছে। কিন্তু গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বৈজ্ঞানিক যানবাহনের বিশ্বব্যাপী প্রচলন হওয়ায় এবং এদেশে বয়ন শিল্প গড়ে ওঠায় তুলার চাষও গত দেড় শ বছরে বাড়তে শুরু করেছে। বর্তমানে প্রায় ১৬০ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ হয়ে থাকে। গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আমাদের কারখানায় তৈরী সূতা চীন দেশে রপ্তানী হতো। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে এদেশে বস্ত্রবয়ন আরম্ভ হওয়ায় এবং নানা কারণে সূতার রপ্তানী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এদেশে জাত তুলার প্রায় সবটাই এদেশের কারখানায় ব্যবহৃত হয়। গত পনের বছর তুলার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিছু কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে এবং বড় আঁশের তুলার আবাদ ও সরবরাহ বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে। পাটের চাষও এদেশে নূতন নয়। তবে বর্তমানে পাট যেমন ব্যাপক আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও রপ্তানীর জন্য উৎপন্ন হয়, আগে তা হতো না। আগে পাটের চাষ বাংলা প্রদেশের স্থান বিশেষে হতো। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে এ দেশে পাট শিল্পের উত্থান হয় এবং তার পর থেকে পাটের চাষও বাড়তে থাকে। বর্তমানে পাট, বাংলার এবং সমগ্র ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম।

ভারতে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজ উৎপন্ন নয়। কিন্তু এদেশে তৈলশিল্পের বিশেষ প্রসার না হওয়ায় এই সব তৈলবীজ প্রতিবৎসরই রপ্তানী করতে হয়। এক কালে এদেশে প্রচুর রেশম উৎপন্ন হতো। এখন কৃত্রিম রেশমে পৃথিবীজোড়া বাজার ছেয়ে ফেলেছে। তাই প্রকৃত রেশমের কদর দিন দিনই কমে আসছে। কৃষিজাত পানীয়ের মধ্যে চা ও কফি প্রভূত পরিমাণে এদেশে উৎপন্ন হয়। এছাড়া এদেশে নানাপ্রকার মশলা, অরণ্য-জাত পদার্থ এবং বহুবিধ সামগ্রী উৎপন্ন হয়। এদের তালিকা দেওয়া বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়।

ভারতীয় কৃষিজাত সামগ্রীর বিশেষত্ব এই যে, এদের অধিকাংশই রপ্তানির উদ্দেশ্যে উৎপন্ন করা হত না। এমন কি, গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কৃষিজাত সামগ্রীর ব্যবহারই দেশের বিশেষ বিশেষ অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ একথা সর্বজনবিদিত যে, ভারত প্রতি বছরই বহু সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করে আসছে, সে প্রায় আন্তর্জাতিক ক্রয় বিক্রয়ের ইতিহাসের প্রারম্ভকাল থেকে। এথেকে একথা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, ভারত কোন কালেই কৃষির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল না। এর অর্থ এই নয় যে, ভারত অন্ন-বস্ত্রের কাঙ্গাল ছিল বা এদের জন্য পর-মুখাপেক্ষী ছিল। আসল কথা হলো এই যে, ভারত এই সব বিষয়ে আপন চাহিদা মিটিয়ে এবং এদের ব্যবহার করে শিল্পজাত এমন সব সামগ্রী উৎপন্ন করত যা ইউরোপের বাজারে ভোগবিলাসের সামগ্রী হিসাবে চড়া মূল্যে বিক্রয় হতো। অর্থাৎ, ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত সামঞ্জস্যশীল ছিল। কৃষি এবং শিল্পবাণিজ্য এত উন্নত ছিল যে, লোকেরা এদের উপর স্বচ্ছন্দে নির্ভর করতে পারত। এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের পর থেকে এবং পাশ্চাত্যে শিল্পবিপ্লব হওয়ায় এদেশের শিল্প একেবারে ধ্বংস হলো। কৃষিই একমাত্র উপজীবিকা হয়ে দাঁড়ালো। তাই গত দেড়শ বছরে কৃষিক্ষেত্রে এমন সব সামগ্রী উৎপাদন করতে হচ্ছে যাদের চাহিদা এদেশে থাক বা না থাক বিদেশে রপ্তানীর কাজ চললেই

হলো। কৃষিজাত সামগ্রী নিয়ে ব্যবসায় চালানো, এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই পাট, তুলা, প্রভৃতির চাষ বর্তমানে করতে হয়। কিন্তু অন্যান্য অনেক বিষয়ে আমাদের কৃষি যে আপন বিশেষত্ব ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি তা সবারই জানা আছে। ক্রমশ আর্থিক অবনতির ফলে এবং লোকের অভাব ও চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কম বা বেশি প্রায় প্রত্যেক কৃষককেই বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সামগ্রী প্রস্তুত করতে হচ্ছে। এযে শুধু তাদের ব্যক্তিগত দিক থেকেই প্রয়োজন হয়েছে তা নয়; সমস্ত দেশের স্বার্থেও, বিশেষ যখন কৃষিজাত সামগ্রীই আমাদের প্রায় একমাত্র রপ্তানীর বস্তু, এ ব্যবস্থা নিতান্ত অপরিহার্য হয়েছে।

সে যাই হোক, আমরা যে পরিমাণে খাদ্যশস্য ও শিল্পে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত সামগ্রী পাই তার সবটাই যদি দেশে থাকে তা হলে এই সব সামগ্রীর সরবরাহে ন্যূনতা হবার কথা নেই। প্রথমে, শিল্পে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত সামগ্রীর কথাই ধরা যাক। প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত অর্থশাস্ত্র বিষয়ক পত্রিকায় আমি এ বিষয়ে যে আলোচনা করেছি তা থেকে একথা বেশ বোঝা যায় যে, কৃষিজাত সামগ্রীর সরবরাহের দিক থেকে আমাদের অবস্থা মোটের উপর সন্তোষজনক। আমাদের বর্তমান অবস্থায় এই সরবরাহ দিয়ে শুধু আভ্যন্তরীন চাহিদা মেটালেই চলবে না; সেই সঙ্গে বিদেশ থেকে শিল্পজাত সামগ্রী বা উৎপাদন উপকরণ আনতে হলেও তার বিনিময়ে আমাদের কিছু দিতে হবে। সেই দেওয়ার মধ্যেও আসবে খাদ্যশস্য এবং শিল্পে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত সামগ্রী। এ বিষয়েও ভারত গত একশ বছর থেকে সন্তোষজনক ভাবে কাজ করে আসছে। প্রতি বছর এদেশ থেকে তুলো, পাট, তৈলবীজ এবং চা প্রভৃতি পণ্য বিদেশে রপ্তানী হয়ে আসছে। এদেশে ভোগব্যবহার্য সামগ্রী উৎপাদন শিল্পের প্রসার হওয়ায় এই সব সামগ্রীর মধ্যে কোন কোনটি বহুলাংশে এদেশের শিল্পেই ব্যবহৃত হতে পারছে। ফলে, সেই সব ভোগব্যবহার্য সামগ্রীর সরবরাহ বিষয়ে এক কালে আমরা পরমুখাপেক্ষী হলেও আজ প্রায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে পেরেছি। কেবলমাত্র তৈল নিষ্কাশন ও তৈল-ব্যবহারকারী শিল্প এদেশে প্রতিষ্ঠিত না

হওয়ায় আমাদের তৈলবীজের অধিকাংশ পরিমাণই বিদেশে পাঠাতে হচ্ছে। তৈলনিষ্কাশন শিল্প এদেশে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের এ বিষয়ে পরনির্ভরশীলতাও ঘুচবে।

কৃষির ভবিষ্যৎ বিবেচনা করতে হলে দুটি বিষয়ের উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন। এদের প্রথমটি হলো এই যে, ভারতীয় কৃষি সম্প্রসারণশীল শিল্পের ক্রম বর্ধমান চাহিদা মেটাতে সক্ষম কিনা, এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো এই যে, শুধু পরিমাণের দিক থেকেই নয়, গুণাগুণের দিক থেকেও কৃষিজাত সামগ্রীর উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর কিনা। প্রথম প্রশ্নটি নিয়ে হঠাৎ বিচার করা সম্ভবপর নয়; কেননা, এটি শিল্প বিস্তারের পরিমাণ বা মাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কোন শিল্পের কতখানি প্রসার আমরা চাই সেইটিই হবে শিল্পে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত সামগ্রীর পরিমাণের নির্ধারক। শিল্পের প্রসারও আবার নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর—প্রথম, দেশের জনসাধারণের বর্তমান ক্রয়শক্তি, দ্বিতীয়, তাদের ক্রয়শক্তি ভবিষ্যতে যা হতে পারে অথবা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করা বিষয়ে সরকারী-নীতি, এবং তৃতীয়, ভারতের বাহিরে ভারতীয় শিল্পজাত সামগ্রী এবং শিল্পে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত সামগ্রীর বর্তমান বাজার ও তার ভবিষ্য তবে এদেশের শিল্পের এবং আন্তর্জাতিক বাজারের বর্তমান অবস্থায় সরবরাহের দিক থেকে আমাদের কৃষিজাত সামগ্রীর পরিমাণ মোটামুটি সন্তোষজনক। অবশ্য, গুণাগুণের দিক থেকে এই সব সামগ্রীর এখনও যথেষ্ট উৎকর্ষ করা দরকার। উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধে আমি সে বিষয়ের উপর জোর দিয়েছি। যেমন, তুলার কথাই ধরা যাক। বর্তমানে আমাদের দেশে যে তুলা উৎপন্ন হয় তার আঁশের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চিরও কম। এতে উৎকৃষ্ট ধরণের কাপড় তৈরী করা চলতে পারে না। তাই উৎকৃষ্ট কাপড়ের জন্য আমাদের লম্বা আঁশওয়ালা তুলা বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। কিছুদিন থেকে অবশ্য এদেশেও লম্বা আঁশওয়ালা তুলার চাষ হচ্ছে। তবে তার পরিমাণ এখনও এদেশের কারখানার চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। পাটের বিষয়েও একথা বলা চলে। একথা

সর্বজনবিদিত যে, পাট একমাত্র বাংলা দেশেই উৎপন্ন হয়। তাই কিছুকাল থেকে পাটের পরিবর্তে অন্য জিনিষ ব্যবহার করা যায় কিনা সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে এবং কিছু কিছু সুফলও পাওয়া গেছে। এ অবস্থায় পাটের যদি উৎকর্ষ না হয়, অথবা পাট উৎপাদনে যা খরচা তা না কমে, তাহলে পাট ভবিষ্যতে আপন একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখতে পারবে কিনা সন্দেহ। ইক্ষুর বেলায়ও একই কথা বলা যায়। এখনও এদেশে যে জাতির ইক্ষু উৎপন্ন হচ্ছে তাতে খরচ পড়ছে বেশী, অথচ বিঘা প্রতি অন্যান্য দেশের চাইতে ইক্ষু জন্মায়ও কম এবং তার রসে চিনির পরিমাণও কম। এই সব দিক থেকে কৃষির উন্নতি করবার একটা সাধারণ প্রয়োজনীয়তা যে সবাই স্বীকার করবেন, তাতে আমার সন্দেহ নাই।

খাদ্যশস্যের সরবরাহের দিক থেকেও আমাদের অবস্থা অচল নয়। এদেশে মোট প্রায় ২৭০ লক্ষ টন চালের প্রয়োজন, তার মধ্যে ২৬০ লক্ষ টন চাল দেশেই উৎপন্ন হয়। মাত্র দশ লক্ষ টন চালের জন্যে আমাদের ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও ইন্দোচীনের উপর নির্ভর করতে হয়। এদেশে প্রায় ১০০ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হয়। স্বাভাবিক সময়ে আমাদের প্রয়োজনের চাইতে উৎপন্ন গমের পরিমাণ কিছু বেশি থাকে। তাই উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৫ ভাগ বিদেশে রপ্তানী হয়। স্বাভাবিক সময়েও অষ্ট্রেলিয়া থেকে কিছু গম এদেশে আসতো সত্যি; কিন্তু এই আমদানীর পরিমাণও ছিল সামান্য এবং এর উদ্দেশ্য ছিল বাজার দরকে যথাসম্ভব সুস্থির রাখা। জোয়ার এবং বাজরাও এদেশে যা উৎপন্ন হয় তাতে এদেশের চাহিদা মেটাবার পরও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে. এবং নিকটবর্তী দেশসমূহে রপ্তানী হয়। মোটের উপর তাহলে একথা বলা যায় যে, জীবনযাত্রার বর্তমান মানে খাদ্যশস্যের সরবরাহ বিষয়ে ভারত কারও মুখাপেক্ষী নয়। এখানে একটা কথা উঠবে। ভারতের জনসাধারণের জীবনযাত্রার বর্তমান মান এত নীচু যে, এ বিষয়ে এ দেশ এখনো পেছনে পড়ে আছে। এ বিষয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁরা তাঁদের প্রতিপাদ্য বিষয়ে একমত না হলেও একথা স্বীকার

করেছেন যে, ভারতবাসীরা তাঁদের প্রয়োজনের অনুপাতে অনেক কম খাবার পায়। যাঁরা এ বিষয়ে গবেষণা করছেন তাঁরা প্রত্যেকটি লোকের খাদ্যের প্রয়োজন তার শরীরে তাপের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নির্ধারণ করেছেন। এ বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট অসুবিধাও আছে। কেননা, বিভিন্ন প্রদেশের বা বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের জীবনযাত্রার মান যেমন বিভিন্ন, তাদের তাপের প্রয়োজনীয়তাও তেমনি বিভিন্ন। এই কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের গবেষণায় নিযুক্ত বিভিন্ন গবেষকের গবেষণার ফলাফলও হয়ে পড়েছে বিভিন্ন। সে যাই হোক, যদি ২৮০০ ক্যালরি পরিমাণ তাপের সৃষ্টি করতে পারে এই পরিমাণ খাদ্য প্রত্যেকটি লোকের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে ধরা হয়, তাহলে, ডাঃ রাধাকমল মুখার্জীর মতানুসারে ৪১.১ মহাপদ্ম [বা লক্ষ কোটি=বিলিয়ন্‌] ক্যালরি পরিমাণ খাদ্যের কমতি, অর্থাৎ প্রায় ৫ কোটি লোকের খাদ্যের অভাব রয়েছে। স্বাধীন ভারতে এই ৫ কোটি লোকের খাদ্যের সংস্থান হওয়া চাইই। জীবনযাত্রার মান উন্নততর করাই হবে আমাদের লক্ষ্য। এই খাদ্যশস্য আসবে কোথা থেকে? এই খাদ্যশস্য হয় উৎপন্ন করতে হবে, নৈলে বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে। বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করা পথে নানা অসুবিধা রয়েছে। অস্বাভাবিক অবস্থার কথা বাদ দিলেও, স্বাভাবিক অবস্থাতে বিদেশ থেকে কিছু আমদানী করতে হলেই তার পরিবর্তে কিছু রপ্তানী করতে হবে, সে সামগ্রীই হোক, বা সোনাই হোক। তাছাড়া, পৃথিবীতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার যে একটা হিড়িক পড়েছে তাতে আমাদেরও পরনির্ভরশীল হয়ে থাকলে চলবে না। অতএব এই ৫ কোটি লোকের খাদ্যশস্য জোটাতে হবে এদেশেই। এদেশের জমিতে বর্তমানে একর প্রতি যেটুকু খাদ্যশস্য উৎপন্ন হচ্ছে অন্যদেশের অনুপাতে তা নগণ্য। একথা নীচের তুলনামূলক সংখ্যা থেকেই বেশ বোঝা যায় :—

(প্রতি একরে উৎপাদন পরিমাণ—পাউণ্ড হিসাবে)

দেশ	গম	চাল	ইক্ষু	তুলা
মিশর	১,৯১৮	২,৯৯৮	৭০,৩০২	৫৩৫
জাপান	১,৭১৩	৩,৪৪৪	৪৭,৫৩৪	১৯৬
মার্কিন	৮১২	২,১৮৫	৪৩,২৭০	২৬৮
চীন	৯৮৯	২,৪৩৩	....	২০৪
ভারত	৬৬০	১.২৪০	৩৪.৯৪৪	৮৯

উপরের তালিকাটিতে বেশ দেখা যায় যে, ভারতের জমিতে খুবই সামান্য খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। এ কথা অবশ্য সত্যি যে, মিশর, জাপান বা মার্কিন দেশের তুলনায় ভারতের জমি অনেক পুরোনো। তাই জমির উর্বরতা বা উৎপাদিকা শক্তি কমে গেছে। কিন্তু দুঃখ হয় যখন দেখি যে, চীন পুরোনো দেশ হলেও তার জমি ভারতের জমির চাইতে বেশি উৎপাদন করছে। জমির উর্বরতা দু'টো শক্তির উপর নির্ভর করেই—প্রথম, প্রকৃতিদত্ত শক্তি এবং দ্বিতীয়, মানুষের সৃষ্টি করার শক্তি। প্রকৃতিদত্ত শক্তি যে দিন দিন কমে আসে, একথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের যা উন্নতি হয়েছে তাতে মানুষ জমির উর্বরতা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাড়িয়ে নিতে পারে, এমন কি মরু-ভূমিতেও মরূদ্যানের সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের দেশে যে তা হয়ে উঠছে না তার এক বিশেষ কারণ আছে, এবং এখনও এই কারণের বিরুদ্ধে ঠিকমত অভিযানই করা হয় নি। এই বিষয়টি সংক্ষেপে বোঝাবার চেষ্টা করবো।

আমাদের দেশে কৃষির সমস্যা বহুমুখী। মান্ধাতার আমল থেকে যে প্রণালীতে চাষ আবাদ হয়ে আসছে আজও তার পরিবর্তন সম্ভব হলো না। বেড়া দিয়ে জমি ঘিরে দেওয়ার যে প্রথা বিলেতে বহুদিন আগে আরম্ভ হয়েছিল তা এদেশে আজও প্রায় অজানা। জমি সব এমনিই পড়ে রয়েছে। কর্ষিত ক্ষেত্রে দাঁড়ালে শুধু দেখা যায়, ছোট ছোট টুকরো জমি চাষ করা হয়েছে, আর এদের আয়তন পুরুষানুক্রমে ছোটই হয়ে আসছে। তাই সেকেলে উপায়ে

জমির উৎপাদিকা শক্তি আর বাড়বে না। কিছু কিছু জঙ্গল পরিষ্কার, ও জল-সেচনের ব্যবস্থা ছাড়া জমির দীর্ঘস্থায়ী উৎকর্ষের কোন ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হয় নি। তাই জমির উৎপাদিকা শক্তি দিন দিনই কমছে। ইউরোপের যে কোন দেশের কথাই ধরা যাক না কেন, প্রত্যেক দেশেই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় জমির মূল্য বাড়ানো হয়েছে। এরা যদি প্রকৃতিদত্ত উৎপাদিকা শক্তির উপর নির্ভর করে থাকতো তাহলে আজ এদের জমির মূল্য দাঁড়াতো কোথায়? আমাদের দেশে জমির স্থায়ী উন্নতির কোন বিশেষ ব্যবস্থা একাল পর্যন্ত হয় নি। সেই সঙ্গে কৃষির পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদিরও কোন পরিবর্তন হয় নি। শুধু যে জমিরই এই অবস্থা তা নয়, সেই সঙ্গে কৃষক ও কৃষিশ্রমিকের কর্মশক্তিও অন্যদেশের কৃষক বা কৃষিশ্রমিকের কর্মশক্তির তুলনায় অনেক কম। এই কর্মশক্তি কম হবার অনেকগুলি কারণ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের কর্মক্ষমতা যে বাড়ানো যায় না তা নয়। মিস্টার কীটিং বলেন যে, প্রতিদিন কাজ করে আমেরিকার এক জন স্ত্রী শ্রমিক গড়ে ১০০ পাউণ্ড তুলো কুড়িয়ে আনে, মিশরে সেই স্থলে ৬০ পাউণ্ড এবং ভারতে ৩০ থেকে ৪০ পাউণ্ড। কিন্তু সব চেয়ে মজার কথা হলো এই যে, ভারতে নিযুক্ত ভারতীয় শ্রমিকের কর্মশক্তির চাইতে ট্রিনিডাড, জ্যামেকা, ফিজি প্রভৃতি দেশে ভারতীয় শ্রমিকের কর্মশক্তি অনেক বেশি। তাহলে ভারতীয় শ্রমিকের কর্মশক্তির ন্যূনতা ষোল আনাই প্রকৃতিগত নয়। বোম্বাই প্রদেশের ধারওয়ার অঞ্চলে খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে, একজন স্ত্রী শ্রমিক পাঁচ আনা দৈনিক মজুরীর হারে মাত্র ৩০ পাউণ্ড তুলো কুড়াতো। সেই স্থলে কাজের হিসাবে পারিশ্রমিকের হার নির্ধারিত করে দেওয়ায় সেই স্ত্রীলোকটি প্রায় ১৫০ পাউণ্ড তুলো সংগ্রহ করেছিল। তাছাড়া শ্রমিকদের দিক থেকে আর একটি সমস্যা হলো এই যে, কৃষিতে এরা সারা বছর কাজও পায় না, এবং এথেকে তাদের আয়ও প্রয়োজনানুরূপ নয়। তাই আবাদের সময় বাদে এদের কি করে অন্য কাজে লাগানো যায় সেও এক সমস্যা। এই নিয়েও এ পর্যন্ত বিশেষ

কোন চেষ্টাই হয় নি। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে কুটিরশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। কথাটি আংশিক ভাবেই মাত্র সত্যি, কেননা, গ্রাম দেশে যে সব শিল্পী রয়েছে তাদের অনেকেই, যেমন কামার, কুমোর, জোলা প্রভৃতি, কৃষির সঙ্গে যোগ রাখে না। তাই কৃষক যেসব কুটিরশিল্পে লেগে থাকতে পারে তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়, এবং তাদের জন্য বাজারও সীমাবদ্ধ। এ অবস্থায় কৃষকদের সাময়িক বেকার সমস্যা প্রতিবৎসরই দেখা দেয়। জমির পরিমাণ ও উর্বরতার তুলনায় জমির উপর বর্ধমান লোকসংখ্যার চাপ পড়াতেও কৃষিতে ঋণ, কাজের অভাব এবং জমি বিভক্ত বা খণ্ডিত হওয়া প্রভৃতি নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। সামাজিক কতকগুলি প্রতিষ্ঠান ও বিধি-নিষেধ, যেমন জাতিভেদ, যৌথপরিবার, উত্তরাধিকার বিষয়ক আইন, একদিকে যেমন অনেকের কর্মস্পৃহা কমিয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে আবার তেমনি উপরিউক্ত সমস্যাগুলিকেও নানাদিক থেকে বাড়িয়ে তুলেছে। এতে এক দিকে যেমন জমির যথোপযুক্ত ব্যবহার হতে পারছে না, তেমনি অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির কাজকর্মও সম্ভবপর হচ্ছে না। এদেশের অধিকাংশ কৃষকেরই পুঁজির অভাব। তাই তারা জমির স্থায়ী উন্নতিতে টাকা লাগাবার কথা ভাবতেই পারে না। পর্যাপ্ত জলসেচন ও জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় এদেশের কৃষিকে অনিশ্চিত মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তাই প্রতি-বৎসরই যে একটা মোটামুটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হবে এমন কোন স্থিরতা থাকে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলও নিরক্ষরতার কারণে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় না।

কৃষির যে সব সমস্যার কথা উপরে বলা হলো তা এদেশের পক্ষে যে একেবারে নূতন তা নয়। কৃষিবিপ্লবের আগে এই সব সমস্যার অধিকাংশই পাশ্চাত্যের প্রায় দেশে দেখা গেছে। কৃষিবিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে এই সব সমস্যার সমাধান হয়েছিল, সে আপনা থেকেই হোক অথবা যুদ্ধ বিগ্রহের ফলেই হোক অথবা আভ্যন্তরীণ সংস্কারের জন্যই হোক।

তাই কৃষিবিপ্লব যখন সুরু হলো তখন ইউরোপে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা আইন-কানুনের দিক থেকে আর কোন বাধাই ছিল না। কৃষিবিপ্লবের জয়যাত্রা অবাধে চললো। যে সব কৃষক জমিদারের অধীনে অর্ধ-স্বাধীন অবস্থায় ছিল তারা মুক্তি পেল। জমির এবং খাজনা সংক্রান্ত আইন কানুনের হলো আমূল পরিবর্তন। ছোট ছোট জমির পরিবর্তে বড় বড় ক্ষেত গজিয়ে উঠলো, এবং জমি ঘিরে রাখবার ব্যবস্থা হলো। চাষ আবাদের প্রণালীতেও বিশেষ পরিবর্তন হলো। নূতন নূতন যন্ত্রপাতির ব্যবহারে এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগে কৃষির সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে কৃষির ক্ষেত্রে স্বর্ণযুগের প্রাদুর্ভাব হল। প্রাচীন ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রেখেই যদি কৃষিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহারের চেষ্টা করা হত তাহলে পাশ্চাত্যে কৃষিবিপ্লব কোন দিনই আসতো কিনা সন্দেহ। মার্কিন দেশে অবশ্য প্রাচীন ব্যবস্থা নিয়ে কোন সমস্যাই হয় নি। নূতন দেশে নূতন জাতি স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়ে একেবারে নূতন করে জীবনযাত্রা সুরু করতে পেরেছিল। আমাদের দেশের অবস্থা অন্যরকম। প্রাচীন ব্যবস্থা আজও এখানে চেপে বসে রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানবিদ্‌দের একথা অবশ্য ঠিক যে, কোন সমাজ তার ঐতিহ্য বা তার সভ্যতার ধারা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে পারে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, প্রাচীন ব্যবস্থার যে কোন অংশই ভাল। যেমন ধরা যাক, আমাদের উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনের কথা। এতে পুরুষানুক্রমে সম্পত্তি ছোট হতে থাকে। এই ভাবে আজ এক একজন কৃষকের ভাগে যেটুকু জমি পড়েছে তাতে একখানা সাধারণ দেশী লাঙ্গলও পুরোপুরি ব্যবহৃত হতে পারে না, আধুনিক প্রণালীতে তৈরী লাঙ্গলের কথা কি? সাধারণ কৃষকের কথা না হয় বাদই দিলাম। কৃষিবিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে দুচারটি এদেশে রয়েছে তাদের ক্ষেত খামারেও ট্রাকটরের ব্যবহার সম্ভবপর নয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের মার্কিন দেশ ও রুশিয়ার কথা মনে পড়ে। এই সব দেশে হাজার হাজার বিঘা জমি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ হয়; বিমান থেকে বীজ ছড়ানো এবং পর্যবেক্ষণের কাজ করা হয়। আমাদের দেশে

কৃষিবিপ্লব বা কৃষিপরিকল্পনার সাফল্য তখনই সম্ভবপর হবে, যখন এই সব প্রাচীন ব্যবস্থার প্রগতি-বিমুখ আইনকানুনের হাত থেকে আমরা অব্যাহতি পেতে পারবো। জমিব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করতে হবে, এবং সেই সঙ্গে কৃষক ও কৃষিতে নিযুক্ত অন্যান্য লোকের দৃষ্টিভঙ্গীরও করতে হবে প্রসার। তবেই আমাদের কৃষি প্রাচীন সংস্কার মুক্ত হয়ে নূতনের দিকে অগ্রসর হতে পারবে। এ কেবল স্বাধীন ভারতের জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সরকারই করতে পারবে। গত দেড়শ বছরের ব্রিটিশ শাসনে কৃষিবিষয়ক সরকারী নীতিতে বিফলতার সুরই বাজছে। তার প্রধান কারণই হলো এই যে, যে সমস্যার সমাধান আগে করা দরকার তার কথা বাদ দিয়ে হঠাৎ কৃষি-বিপ্লবের কতকাংশ প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করা হয়েছে; তার জন্য আইন প্রণয়ন হয়েছে, বিদেশ থেকে অভিজ্ঞ লোক আমদানী করা হয়েছে, অর্থেরও অপব্যয় হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু গত দেড়শ বছরের ইতিহাস যদি খতিয়ে দেখা যায় তাহলে একথা বলতেই হবে যে, কৃষির উৎকর্ষ কিছুমাত্র হয় নি। পাশ্চাত্যের কৃষি-বিপ্লব এবং তার অব্যবহিত পূর্বেকার কৃষির অবস্থার এত বড় শিক্ষা এদেশে আজও আমরা কাজে লাগাতে পারি নি, তাই তার পরবর্তী স্তরগুলো নিয়ে যতই গবেষণা করি না কেন, কাজ তাতে কিছুই হচ্ছে না।

এই ত গেল কৃষির সাধারণ সমস্যা ও তার সমাধানের কথা। এইবারে কৃষির বিশেষ বিশেষ সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে দু'চার কথা বলা আবশ্যক। প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে যে কৃষি আদৌ লাভজনক পেশা কি না। কোন কাজ লাভজনক কি না তা ঠিক করবার একমাত্র উপায় হলো সেই কাজে নীট কত আয় হচ্ছে সেইটি দেখা, এবং মোট আয় বের করতে হলে মোট খরচ কত হচ্ছে তা দেখা দরকার। এ সম্বন্ধে এদেশে সুসংবদ্ধ সংখ্যা আজও সংগৃহীত হয় নি। তার প্রধান কারণ হলো এই যে, এদেশে কৃষিজাত অনেক সামগ্রীই উৎপাদকের নিজের ভোগ ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন হয়, অথবা স্থানীয় বাজারেই এদের লেন-দেন হয়। তাই এদের পরিমাণ, খরচা এবং লাভ বিষয়ক সংখ্যা সারাটা দেশের

অঙ্ক সংগ্রহ করা সম্ভবও নয়, এবং করলে ফলাফলও অনুরূপ হবে না। মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চল থেকে যে সংখ্যা সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, যুদ্ধের আগে পরিবার-পিছু বার্ষিক আয় ছিল ১০০৲ থেকে ১২০৲ টাকা। বাংলাদেশের কোন কোন যায়গায় এই আয় ১০০৲ টাকারও কম। বিহার প্রভৃতি প্রদেশে এই আয়ের পরিমাণ আরও কম। বিশেষজ্ঞদের মতে মোটামুটি রকম জীবন যাত্রায় পরিবার-পিছু বার্ষিক ২৪০৲ টাকা (যুদ্ধের আগেকার টাকার দামের হিসাবে) একান্ত অপরিহার্য। তবে এখনকার অবস্থায় অনুমান ১২০৲ টাকা হলেই চলে। বর্তমান অবস্থাকেই যদি ভবিষ্যতের আদর্শ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়, তবুও তো কোন কোন যায়গার কথা বাদ দিয়ে অধিকাংশ জায়গাতেই প্রয়োজনের অনুপাতে কম আয় হচ্ছে। তাহলে বলা চলে যে, বর্তমান অবস্থাতেও কৃষির আয় কৃষকের গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার মান উন্নততর করাই যদি কাম্য হয় তাহলে কৃষিকে আরও সমৃদ্ধিশালী করতে হবে। একটু আগেই যে তুলনামূলক সংখ্যা উদ্ধৃত করেছি, তাতেও একথা বেশ স্পষ্ট হচ্ছে যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশের কৃষির অবস্থা অনেক বেশি শোচনীয়।

এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে কতকগুলি বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে। একথা আগেই বললাম যে, যে সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও বিধিনিষেধ আমাদের প্রগতির উৎস মুখ বন্ধ করে রেখেছে তাদের সরাতেই হবে। এ ছাড়া কৃষির নিজস্ব কতকগুলি পরিবর্তন বা সংস্কারও হবে একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রথমেই আমাদের লক্ষ্য পড়া উচিত জমির উপর। জমির উর্বরতা যেমন বাড়াতে হবে সেই সঙ্গে এ বিষয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে যে,প্রত্যেক কৃষকের জমির পরিমাণ পর্যাপ্ত, অর্থাৎ তার পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের সামগ্রী জোটাতে সক্ষম হবে। প্রথমেই জমির উর্বরতার কথা ধরা যাক। জমির নৈসর্গিক উর্বরতা যে দিন দিনই কমে আসছে, একথা অর্থ শাস্ত্রের সর্বজনস্বীকৃত সত্য। এদেশে যখন জমির উর্বরতা বাড়াবার স্থায়ী কোন ব্যবস্থা করা হয় নি, তখন জমির

উর্বরতা যে নৈসর্গিক নিয়মে কমে যাবে তাতে আর বিচিত্র কি? উর্বরতার এই হ্রাস অতি অল্প সময়ের উপরে গবেষণা করলেও ধরা পড়ে। চাল এবং গম বিষয়ে নীচের প্রামাণ্য সংখ্যা সুস্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছে:

সাল	চাল			গম	প্রতি একরে উৎপাদন	
	বাংলা	বিহার	মধ্যপ্রদেশ	বোম্বাই	বাংলা	মধ্যপ্রদেশ
১৯৩১-৩২	৯৬১	৯১২	৭১৮	৪৩০	৫২৫	৪২৯
১৯৪০-৪১	৬৫২	৫১৯	৪১৯	৩৮৫	৪৫১	৩৯৭
হ্রাসের পরিমাণ	৩০৯	৩৯৩	২৯৯	৪৫	৭৪	৩২

জমিতে সার দিয়ে তার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা ছাড়া এই সমস্যার সমাধান হতে পারে না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সস্তায় সার উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত। জলসেচন ও জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থাও এদেশে পর্যাপ্ত নয়। বাংলা দেশের কথাই ধরা যাক। নদীমাতৃক দেশ বলে বাংলার একটা খ্যাতি আছে। কিন্তু এই নদীসম্পদ থেকে প্রতি বৎসর অনিষ্টেরই কারণ ঘটছে; অথচ এ থেকে যে হাজারো রকম সুবিধা করে নিয়ে জনসাধারণের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করা যেতে পারে সে বিষয়ে রাষ্ট্রের কোন লক্ষ্যই এ পর্যন্ত পড়ে নি। অথচ যে সব অঞ্চল নদীমাতৃক নয়, যাদের সারা বছরের জলের সরবরাহের জন্য বর্ষার জলের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়, তারা সেই জল আটকাবার, তা থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করবার, এবং জল সেচনের ব্যবস্থা করেছে। আমি দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি অঞ্চলের কথা বলেছি। এছাড়া সিন্ধু এবং পাঞ্জাবে নদী-সম্পদকে উপযুক্তরূপে ব্যবহার করায় সেই সব অঞ্চলের আর্থিক জীবনে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়েছে। এমন কি, সিন্ধু নদ থেকে যে 'গঙ্গা খাল' কাটা হয়েছে তাতে উত্তর রাজপুতনার মরুভুমিতেও মরূদ্যানের সৃষ্টি হয়েছে। এই সব জলহীন অঞ্চলের যখন এই প্রকার সৌভাগ্য দেখেছি, তখন ক্ষণিকের জন্য ঈর্ষা যে হয় নি, তা নয়। তবে এই সব অঞ্চলের এইটুকু

উন্নতিই যথেষ্ট নয়। সে যাই হোক, বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলে ত এটুকুও হয় নি। অথচ মার্কিন প্রভৃতি স্বাধীন দেশগুলিতে প্রকৃতির দানকে নানাভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাজে লাগিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার গতিকে কতই না সহজ সচ্ছল করা হয়েছে! অথচ এদেশে এই সব প্রকৃতিদত্ত জিনিষ কেবলমাত্র সমস্যার, কেবলমাত্র বিড়ম্বনার মূল হয়ে রয়েছে। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে তো এবিষয়ে উদাসীন থাকলে চলবে না। যথোপযুক্ত জলসেচন ও জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতেই হবে। সেই সঙ্গে আরও দেখতে হবে যে, বর্ষায় বা বানে জমি ধুয়ে না যায়। এজন্য স্থানে স্থানে আল বেঁধে দেওয়া, বা বড় বড় গাছ লাগিয়ে খানিকটা জঙ্গল করে তোলা, বা ঐ প্রকার অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

একটু আগেই আমরা দেখলাম যে, প্রায় শতকরা ২২ ভাগ জমি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এযুগে অন্তত জমি অকেজো করে ফেলে রাখা গৌরবের বিষয় নয়। জার্মানীতে কৃষির কথা চিন্তা করলে একথা বেশ বোঝা যায়। সেদেশে জমি প্রায়ই অকেজো ছিল। তারপর বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে দেশ-জোড়া কৃষিবিপ্লব ত হলই, সেই সঙ্গে জার্মানী খাদ্যশস্যের সরবরাহবিষয়ে অনেক খানি স্বাধীনও হলো। ইংরাজ অর্থশাস্ত্রী শ্রীমতী নোওল্‌স্‌ বলেছেন যে জার্মানীতে কৃষির উন্নতি বিজ্ঞানের জয়যাত্রারই পরিচায়ক। জার্মানীতে যদি অকেজো জমি বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে আবাদী জমিতে পরিণত হয়ে থাকে, তাহলে এদেশেই বা তা না হবার কারণ কি? অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে, পুঁজির অভাব, প্রতিকূল আবহাওয়া, সস্তা এবং সুবিধাজনক যানবাহনের অভাব, জলসেচনের অব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে এই সব পতিত জমি উদ্ধারের কাজে ব্যক্তির উৎসাহ আসতে পারে না। যেখানে তা একেবারেই সম্ভবপর নয়, সেখানে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই এগিয়ে আসতে হবে কৃষির এবং দেশের খাদ্য সরবরাহের স্বার্থে। কিন্তু যতদূর সম্ভব ব্যক্তির উদ্যমকেই সুযোগ দিতে হবে। মার্কিনদেশে গত শতাব্দীর শেষার্ধে জমি বিষয়ে যে নীতি গৃহীত হয়েছিল, তা আমাদেরও অনুকরণ

করা উচিত। মার্কিন দেশে বহুদিনের জন্য বিনা খাজনায় এই সব জমি বিলিয়ে দেওয়ায় এই সব যায়গা মেষচারণ ক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হয়ে পশম শিল্পের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা করে দিয়েছে।

এইবারে পরিবার-পিছু জমির আয়তনের বিষয় আলোচনা করা যাক। প্রত্যেকটি কাজেরই একটা নির্দিষ্ট আয়তন বা পরিমাণ আছে। তার চাইতে আয়তন কম হলে যেমন ক্ষতির সম্ভাবনা, তার চাইতে বেশি হলেও তেমনি আবার পর্যবেক্ষণের অসুবিধা। কিন্তু এই নির্দিষ্ট আয়তন সমস্তক্ষেত্রে এক নয়। শিল্প বা কাজ অনুসারে এই আয়তন নির্দিষ্ট হয়। এইবার দেখা যাক, কৃষিতে জমির আয়তন কি পরিমাণ হওয়া উচিত। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন এ বিষয়ে অন্তত একটা মোটামুটি নির্দেশ দেওয়া চলে, কৃষিতে তা চলে না; কেন না, কৃষিতে নিসর্গের উপর অনেকটা নির্ভর করতে হয়। তাই জমি যদি উর্বর হয় তাহলে হয়তো তিন একর জমিতেও চলতে পারে; কিন্তু খারাপ জমি ৩০ একরও কাজের উপযোগী হবে না। তাই এক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য করতে হবে—প্রথম, কৃষকের বা তার পরিবারের জীবনযাত্রার মান কত হওয়া উচিত, এবং দ্বিতীয়, বর্তমান বাজার দরে সেই পরিমাণ প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে তার কি পরিমাণ আয়ের প্রয়োজন। দেশকাল অনুসারে যে পরিমাণ জমির ফসল থেকে ঐ পরিমাণ আয় হতে পারে, সেই পরিমাণ জমিই হলো অর্থনৈতিক দিক থেকে একান্ত প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন দেশ ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এক একজন কৃষকের জমির আয়তন বিষয়ক তুলনামূলক সংখ্যা নীচে দেওয়া হলো :—

দেশ	একর	ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ	একর	ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ	একর
মার্কিন	১৪৫	বোম্বাই ও সিন্ধু	১৬.৮	বাংলা	৩.৯৭
ডেনমার্ক	৪০	পাঞ্জাব	৮.৮	আসাম	৩.৪
জার্মানী	২১.৫	মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১২.০৩	সংযুক্ত প্রদেশ	৩.৩
ইংলণ্ড	২০.০	মাদ্রাজ	৫.৯৯	বিহার ও উড়িষ্যা	২.৯৬

পরের সংখ্যা থেকে একথা বেশ প্রমাণ হচ্ছে যে, বোম্বাই ও সিন্ধু, পাঞ্জাব,

এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে এক একজন কৃষকের আবাদী জমির পরিমাণ মোটের উপর সন্তোষজনক। অবশ্য জমির উর্বরতার কথা আমরা এই প্রসঙ্গে ধরছি না। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে এই আয়তন খুবই সামান্য। এতে যে শুধু কৃষক ও তার পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনেরই অসুবিধা হয় তা নয়; সেই সঙ্গে কৃষির খরচাও বেশি পড়ে যায়। কারণ লাঙ্গল, বলদ প্রভৃতির যথাযথ ব্যবহার ক্ষুদ্রায়তন জমিতে সম্ভবপর নয়। এই টুকুতেই অসুবিধার শেষ হয় না। এক একজন কৃষকের যে দুচার একর জমি, তাও আবার এক জায়গায় নয়। নানা জায়গায় খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে থাকায় কাজের ও পর্যবেক্ষণের অসুবিধা অনেক বৃদ্ধি পায়, এবং তাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায় বা আধুনিক যন্ত্রাদির ব্যবহার আরও অসম্ভব হয়ে ওঠে। আগে বিলাতেও এই প্রকার সমস্যা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কৃষিবিপ্লব শুরু হবার সময় পর্যন্ত এরা স্থায়ী হয় নি। এদেশে যখন এই প্রকার সমস্যা রয়েছে তখন এদের আশু সমাধান আবশ্যক। নৈলে কৃষির উন্নতি একপ্রকার অসম্ভব, এবং যন্ত্রাদির ব্যবহারও হতে পারবে না। আগেকার দিনে পারস্পরিক বিনিময়ের সাহায্যে এ সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল। এযুগে সমবায়ের মারফতেও পাঞ্জাব, মধ্য ও সংযুক্ত প্রদেশে এই সমস্যার খানিকটা সমাধান হতে পেরেছে। কিন্তু যতদিন উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনের পরিবর্তন না হচ্ছে, এবং সম্পত্তির মোটটাই খণ্ডবিখণ্ড না হয়ে একজনের হাতে না থাকছে, ততদিন এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান নেই। সমস্যাটি গুরুতর, সমাধানও হওয়া চাই তেমনি প্রচণ্ড রকমের। নির্ভীকতার সঙ্গে জাতীয় সরকারকে এ বিষয়ে অগ্রসর হতে হবে।

কৃষির উৎকর্ষ শুধু জমির আয়তন ও উর্বরতার উপরেই নির্ভর করে না; সেই সঙ্গে কৃষকের কর্মকুশলতাও অনেকখানি অংশ গ্রহণ করে। এখানে দুটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য করতে হবে—প্রথম, কৃষকের নিজস্ব দক্ষতা বাড়ানো যায় কি করে, এবং দ্বিতীয়, জমির সঙ্গে কৃষকের কি সম্পর্ক এবং এর পরিবর্তন প্রয়োজনীয় এবং সম্ভব কিনা। একথা সবারই জানা আছে যে, ভারতীয় কৃষক

দরিদ্র ও নিরক্ষর। তার ফলে এরা জমির স্থায়ী উৎকর্ষের কথা নিয়ে মাথা ঘামায় না ; এদের স্বার্থ হলো বর্তমান বৎসরের আবাদের অবস্থা নিয়ে। যে সব প্রদেশে জমিদারী প্রথা ব্যাপকভাবে বা কতক অংশে প্রবর্তিত রয়েছে, সেখানেও অধিকাংশ জমিদারই জমির খাজনার সঙ্গেই সম্পর্ক রাখে ; জমির স্থায়ী উন্নতির কথা ভাববার সময় এদের অনেকেরই বড় একটা হয়ে ওঠে না। ইউরোপ বা আমেরিকায় কৃষির স্থায়ী উন্নতির বিষয় নিয়ে সে সব দেশের জমিদার বা জমির স্বত্বাধিকারীরা কত বেশি মাথা ঘামায়! এই সব দেশে কৃষির আজ যতখানি উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে, তার পেছনে জমিদারের উদ্যম ও অর্থ অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। যে সব জায়গায় জমিদারী প্রথা নেই, কৃষকই জমির মালিক, সেখানেও কৃষকের চেষ্টায় কৃষি উৎকর্ষের পথে এগিয়ে চলেছে। এ সব দিক থেকে এদেশের কৃষি একেবারেই পেছনে পড়ে আছে। যেখানে জমির উপর আধিপত্য করবার লোকের অভাব নেই, সেখানে কেউই জমির উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চায় না। এদেশে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে আছে এক দল লোক। এরা জমির আয়েই পুষ্ট, অথচ জমির ভালমন্দের সঙ্গে এদের বিশেষ যোগ নেই। 'কার শ্রাদ্ধ কে বা করে, খোলা কেটে বামুন মরে।' এদেশে জমির উপর নির্ভরশীল চার দল লোক আছে—প্রথম, জমিদার ; দ্বিতীয়, মধ্যস্থ উপস্বত্বভোগী, এরা আবার বহু শ্রেণীতে বিভক্ত ; তৃতীয়, আসল চাষী এবং চতুর্থ, কৃষিশ্রমিক। এই চতুর্থ দলের লোকেরা দিনমজুর—এদের না আছে জমি, না আছে কোন নির্দিষ্ট কাজ। যে সব জায়গায় অস্থায়ী বন্দোবস্ত, সেখানে কৃষির উপর নির্ভরশীল দুই বা তিন দল লোক দেখা যায়। ছোট পাট্টাদারেরা নিজেরাই জমি চাষ করে ; বড় পাট্টাদারেরা জমি ইজারা দেয়। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে সব জায়গায় রয়েছে সেই সব জায়গায় জমির সংগে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন লোক দেখা যায়। এদের প্রায় সবাই জমির খাজনা বা উপরি পাওনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, জমির স্থায়ী উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে এদের অধিকাংশেরই যোগ নেই। যে সব জায়গায় রায়ত-ওয়ারী বন্দোবস্ত রয়েছে, সেখানে অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হবার

কথা ; কিন্তু সেখানেও বহু মধ্যস্থ ভাগীর আবির্ভাব হয়েছে। যেমন, মাদ্রাজে বড় পাট্টাদারেরা জমি ইজারা দেয় এবং ইজারাদারেরা আবার সেই জমি 'আধি'তে বন্দোবস্ত করে দেয়। পাঞ্জাবে আইনত কৃষকই জমির মালিক ; কিন্তু সেখানেও জমির শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগই আসল মালিক চাষ করে না, এই অংশ বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়। জমির আয় ভোগকারী এই সব বিভিন্নদলের লোকের জমির সঙ্গে নামমাত্র যোগ থাকায় জমির স্থায়ী উন্নতি যেমন হতে পারছে না, অন্যদিকে আবার এই সব লোকের খোরাক জোগাবার এবং নিজের ভরণপোষণ করবার মোট দায়িত্বই গিয়ে পড়ে আসল কৃষকের উপর। তাই সে এত দাবি দাওয়া মিটিয়ে দিয়ে জমির দীর্ঘকালীন উন্নতি বিধান করবার কথা ভাবতেওপারে না। তার সে পরিমাণ পুঁজি কোথায় ? তাই এই সব অপ্রয়োজনীয় মধ্যস্থকারীদের হাত থেকে কৃষককে মুক্তি দিতে হবে, এবং সমস্ত জমি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে যেতে হবে। এতে অবশ্য বেকার সমস্যা দেখা দেবে ; কিন্তু বর্তমান দুর্বলতাকে বাঁচিয়ে রেখেও এ সমস্যার সমাধান হবে না। সাময়িক অসুবিধা হবে সত্যি ; কিন্তু যে সব লোক বেকার হলো, আর্থিক ব্যবস্থার প্রগতি-শীল অন্যান্য অংশে তাদের স্থান দিতে হবে।

কৃষকদের আর একটি সমস্যা হলো পুঁজির অভাব। এ সমস্যা এদেশে নূতন কিছু নয়। প্রত্যেক কৃষিপ্রধান দেশেই এ সমস্যা কম বেশি দেখা গেছে। মার্কিন দেশে যতদিন কেন্দ্রীয় সরকার কৃষিঋণের ব্যবস্থা না করেছিলেন, ততদিন কৃষকদের নির্ভর করতে হতো মহাজনদের উপর, আর এই সব মহাজন সুদও আদায় করতো বেজায় রকম। তারপর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কৃষিঋণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং কয়েকটি শাখাব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর থেকে কৃষিঋণের সমস্যার বহুলাংশে সমাধান হ'ল। জার্মানী প্রভৃতি দেশে সমবায়-মূলক প্রচেষ্টার মারফতে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। এদেশে কিন্তু আজও কোন বৈজ্ঞানিক পন্থা গৃহীত হয় নি। এদেশে যে সব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছায় না, বা নিরাপত্তার অভাবে সে

সব অঞ্চলে কাজও করতে চায় না। সমবায়ের মারফতে এই সমস্যা সমাধানের যা কিছু সরকারী চেষ্টা হয়েছে তা এদেশে সফল হয় নি। সমবায়ের ভিত্তি সর্বদাই সরকারী আইন ও দপ্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকায় জনসাধারণের অন্তরে এই আন্দোলন মূল প্রসারিত করতে পারে নি। চল্লিশ বছরের প্রচেষ্টার পর সমবায়-মূলক আন্দোলন আজও সরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী। শুধু তাই নয়, যে পরিমাণ কৃষিঋণের প্রয়োজন, তার শতকরা দু'চার ভাগও সমবায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহ সরবরাহ করতে পারে না। অনেক প্রদেশে আবার সমবায়ী ব্যবস্থা অনাদায়ী ঋণের চাপেই ভেঙ্গে পড়েছে। ঋণ প্রদানের কোন ব্যবস্থাই হোল না, অথচ ইতিমধ্যে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহাজনী আইনের একটা হিড়িক পড়ল। অধিকাংশ প্রদেশেই মহাজনী আইন পাশ হয়ে গেছে। আর তার ফল হয়েছে এই যে, যে একমাত্র উৎস থেকে কিছু কিছু ঋণ পাওয়া যাচ্ছিল, তা ও আজ প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। আমি মহাজনী প্রথার গলদগুলোর সমর্থক নই। মহাজনী প্রথা একেবারে রদ করে দেওয়ার যুক্তিও না হয় স্বীকার করে নেবো। কিন্তু সেই সঙ্গে কম সুদে পর্যাপ্ত কৃষিঋণের ব্যবস্থা করার দায়িত্বও তাঁদেরই, যাঁরা বর্তমান উৎসের মুখ বন্ধ করেছেন। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, মহাজনী আইন প্রণয়ন হবার পর আজ কয়েক বৎসর অতিবাহিত হোলো। এ সময়ে যদি মহাজনের সাহায্য বিনা কাজ চলে থাকে তাহলে ভবিষ্যতেও চলবে। এঁরা কিন্তু পরিস্থিতির বিচারে ভুল করছেন। দ্বিতীয় মহাসমরের আরম্ভ কাল থেকে কৃষিতে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা চলেছে, এবং খাদ্যশস্যের মূল্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং দেশী ও বিদেশী শিল্পে জাত সামগ্রীর সরবরাহ যৎসামান্য হওয়ায়, একদিকে যেমন কৃষকের হাতে টাকা বেড়েছে, অন্যদিকে তেমনি টাকার অপব্যয় বা অপচয় হবার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। এই অস্বাভাবিক অবস্থা তো চিরকালের জন্য থাকবে না; এতে পরিবর্তন হবেই। তাই স্বাধীন ভারতে কৃষিঋণের প্রশ্নই হয়ে উঠবে কৃষির উন্নতির গোড়ার কথা। এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই

বলবেন। কেউ সমবায়ের সংস্কারের প্রশ্ন তুলবেন, কেউ বা অন্যান্য দেশের নজির দিয়ে কৃষিঋণ সংক্রান্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার অভিমত জ্ঞাপন করবেন। কিন্তু সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হবে যদি বর্তমান 'উৎসগুলির যথাসম্ভব সংস্কার করে সরকারের তরফ থেকে কাজে লাগিয়ে নেওয়া যায়। মহাজনেরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দৈনন্দিন যোগাযোগ থেকে কৃষকদের নাড়িনক্ষত্রের যতটা খবর রাখে, কোন নূতন ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান তা করতে পারে না। তাই অনুজ্ঞাপত্র দিয়ে মহাজনদের এই ব্যবস্থার সামিল করে নিতে হবে, এবং এক একটি অঞ্চলের জন্য পৃথক পৃথক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বা ব্যাঙ্ক প্রয়োজনানুসারে মহাজনদের সাহায্য করবে।

কৃষির উন্নতির কল্পে অন্যান্য যে কোন ব্যবস্থা কিছুকাল অপেক্ষা ক'রে থাকতে পারে; কিন্তু কৃষিঋণ সরবরাহের আশু ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এই মাত্র বললাম যে, কৃষিতে বিগত কয়েক বছর একটা অস্বাভাবিক উন্নতি হয়ে গেছে। এখনও এই উন্নতি কতক অংশে বজায় রয়েছে। কিন্তু ইউরোপে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হলে এবং সংস্কারের কাজ শেষ হলে পর এই অস্বাভাবিক অবস্থা তো চলবেই না, বরং বিদেশী খাদ্য শস্যের আমদানী হবার ফলে মন্দার প্রাদুর্ভাব হবার আশঙ্কা আছে। এ কয় বছরের সঞ্চয় বা সোনাদানা নিঃশেষ হতে তাই বেশি সময় লাগবে না। অতএব কৃষিঋণের যদি এখন থেকেই ব্যবস্থা করা না হয়, তাহলে কৃষককে আবার মহাজনের কাছেই হাত পাততে হবে, অথচ তাদের কাছ থেকে এখন আর আগের মত সুবিধা তারা পাবে না। মহাজনেরা আপন সঞ্চিত অর্থ দিয়ে মহাজনী আইনের কবলে পড়তে চাইবে কেন? ইতিমধ্যে অনেক জায়গায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, তারা অন্য কারবারে তাদের টাকা লাগিয়ে দিচ্ছে, বা তার সুযোগ খুঁজছে। তাই, যদি এ সমস্যার আশু সমাধান না হয়, তাহলে কৃষিঋণের অভাবে এদেশের কৃষক হঠাৎ বিপদে পড়বে।

কৃষিঋণের আশুব্যবস্থা করার আরও একটা প্রয়োজন আছে। গত কয়েক

বছরের তেজির ফলে ভারতের অনেক জায়গাতেই কৃষিঋণের পরিমাণ কমে গেছে। কেননা কৃষকেরা তাদের আয় থেকে এই ঋণ শোধ দিয়ে মস্ত একটা দায়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, এই উন্নতি স্থায়ী নয়। এতো কৃষির কোন উৎকর্ষের ফলে হয় নি। অতএব এই ফাঁকা উন্নতির শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি আবার যে তিমিরে সে তিমিরেই ফিরে যাবে। একটু আগেই আমরা দেখলাম যে, এদেশে কৃষি বর্তমান অবস্থায় লাভজনক পেশা নয়। তাই যুদ্ধের পুর্বেও যদি তাদের সাংসারিক খরচ নির্বাহের জন্য ঋণ গ্রহণ করতে হয়ে থাকে ভবিষ্যতেও তাহলে তাই হবে; এবং এই কয় বছর কৃষিঋণ যে খানিকটা কমেছে তা অতি অল্প সময়েই আগেকার আকার ধারণ করবে। অতএব কৃষিকে লাভজনক পেশা করাই হবে চরম লক্ষ্য। কিন্তু তার জন্য চাই কম সুদে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুঁজির সরবরাহ। এদিক থেকেও কৃষিঋণ সরবরাহের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হবার বিশেষ প্রয়োজনীতা রয়েছে।

দীর্ঘকালীন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কৃষিকে কি ভাবে লাভজনক পেশায় পরিণত করা যায়? এ বিষয়ে আমাদের হ্রস্বমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী উপায় অবলম্বন করতে হবে এবং হ্রস্বমেয়াদী উপায়ের মধ্যেই দীর্ঘমেয়াদী উপায়ের কাজকর্ম আরম্ভ করতে হবে। এই হ্রস্বমেয়াদী উপায় হলো কৃষিজাত সামগ্রীর মুল্য একটা নির্দিষ্ট স্তরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে স্থির করে দেওয়া। কৃষিতে যতদিন স্বাভাবিক উন্নতি না আসছে ততদিন এই কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। বর্তমানে কৃষকদের যা অবস্থা তাতে তারা স্বাভাবিক সময়ে কিছুতেই ফসল আটকে রাখতে পারে না। ফসল কাটা হবার পরই তাদের প্রায় মোট ফসলটাই বাজারে ছাড়তে হয়। এর ফলে স্বাভাবিক সময়ে কৃষিজাত সামগ্রীর মুল্য খুবই কম হয়ে পড়ে। অথচ আর কিছুদিন রেখে যদি বিক্রি করা যায় তাহলেই তার চাইতে বেশি মুল্যে এই সব সামগ্রী স্বচ্ছন্দে বিক্রি হতে পারে। বাজারে কম দামে এই সব সামগ্রী বিক্রি

হবার অর্থ এই নয় যে, আসল ব্যবহারকারীও কম দামে এই সব সামগ্রী কিনতে পায়। কারণ কৃষক ও ভোগব্যবহারকারীর মধ্যে রয়েছে মস্ত একটা ফাঁক, আর এই ফাঁক জুড়ে রয়েছে ফড়িয়া, ব্যাপারী, আড়ৎদার ও অন্যান্য মধ্যস্থ লোকের দল। এই কারণে কৃষিজাত সামগ্রীর চরম মূল্য যতই বেশি হোক না কেন, এর সামান্য একটা অংশই আসল উৎপাদকের হাতে এসে পড়ে। সামগ্রীটি যদি কৃষকের হাতে মজুত থাকে তাহলে কৃষকও বেশ দুপয়সা পায়, অথচ সামগ্রীটির বিক্রয়মূল্য মধ্যস্থকারীদের গোপন অথবা প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে অপেক্ষাকৃত কমও থাকে, এবং ফসলটিও সারা বছর ধরে পাওয়া যেতে পারে। এর জন্য চাই মজুত করবার গোলা, বা আধুনিক প্রণালীতে নির্মিত এই জাতীয় গুদাম এবং পুঁজির সরবরাহ। কৃষকদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বা সমবায়ের ফলে গোলা তৈরী হতে পারে; কিন্তু বড় গুদামের জন্য সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন মত পুঁজি সরবরাহের কাজ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে হবে। সহরে সহরে আজ আর ব্যাঙ্কের অভাব নেই; কিন্তু সহরে এই সব ব্যাঙ্কের পর্যাপ্ত পরিমাণ কাজও পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যেই কোন কোন ব্যাঙ্ক কাজ গুটাতে শুরু করেছে, বা ব্যবসায় ক্ষেত্র থেকে একেবারে সরে পড়েছে। অথচ এরা যদি গ্রামের দিকে মনোযোগ দেয় তাহলে মহাজনদের জায়গা এরা দখল করতে পারে। ব্যাঙ্কের লভ্যাংশের খানিকটা গুদাম তৈরীর কাজে লাগানো উচিত। তাই যদি করা হয়, তাহলে ব্যাঙ্কগুলো নিজস্ব গুদাম পেতে পারে, এবং এই সমস্ত গুদামে মাল মজুত রেখে টাকা ছাড়তে পারে। তাতে ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত টাকা যেমন খাটবার সুযোগ পাবে, সেই সঙ্গে কৃষকের সমস্যারও সমাধান হবে।

কোন কোন অর্থশাস্ত্রীর মতে, বাজারে যে মূল্য পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় সেই অনুপাতে ফি বছর যদি উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সামগ্রীমূল্যের হ্রাস হবে না। অথচ নির্দিষ্ট মূল্যে সামগ্রী-গুলো বছরের পর বছর বিক্রি হওয়ায় কৃষির স্থায়ী উন্নতিও হবে। এ বিষয়ে

অধ্যাপক মুরঞ্জনের 'যুদ্ধোত্তর ভারতের অর্থনীতি' পুস্তিকাখানি দ্রষ্টব্য। কিন্তু এই প্রকার নীতির দুর্বলতা রয়েছে অনেকখানি। প্রথম, দু একটা সামগ্রী ছাড়া প্রায় সমস্ত কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন আমাদের প্রয়োজনানুরূপই হয়ে থাকে। গম স্বাভাবিক সময়ে কিছু বেশি হয়, আবার চাল কিছু কম হয়। কেবল পাট বা ইক্ষুই প্রয়োজনের চাইতে বেশি উৎপন্ন হয়। এদের পরিমাণ, বা কর্ষিত জমির পরিমাণ, নিয়ন্ত্রণ মূলক ব্যবস্থা যে একেবারে নেই তা নয়। এইপ্রকার নিয়ন্ত্রণ কেবল মাত্র সেই সকল সামগ্রীর বেলায় সফল হতে পারে যাদের সরবরাহ বিষয়ে এদেশের একচেটিয়া অধিকার আছে। অথবা আমরা যদি আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিস্থিতির সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ করি তাহলে এই প্রকার নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণ কতক অংশে সফল হবে। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে উপরি উক্ত নীতির সফলতা আশা করা দুরাশা মাত্র। অনুমিত মূল্য অনুসারে হয়তো নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি চাষের নির্দেশ দেওয়া হল; কিন্তু বিদেশ থেকে কৃষিজাত সামগ্রীর আমদানীর উপর যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে বিদেশী সামগ্রীতে বাজার ভরে উঠবে। এতে আপনা থেকেই সামগ্রী মূল্যের হ্রাস হবে; সরকারী নীতির ঘটবে বিপর্যয়। আলোচনার খাতিরে না হয় ধরেই নিলাম যে বিদেশী সামগ্রী আসছে না। কিন্তু তবু ও উপরিউক্ত সরকারী নীতি বেশি দিনের জন্য ধার্য রাখার পক্ষে অসুবিধা আছে। প্রকৃতিই যেখানে প্রধান নির্ধারক, একই আয়তনের জমি থেকে কোন বছর কত ফসল পাওয়া যাবে বেশি, কোন বছর কম। অতএব অনুমিত মূল্যের অনুপাতে আবাদী জমির আয়তন নির্ধারিত হলেও ফসলের সরবরাহ পরিমাণ এভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। এর ফলে এইভাবে সামগ্রীমূল্যও নির্দিষ্ট স্তরে বেশি দিন স্থির রাখা যেমন সম্ভবপর নয়, কৃষিতে স্থায়ী উন্নতিও এভাবে আসবে না। তাছাড়া বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে শুধু কৃষিজাত কেন, সমস্ত সামগ্রীমূল্যই কমবে, অথবা সামগ্রীর উৎকর্ষ সাধিত হবে। এ অবস্থায় এদেশের কৃষিজাত সামগ্রী মূল্য যদি বাড়িয়ে রাখা হয়, তাহলে আসল সমস্যার সমাধান হবে না।

আমাদের লক্ষ্য হবে কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি; এর ফলে খরচ কমবে এবং উন্নতিও হবে স্থায়ী।

কৃষির সর্বাঙ্গীন উন্নতি এদেশের দীর্ঘকালীন আর্থিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হলেও অদূর ভবিষ্যতে কৃষিতে যাতে মন্দার আবির্ভাব না হয় সেজন্য কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্য একটা নির্দিষ্ট স্তরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেঁধে দেওয়ার প্রয়োজন হবে। তবে এই নিয়ন্ত্রণ মুল্যের অনুপাতে খাদ্যশস্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও হবে না। এবিষয়ে অন্য প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল কোন শিল্পেই উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণ বেঁধে দেওয়া যায় না; তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে সামগ্রীর সরবরাহ বছরের পর বছর নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জীবনযাত্রার নির্দিষ্টমান অনুসারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য সারা বছরে প্রয়োজন তার চাইতে অতিরিক্ত শস্য যদি মজুত রাখা হয়, তাহলে অজন্মার বছরের সেই উদ্বৃত্ত শস্য কাজে লাগানো যেতে পারে। এইভাবে বাজারে সরবরাহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে খাদ্যশস্যের মূল্য সুস্থির করা যেতে পারে। কৃষিবীমার উপযোগিতার বিষয়ও এক্ষেত্রে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা, কৃষিতে নানা প্রকার বিপদ ও ঝুঁকি স্বীকার করে কাজ করতে হয়। তাতে কৃষকের আয় আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অথবা রাষ্ট্রের সহায়তায় যদি কৃষিবীমার প্রবর্তন করা যায় তাহলে এ সমস্যা অনেকটা লাঘব হতে পারে।

কৃষির সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি শিল্পের কথা বলেই বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করব। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের প্রাণী সম্পদ অনেক বেশি। ১৯৩৫ সালের গণনার হিসাব অনুসারে সমগ্র ভারত ও ব্রহ্মদেশের গো-মহিষাদি গৃহপালিত প্রাণী সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৬০০ লক্ষ। কিন্তু কৃষকের ন্যায় কৃষির সহায়ক গৃহপালিত জন্তুর স্বাস্থ্যও খুবই খারাপ। গৃহপালিত জন্তুর খাদ্য বিষয়ে এদেশে বড় একটা কেউই ভাবে না। বিলেতে যেমন জমির খানিকটা অংশে এদের খাদ্য বা ঘাস চাষের ব্যবস্থা আছে, এদেশের পক্ষে তা নূতন বললেই চলে। মানুষের খাবার যোগাড়

হবার পর ক্ষেতে যা অবশিষ্ট থাকে তাই এদের প্রাপ্য। তারও পরিমাণ আবার পর্যাপ্ত নয়। অবৈজ্ঞানিক জননব্যবস্থার এবং গব্যাদি প্রস্তুতিতে, চর্মশালা প্রভৃতি আনুকূল্যকারী শিল্পের অভাবে এদেশের পশুসম্পদ দিনদিন শ্রীহীন হয়ে পড়ছে। দুধের সরবরাহ বিষয়ে মার্কিন দেশের পরেই ভারতের স্থান, অথচ এদেশে মাথা পিছু দুধের ব্যবহার নামমাত্র। তাছাড়া, দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন করবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় এদের সরবরাহ ব্যাপারে আমাদের মার্কিন, অস্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। এই সব শিল্প যদি এদেশে গড়ে ওঠে তাহলে কৃষক কৃষিকার্যের সময় ছাড়াও বছরের বাকি অংশটুকু লাভজনক কাজে অতিবাহিত করতে পারে। তাতে তার কিছু আয়ও হয়, এবং কৃষির সমস্যারও অনেকখানি লাঘব হতে পারে। এ বিষয়েও রাষ্ট্রব্যবস্থার লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। এই ভাবেই কৃষি লাভজনক পেশায় পরিণত হতে পারে।

(৬) শিল্প পরিকল্পনা।

কৃষির উন্নতি কি ভাবে করা যেতে পারে এ বিষয়ে উপরের আলোচনায় কিছু বলা হলো। কিন্তু কৃষির সব চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এই যে, এদেশের বর্ধমান লোকসংখ্যার মোটা একটা অংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় কৃষি লাভজনক পেশা হতে পারছে না, সেই সঙ্গে নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। এই লোকসংখ্যা যদি অন্যত্র কাজ পেতো তাহলে কৃষির সামান্য আয়ের অপেক্ষা এরা রাখতো না। তাতে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপও হোতো কম। পাশ্চাত্য দেশ গুলোতে কৃষি এবং শিল্পবিপ্লব ও লোক সংখ্যার বৃদ্ধি, প্রায় একই সময় শুরু হওয়ায় বর্ধমান লোকসংখ্যা শিল্প এবং ব্যবসায়ে কাজ পেয়েছে। তাতে কৃষির উপর এই চাপ পড়েনি। কৃষিবিপ্লবও তাই সম্ভব হয়েছে। সেই সঙ্গে কোন কোন দেশের সাম্রাজ্য বিস্তার হওয়ায় সুবিধা হয়েছে আরও বেশি। এদেশে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি শুরু হলো এমন সময়ে

যখন রাজনৈতিক বিপর্যয়ে দেশে চলচে একটা বড় রকমের উত্থান পতন। এতে শিল্প বাণিজ্য লোপ পেল; নূতন বাণিজ্য পড়লো বিদেশীদের হাতে। তাই বর্ধিত লোকসংখ্যার প্রায় মোট অংশটাই গিয়ে পড়ল কৃষির উপর। পুরোনো দেশের জমি এভার সইবে কি করে? জনসংখ্যাবৃদ্ধির মোট বোঝা জমির উপর পড়ায় কৃষিবিপ্লব একেবারেই অসম্ভব হলো। তাই বলছি, আমাদের দেশের আর্থিক সমস্যা সমাধনের প্রধান উপায় হচ্ছে, সমঞ্জস অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা করা। কৃষির উন্নতির প্রধান উপায় হচ্ছে শিল্পের প্রতিষ্ঠা। শিল্প এবং ব্যবসায়ে বেশি বেশি লোক নিযুক্ত হলেই জমির উপর যে চাপ পড়েছে তা কমবে। তাই শিল্পের পরিকল্পনা করে সমঞ্জস অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের কায়েম করতেই হবে। এ যে শুধু কৃষির উন্নতির জন্যই প্রয়োজন তা নয়; সেই সঙ্গে আর্থিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দিক থেকেও সমঞ্জস আর্থিক সংগঠনের উপযোগিতা রয়েছে, বিশেষ করে পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যে কোন মুহূর্তে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে জগত-জোড়া অশান্তির আবির্ভাব হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে আজ যারা পরনির্ভরশীল, তাদের মত হতভাগ্য আর কেউ নাই।

কিছুদিন আগে প্রকাশিত বোম্বাই পরিকল্পনাতেও এই সমঞ্জস আর্থিক নীতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই সমঞ্জস আর্থিক ব্যবস্থা কায়েম করতে হলেও চাই শিল্পের প্রসার। কৃষির উপর যে পরিমাণ লোক নির্ভর করে তাদের সংখ্যাও সেই সঙ্গে কমাতে হবে। ১৯৩১-৩২ সালে এদেশের জাতীয় বিভাজ্য সম্পদে কৃষিপ্রভৃতির অংশ ছিল নিম্নোক্ত প্রকার:—

শিল্প শতকরা	১৭	চাকুরী শতকরা	২২
কৃষি „	৫৩	বিবিধ „	৮

বোম্বাই পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো এই অংশ নিম্নলিখিত ভাবে পরিবর্তিত করা—

শিল্প শতকরা	৩৫	চাকুরী শতকরা	২০
কৃষি „	৪০	বিবিধ „	৫

এই ভাবে হিসাব করে দেখা গেছে যে, শিল্প, কৃষি এবং চাকুরি থেকে বর্তমানে যদি ১০০৲ টাকা আয় হয়, তাহলে পনের বছর পর এই আয়ের শতকরা পরিমাণ যথাক্রমে ৫০০৲, ১৩০৲, এবং ২০০৲ টাকা হবে। বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা একথা পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে, কৃষির উপর আমাদের নির্ভরশীলতা এতখানি কমে গেলেও এদেশ যে কৃষিপ্রধানই থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁদের ভাষায়, কৃষিই আমাদের জনসংখ্যার অধিকাংশকেই নিয়োগ করতে থাকবে। এমন কি, সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রুশিয়াতেও ১৯২৮ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূচনার পর শিল্পের অভূতপূর্ব প্রসার হওয়া সত্বেও কৃষিতে জনসংখ্যার শতকরা নিয়োগের পরিমাণ কোন উল্লেখযোগ্য ভাবে কম হয় নি।" উপরের সংখ্যা এবং বক্তব্য যতই সংগত হোক না কেন, একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এতে খানিকটা গলদ রয়ে গেছে। প্রথমেই ধরা যাক আয়ের বৃদ্ধির কথা। শিল্পে আয় বাড়বে পাঁচগুণ; অথচ কৃষিতে আয় দ্বিগুণও হবে না; মাত্র তিন ভাগের একভাগ বাড়বে। এই মাত্র আমরা বললাম যে, কৃষি লাভজনক পেশা নয়। পনের বছর পরিকল্পনা কার্যকরী হবার পরও যদি কৃষির আয় মাত্র এক-তৃতীয়াংশই বাড়ে তাহলে একথা বলা বোধ হয় অসংগত হবে না যে, এই প্রকার পরিকল্পনায় কৃষিকে অবহেলাই করা হয়েছে। উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণের দিক থেকেই ধরা যাক। শিল্পের পাঁচগুণ বিস্তার হওয়ায় শিল্পজাত সামগ্রীর পরিমাণও প্রায় সেই পরিমাণে বাড়বে; অথচ কৃষিজাত সামগ্রীর পরিমাণ দ্বিগুণও হবে না। এদেশের অধিকাংশ শিল্পই কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় কাঁচামালের ঘাটতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। কেউ কেউ অবশ্য এ অবস্থাকে বেশি মাত্রায় বাড়িয়ে দেখছেন। একজন অর্থশাস্ত্রী বলছেন যে, মনে করা যাক, বস্ত্রবয়ন শিল্পের পাঁচগুণ বিস্তার করা হচ্ছে, তাহলে এতে লাগবে বছরে ১৮০ লক্ষ গাঁইট তুলো। কিন্তু বোম্বাই পরিকল্পনায় কৃষিতে যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তাতে তুলোর বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ হবে ১৩৫ লক্ষ গাঁইট। এই প্রকার সমালোচনা খুব সঙ্গত হয় না। কেননা, শিল্পের

পাঁচ গুণ বিস্তার বলতে কেবল বর্তমানশিল্প গুলিরই বিস্তার বোঝাবে না; নূতন নূতন শিল্পও এদেশে গড়ে তুলতে হবে। উৎপাদন উপকরণ শিল্প এবং প্রাথমিক শিল্পের বিস্তারই বিশেষ করে লক্ষ্য করা হয়েছে। শিল্পেরই সমপরিমাণে কৃষির বিস্তার করতে হবে, তা নয়, অথবা কেবলমাত্র বর্তমান শিল্পগুলিরই প্রসার করতে হবে তাও নয়। সমঞ্জস আর্থিকব্যবস্থার এই তাৎপর্য যাঁরা উপলব্ধি করেছেন তাঁরা এবিষয়ে আলোকের সন্ধান পান নি। কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন পরিমাণ বাড়াতে হবে ঠিকই; কিন্তু এই পরিমাণ নির্ধারণে তিনটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য করতে হবে; প্রথম, ভোগব্যবহারে এদেশে কৃষিজাত সামগ্রীর প্রয়োজন পরিমাণ; দ্বিতীয়, কৃষিসংশ্লিষ্ট শিল্পে কৃষিজাত সামগ্রীর প্রয়োজন পরিমাণ; এবং তৃতীয়, বিদেশে রপ্তানীর জন্য কৃষিজাত সামগ্রীর প্রয়োজন পরিমাণ। কৃষিসংশ্লিষ্ট শিল্পের প্রসার আবার নির্ভর করে এদেশের চাহিদা এবং বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণের উপর। সংখ্যাশাস্ত্রের মারফতে এই পরিমাণ নির্ধারণ করে আমাদের বাকি শক্তির মোটটাই উৎপাদন উপকরণ বা প্রাথমিক শিল্পে নিযুক্ত করে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এই হবে সমঞ্জস আর্থিক ব্যবস্থার চেহারা। বর্তমান শিল্পের মধ্যে শর্করা, পাট বা বস্ত্রবয়ন শিল্পের বিশেষ প্রসার অদূর ভবিষ্যতে না করাই ভাল। জীবনযাত্রার বর্তমান মান অনুসারে উপরিউক্ত বিষয়ে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার মানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব শিল্পের অনুপাতিক প্রসারই যথেষ্ট হবে। বর্তমানে যদি এই সব শিল্পের প্রসারের কথাই ভাবা যায়, তাহলে প্রয়োজনীয় শিল্প যবনিকার অন্তরালেই পড়ে থাকবে।

এদেশে পরিকল্পনা শব্দটির আমদানী করেছেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরাইয়া। গত দশ বারো বৎসর কাল যাবৎ তিনি নানা ভাবে পরিকল্পনার উপযোগিতার কথা এদেশবাসীকে শুনিয়ে আসছেন। এদেশের অর্থশাস্ত্রীরা যখন আদম স্মিথ ও তাঁর সমর্থকদের অর্থ নৈতিক চিন্তাধারা অধ্যয়ন অধ্যাপনা করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন, এবং কেবলই 'যা হচ্ছে হতে দাও' নীতির

সমর্থন করে আসছেন তখন থেকেই শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরাইয়া পরিকল্পনা ও শিল্পের প্রসারের কথা বলে আসছেন। তাঁর মতে, এদেশে উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত, এদেশের লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে পারে না। জীবন-যাত্রার মান যদি বাড়াতে হয় তাহলে দেশের উৎপাদন শক্তির প্রসারই তার এক-মাত্র উপায়। এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্যে একদিকে যেমন কার্যকরী বিদ্যার ব্যাপক প্রসার এবং আর্থিক প্রগতি বিরোধী প্রত্যেকটি নীতির পরিহার বা আমূল পরিবর্তন করতে হবে, সেই সঙ্গে অন্যদিকে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনসাধারণের শ্রমশক্তি শিল্পে বা অন্যান্য ব্যবসায়ে নিয়োজিত করতে হবে। প্রথম মহাসমরের পর থেকে বিদেশে আমাদের কৃষিজাত সামগ্রীর বাজার সঙ্কুচিত হয়েছে এবং এথেকে আমাদের আয়ও আনুপাতিক ভাবে হ্রাস পেয়েছে। অথচ সেই অনুপাতে শিল্পের প্রসার না হওয়ায় ভারতকে তার কৃষিলব্ধ যৎকিঞ্চিৎ আয়ের একটা মোটা অংশ বিদেশী সামগ্রী আমদানী করতেই ব্যয় করে ফেলতে হয়। তাছাড়া, গত ৪৫ বৎসরে প্রায় দশকোটি লোক এদেশে বেড়েছে; অথচ সরবরাহ বা আয় সে অনুপাতে কিছুই বাড়েনি। ফল, দেশজোড়া দারিদ্র্য, অর্থের ও অন্নবস্ত্রের অভাব। শ্রীযুক্ত কলিন ক্লার্ক তাঁর 'আর্থিক প্রগতির অবস্থা' গ্রন্থে একথা সুস্পষ্টভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যার বর্ধমান সংখ্যা নির্ভর করে শিল্পের বা ব্যবসায়ের উপর; কৃষির উপর নয়। এদেশে গত ৪৫ বৎসরে লোকসংখ্যা বেড়েছে। অথচ কৃষি এবং শিল্প আনুপাতিক ভাবে কিছুই বাড়ে নি। তাই এই বাড়তি লোকসংখ্যার মোটা একটা অংশই কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়েছে। এই লোকসংখ্যাকে যদি ভালভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে তার জন্য শিল্প বাড়াতেই হবে। কেবলমাত্র কৃষির উন্নতি করে এসমস্যার সমাধান করা অসম্ভব। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, শিল্পের না হয় বিস্তারই হল; কিন্তু তাতে কি আমাদের বাড়তি লোকসংখ্যার মোট অংশটুকু কাজ পেতে পারবে? তার উত্তরে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরাইয়া যা বলেছেন তা খুবই সংযত। তাঁর ভাষায়,

"এদেশের প্রয়োজনোপযোগী উপকরণ শিল্প এদেশে প্রতিষ্ঠিত হলে পর বহুসংখ্যক শ্রমিক তাতে কাজ পাবে। উপকরণ শিল্প সংশ্লিষ্ট আরও বহুশিল্প প্রতিষ্ঠান যখন গড়ে উঠবে, তখন তাতে আরও অধিকসংখ্যক লোক কাজ পাবে। সমঞ্জস আর্থিক ব্যবস্থায়, কৃষিসংশ্লিষ্ট চাকরীর তুলনায় শিল্পসংশ্লিষ্ট চাকরীর সংখ্যা অনেক গুণ বেশি এবং লাভজনক।"

পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল দেশগুলির কথা না হয় বাদই দিলাম। যে রুশিয়া ১৯১৭ সালের আগে কৃষিপ্রধান ছিল সেখানেও ১৯২৮ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উৎপাদন উপকরণ শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে আর্থিক উন্নতির জন্য যে ৫২'৫ বিলিয়ন রুবল খরচ হয় তার মধ্যে শিল্পে খাটানো হলো ২৪'৮ বিলিয়ন রুবল; এবং তার মধ্যে আবার ২১'৩ বিলিয়ন রুবল উপকরণশিল্পেই ব্যয় হ'ল, ভোগব্যবহার্যসামগ্রীর উৎপাদনশিল্পে নয়। নূতন প্রণালীর নূতন কলকব্জা লাগানো বহু শিল্প দেশে গড়ে উঠলো। পরিকল্পনা কায়েম হবার আগে রুশিয়াও ভারতেরই মত কৃষিপ্রধান ছিল; ইউরোপীয় দেশগুলোর তুলনায় জীবনযাত্রার মান ছিল অতি নীচু। এ অবস্থাতেও কৃষি বা ভোগব্যবহার্য-সামগ্রী উৎপাদন শিল্পে সমস্ত শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত করা হলো না কেন? রুশ নেতারা মার্ক্সের একথা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, যতদিন উৎপাদন উপকরণের সরবরাহ অফুরন্ত না হবে, ততদিন জীবনযাত্রার মান কিছুতেই স্থায়ীভাবে উন্নত করা সম্ভবপর নয়। পরবর্তী যুগে কেইন্স্‌ও প্রকারান্তরে একথা বলেছেন। এই প্রকার নীতি অবলম্বন করার ফলে রুশিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই শিল্পে অগ্রগামী দেশ হয়ে উঠলো। প্রথম পরিকল্পনার অবসান হলে পর যে শিল্পগণনা করা হয়, তাতে দেখা যায় যে, ১৯২৮ সালে যে উৎপাদন পরিমাণ ছিল ১৫.৭ বিলিয়ন রুবল, সেই উৎপাদন পরিমাণ ১৯৩২ সালে হলো ৩৪.৩ বিলিয়ন রুবল, অর্থাৎ দ্বিগুণেরও কিছু বেশি। শুধু উৎপাদন উপকরণের পরিমাণই যদি ধরা হয়, তাহলে বলতে হবে যে, এদের উৎপাদন পাঁচবৎসরেই প্রায় সাড়ে চার গুণ বেড়ে যায়। এঅবস্থায় বোম্বাই শিল্পপতিদের পরিকল্পনায় পনের বছরে শিল্পের পাঁচগুণ

বিস্তারকে অহৈতুক বা অসম্ভব কিছু বলে ধরে নেওয়া উচিত হবে না। উপকরণ শিল্প এবং শক্তি সরবরাহ-শিল্পের পরই স্থান পেল কৃষি, খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের হিসাবে যতটা নয়, শিল্পে কাঁচা মাল সরবরাহের জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি। সবশেষে স্থান পেল ভোগব্যবহার্য সামগ্রী উৎপাদন শিল্প। রুশ নেতারা দেশের স্থায়ী আর্থিক নববিধান চেয়েছিলেন বলেই, এই প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরাইয়া বারোটি শিল্প অদূর ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত করবার কথা বলেছেন। রুশ পরিকল্পনায় যে উৎপাদন উপকরণ শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, এই বারোটি শিল্পও তার অনুরূপ। এতে নিম্নলিখিত শিল্পগুলি স্থান পেয়েছে—(১) জাহাজ নির্মাণ, (২) শক্তির সরবরাহের কলকব্জা, তেলের ইঞ্জিন, ডিসেল্ ইঞ্জিন ও গ্যাস ইঞ্জিন, (৩) রেলের ইঞ্জিন, গাড়ী ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম, (৪) মোটর গাড়ী ও বিমান, (৫) শিল্পোপকরণ ও কলকব্জা, (৬) বৈদ্যুতিক শক্তি ও জলপ্রপাতজাত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনকারী কলকব্জা, (৭) অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের কলকব্জা, বিমানের ইঞ্জিন, ভারবাহী মোটর, সাঁজোয়া গাড়ী এবং অন্যান্য অস্ত্রাদি প্রস্তুত, (৮) হাতিয়ার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি, (৯) রাসায়নিক শিল্প, (১০) কৃষিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি, (১১) অ্যালুমিনিয়ম্ এবং (১২) রঞ্জক দ্রব্য।

বোম্বাই আর্থিক পরিকল্পনাও স্বাধীন ভারতকে লক্ষ্য করেই রচিত হয়। এই পরিকল্পনায় প্রথমেই একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, আর্থিক বিষয়ে স্বাধীন জাতীয় সরকারই কেবল এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে পারবেন। এতেও উৎপাদন উপকরণ শিল্প বা প্রাথমিক শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই শিল্পকে এই পরিকল্পনায় আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথাঃ—(১) সর্বপ্রকার শক্তি সরবরাহ, (২) লোহা, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়ম, ম্যাংগানিস, প্রভৃতি ধাতু খনন ও নিষ্কাশন, (৩) ইঞ্জিনিয়ারীং-এর অনেক রকম যন্ত্র, কলকব্জা, হাতিয়ার নির্মাণ, প্রভৃতি, (৪) রাসায়নিক শিল্প—এতে সব রকম রাসায়নিক দ্রব্য, রং, উর্বরতা-

বৃদ্ধিকারী রাসায়নিক সার, রবার প্রভৃতি নমনীয় পদার্থ উৎপাদন শিল্প এবং ঔষধাদি রয়েছে, (৫) যুদ্ধের সরঞ্জাম, (৬) যানবাহন—রেলের ইঞ্জিন, মালগাড়ী এবং যাত্রীবাহী গাড়ী, জাহাজ নির্মান, মোটর গাড়ী, বিমান, প্রভৃতি, এবং (৭) সিমেন্ট। এই সব শিল্পের গোড়ায় রয়েছে সস্তায় পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তি সরবরাহ। কারণ, সস্তায় যদি শক্তি সরবরাহ না করা হয়, তাহলে কোন শিল্পই গড়ে উঠতে পারবে না। কলকারখানার কাজে কয়লার ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু এদেশে কয়লা কেবল মাত্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাতেই ব্যবহৃত হতে পারে। কেননা, ঝরিয়া বা রাণীগঞ্জের খনি থেকে কয়লা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রপ্তানী করা ব্যয়সাপেক্ষ। তাই দাক্ষিণাত্যে অনেক জায়গায় বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। বোম্বাই প্রদেশের কথাই ধরা যাক। এই খানে জলপ্রপাত থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করার কাজ টাটাকোম্পানীই আরম্ভ করেন। কিন্তু, এতে যে হারে বিদ্যুত শক্তি সরবরাহ করা হয় তাতে খরচ অনেক বেশী পড়ে যায়। বোম্বাই মিলমালিকসংঘের সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, তাঁরা যদি বিদ্যুতশক্তি নিজ নিজ ব্যবস্থায় উৎপাদন করেন তাহলেও খরচ অনেক কম হতে পারে। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৩৯ সালে এই খরচের পরিমাণ ইউনিট প্রতি এক আনার '৭২৫ অংশ থেকে কমে '৩৫ করা হয়। কিন্তু এই হারেও অন্যান্য দেশের তুলনায় খরচের পরিমাণ বেশী পড়ে। জলপ্রপাত অথবা খরস্রোতা নদী থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করবার সুবিধা এদেশে বেশ আছে। এদের যদি ঠিকমত কাজে লাগানো যায় তাহলে বিদ্যুত শক্তির উৎপাদনে আমরা যে কোন দেশের সমকক্ষ হতে পারি। তবে এর প্রধান অসুবিধা হ'ল এই যে, এই প্রকারে শক্তি উৎপাদনে প্রথমেই মোটা হারে পুঁজি খাটানো দরকার। সেই কারণে যে সব শিল্পে অন্যান্য খরচের অনুপাতে শক্তির খরচ বেশী, সেই সব শিল্পে বর্তমান অবস্থায় আমাদের কিছু অসুবিধা হবে। বর্তমানে যে সব শিল্প এদেশে গড়ে উঠেছে তাতে শক্তি বাবদ খরচ মোট খরচের সামান্য অংশই। কিন্তু বিভিন্ন উৎপাদন উপকরণ শিল্পে, বিশেষ বিদ্যুত শিল্পে এই

খরচের পরিমাণ বেশী। অতএব সেই সব শিল্প গড়ে তোলবার প্রথম সোপানই হবে সস্তায় বিদ্যুত শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এবিষয়ে মিউনিসন বোর্ডের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বোর্ডের মতে, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সস্তায় বিদ্যুতশক্তি সরবরাহ করা এদেশেও সম্ভবপর। এই উপযুক্ত ব্যবস্থা বলতে কয়েকটি জিনিষ বোঝাবে। প্রথম, যে পরিমাণ বিদ্যুতশক্তি উৎপাদন করলে খরচ সব চেয়ে কম পড়ে মোট সেই পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করার ব্যবস্থা করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যে অঞ্চলে এই শক্তি উৎপাদন করা হবে সেখানে কেবলমাত্র জনসাধারণের চাহিদার উপর নির্ভর করলেই চলবে না। কেননা, এতে পর্যাপ্ত পরিমাণ শক্তির ব্যবহার সম্ভবপর নয়। সেই জায়গায় যদি কলকারখানা থাকে তাহলেই উর্ধ্বতম পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করা চলতে পারে। এই কারণে বর্তমান শিল্প যেখানে এলোমেলো ভাবে গড়ে উঠেছে, সেখানে পুনর্বিতরণের মধ্যে দিয়ে সারা দেশে শিল্প প্রসারের সমতা আনতে হবে, বিশেষ করে সেই সব অঞ্চলে শিল্প-ব্যবস্থাকে ছড়িয়ে দিতে হবে যেখানে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সরবরাহের সুবিধাটিও অনেকখানি ব্যবহৃত হতে পারে। জল সেচন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুত শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থাকে একত্র করলে কাজের আরও সুবিধা হবে। জলসেচন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থায় যেমন কৃষির উন্নতি সম্ভব হবে, তেমন বিদ্যুত শক্তির দেশব্যাপী সরবরাহে সারা দেশে শিল্প গড়ে উঠবে। অতিশয় দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে, এদেশে যেখানে ২৭০ লক্ষ কিলোআট বিদ্যুত শক্তি উৎপন্ন হতে পারে সেখানে মাত্র ৫ লক্ষ কিলোআট বিদ্যুতশক্তি বর্তমানে উৎপন্ন হয়। জাপান এবং রুশিয়ার দ্রুত শিল্প প্রগতির পেছনেও দেশজোড়া বিদ্যুত সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের দেশেও উৎপাদন উপকরণ শিল্পের প্রসার করার আগে আমাদের শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। বোম্বাই শিল্পপতিদের পরিকল্পনাতেও এ বিষয়ের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করা হয়েছে।

ভোগব্যবহার্য সামগ্রী উৎপাদন শিল্প কিছু কিছু এদেশে গড়ে উঠেছে।

চিনির সরবরাহ বিষয়ে আমরা মোটামুটি স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভ করেছি। বস্ত্রবয়নশিল্পও এদেশে প্রসার লাভ করেছে; কিন্তু গত শতাব্দীর শেষার্ধে এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় অনেক কারখানাতেই অতি পুরাতন কলকব্জা আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে কাজেরও যেমন ক্ষতি হয় সেই সঙ্গে খরচও পড়ে বেশী। তাই বস্ত্রবয়ন শিল্পে আধুনিক কলকব্জার ব্যবহার এবং আধুনিক পদ্ধতির প্রবর্তন হওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া চর্মশিল্প, কাচশিল্প, কাগজ ও তামাকের কারখানা প্রভৃতির বিস্তার হওয়া দরকার। তৈলশিল্প গত কয়েক বছরে নামমাত্র গজিয়েছে। কিন্তু এখনও এই শিল্প আমাদের প্রয়োজনানুরূপ নয় বলেই তৈলবীজ প্রচুর পরিমাণে এদেশ থেকে বিদেশে পাঠানো হয়ে থাকে। এই শিল্প যদি ভাল ভাবে গড়ে ওঠে তাহলে এদেশেই তৈলবীজের ব্যবহার হতে পারবে। শুধু তাই নয়; সেই সঙ্গে বিভিন্ন তৈলজাত পদার্থের সরবরাহ বিষয়েও আমরা স্বাবলম্বী হতে পারবো এবং খইলও এদেশে থেকে জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারবে।

শিল্পের প্রসার করতে হলে অনেক গুলি বিষয়ের কথা ভাবতে হয়। প্রথমেই দেখতে হয় যে, শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এদেশে পাওয়া যাবে কি না। তারপর দেখতে হবে যে, বিভিন্ন শিল্পের কি পরিমাণ বিস্তার হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুদক্ষ শ্রমিক ও তত্ত্বাবধায়ক এদেশে পাওয়া যায় কি না এবং কি ভাবে এদের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে—সে বিষয়েও ভেবে দেখা দরকার। এদেশের সাধারণ শ্রমিকের কর্মদক্ষতা কিরূপ, তাদের বেতনের হারই বা কি এবং এদের কিভাবে কাজে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে, এই সব বিষয়ও লক্ষ্য করা দরকার। তারপরই প্রশ্ন দাঁড়াবে এই যে, উৎপন্ন সামগ্রীর জন্য চাহিদা কি পরিমাণ আছে—শুধু দেশের বাজারেই নয়, বিদেশেও। আর, এই সব কাজে যে পুঁজি লাগবে তারই বা সরবরাহ হবে কি প্রকারে। যে কোন শিল্প-পরিকল্পনা প্রস্তুত করবার আগে আমাদের এই সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কেননা, এই সব সমস্যার যদি সমাধান না হয় তাহলে

শিল্প প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না। যদি কাঁচামাল না থাকে বা সুদক্ষ শিল্পীর অভাব হয়, যদি সাধারণ শ্রমিকের কর্মদক্ষতা খুবই কম হয় অথবা উৎপন্ন সামগ্রীর জন্য যদি বাজার না থাকে, অথবা সব রকম সুবিধা থাকা স্বত্বেও যদি পুঁজির অভাব হয় তাহলেই আর পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা যাবে না।

প্রথমেই কাঁচামালের সরবরাহের কথা আলোচনা করা যাক। এই কাঁচামাল সাধারণত দুই প্রকারের হয়—প্রথম কৃষিজ এবং দ্বিতীয় খনিজ। এদেশে যে তিনটি প্রধান শিল্প গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ বস্ত্রবয়ন, পাট ও শর্করা, তাতে কৃষিজাত কাঁচামালের প্রয়োজন। বস্ত্রবয়ন শিল্পে যে তুলোর প্রয়োজন তার সবটাই এদেশে উৎপন্ন হয় এবং তার উদ্বৃত্ত অংশ বিদেশে রপ্তানীও হয়ে থাকে। পৃথিবীতে যে সব দেশে তুলোর চাষ হয়ে থাকে তার মধ্যে ভারত অন্যতম। তবে লম্বা আঁশের তুলোর চাষ এদেশে খুব বেশী হয় না বলেই এই তুলো মিশর থেকে আমাদের আমদানী করতে হয়। ১৯৩৪-৩৫ সালে এক ইঞ্চির অধিক লম্বা আঁশের তুলো এদেশে ৪০০ পাউণ্ডের গাঁইট হিসাবে প্রায় ৫১ হাজার গাঁইট উৎপন্ন হয়েছিল। তারপর থেকেই এই তুলোর চাষ বাড়াবার চেষ্টা করা হতে থাকে, কিন্তু তা সত্বেও এই প্রকার তুলোর জন্য যে চাহিদা আমাদের রয়েছে তার সবটা মেটান সম্ভবপর নয়। সে যাই হোক, শিল্পপতির দৃষ্টিভঙ্গীতে সব চেয়ে দরকারী বিষয় হল কাঁচামাল খরিদ করতে যে খরচ, সেইটি, বস্ত্রবয়ন শিল্পে সব রকম খরচের মধ্যে কাঁচামালের পেছনে খরচই সবচেয়ে বেশী। দুদিক থেকে এই খরচের বিচার করতে হয়—প্রথম, কাঁচামালের মূল্য এবং দ্বিতীয়, খরিদ প্রণালী। মূল্য আবার নির্ভর করে সরবরাহ এবং তুলোর গুণাগুণের উপর। এ বিষয়ে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, ভারতে যথেষ্ট পরিমাণ তুলোর চাষ হয়ে থাকে, এবং ভাল লম্বা আঁশওয়ালা তুলোর চাষও দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু কি দরে তুলো খরিদ হচ্ছে সেইটিই হল অধিকতর প্রাসঙ্গিক। একটু আগেই বললাম যে বস্ত্রবয়ন শিল্পে কাঁচামালের পেছনে খরচই সব চেয়ে বেশী। যতই ভাল তুলোর ব্যবহার

বাড়বে এই খরচও সেই সঙ্গে বাড়তে থাকবে। ইংলণ্ডে দেখা গেছে যে, ভাল তুলোর ব্যবহারে এই খরচ মোট খরচের তিন চতুর্থাংশের কম নয়। তাই বলছি যে, কি দরে তুলো খরিদ হল এবং সারা বছর ধরেই বা বাজারে কি দরে তুলো পাওয়া যাচ্ছে—এইটিই সব চেয়ে প্রাসঙ্গিক ব্যাপার। এত বেশী অহেতুক কৃত্রিম কারবার হয় যে, তাতে মূল্য স্থির হওয়া দূরে থাক, আরও অ-স্থির হয়ে ওঠে। বোম্বাই বাজারে যারা তুলো খরিদ করে তারা তবুও মোটামুটি সুস্থির মূল্যে মাল পায়; কিন্তু উৎপাদন কেন্দ্রে লোক পাঠিয়ে যে সব মিল তুলো খরিদ করে, তারা ঠিক দর পায় না। এ বিষয়ে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থাও নেই। কাঁচামালের মূল্য যাতে সুস্থির হয়, এবং সারা বছরই সরবরাহ হতে থাকে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। অন্যথায়, মজুতের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় ছোট ছোট মিল মালিকদের অসুবিধায় পড়তে হয়।

পাটের চাষ একমাত্র এদেশে হয়ে থাকে, এবং কাঁচামাল ও শিল্পজাত সামগ্রী হিসাবে এখনও পাট পৃথিবীর অনেক দেশেই সমাদৃত। কিছু দিন থেকে সস্তায় ঐ জাতীয় সামগ্রী উৎপাদনের জন্য গবেষণা চলেছে এবং কিছু কিছু সফলতাও পাওয়া গেছে। তাই পাটকে যদি তার একচেটিয়া প্রভুত্ব বজায় রাখতে হয়, তাহলে সস্তায় পাট সরবরাহের ব্যবস্থা করা দরকার। এর জন্য একদিকে যেমন ভাল পাটের চাষ হওয়া দরকার, অন্যদিকে আবার চাষের বিবিধ খরচ কম হওয়া প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যন্ত্রাদির সাহায্যে পাট নিষ্কাশন প্রভৃতি বিষয়ে আজও কোন ব্যবস্থা এদেশে গৃহীত হয় নি। পাটের আঁশ লম্বা করবার জন্যও কোন বিশেষ গবেষণা করা হয় নি। পাটের মূল্য বজায় রাখার জন্য মূল্য বা চাষের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ, অথবা শিল্পের উৎপাদিকাশক্তির নিয়ন্ত্রণমূলক যে সব ব্যবস্থা এ পর্যন্ত গৃহীত হয়েছে, তাতে সমস্যাটি সাময়িক ভাবে লাঘব করা চলতে পারে, কিন্তু বরাবরের জন্য নয়।

সমস্যাসমাধানের প্রকৃষ্টতর উপায় আলোচনা করা যাক। পাটচাষের খরচ কমানো, এবং লম্বা আঁশওয়ালা ভাল পাট উৎপাদন করা দরকার।

তাই যদি করা হয় তাহলে পৃথিবীর বাজারে পাট নিজের স্থান নিজে করে নিতে পারবে। কৃষির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে পাট শিল্পে উৎকর্ষ হওয়া চাই। অনেকগুলি মিলই প্রগতিশীল জগতের সঙ্গে এগিয়ে না চলায়, এদের খরচও বেশী পড়ে যাচ্ছে। সংঘের মারফতে এবং শ্রমিক নিপীড়ন করে এরা এখনও কোন মতে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু দীর্ঘকালীন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এদেরও নিজেদের উৎকর্ষসাধন করে খরচ কমানো উচিত।

এইবার শর্করা-শিল্পের কথা বলা যাক। একথা সবারই জানা আছে যে মাত্র গত পনেরো বছরে ভারত শর্করা সরবরাহ বিষয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে। উৎকৃষ্টতর ইক্ষুর চাষও ক্রমেই বাড়ছে। ১৯৩০-৩১ সালে ২৯০৫০০০ একর জমির মধ্যে ৮১৭০০০ একরে উৎকৃষ্টতর ইক্ষুর চাষ হত। ১৯৪০-১ সালে ৪৫৯৮০০০ একরের মধ্যে ৩৪৮০০০ একরে এই প্রকার ইক্ষুর চাষ হয়। ১৯৩০-৩১ সালে একর প্রতি ভাল ইক্ষুর ফসল হত ১২·৩ টন; ১৯৪০-১ সালে এই পরিমাণ ১৫·০ টন হয়। কিন্তু এতেই সব হবে না; ইক্ষু চাষের উৎকর্ষ আরও বাড়াতে হবে এবং পরিমাণও বাড়াতে হবে। মন প্রতি ইক্ষুর মূল্য এত কম যে, তাতে চাষীর বিশেষ সুবিধা হয় না; অথচ ইক্ষুর মূল্য যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে শর্করা শিল্পের পক্ষে তা ক্ষতির কারণ হবে। কেননা জাভা প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন চিনির সঙ্গে এদেশে উৎপন্ন চিনি কিছুতেই প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে না। তাই বলছি যে, ইক্ষুর মূল্য না বাড়িয়ে শুধু কৃষির উৎকর্ষ সাধন করে খরচ যদি কমিয়ে দেওয়া যায় তাহলে চাষীর পক্ষেও যেমন সুবিধা শিল্পপতিদের পক্ষেও ঠিক তেমনিই। এই প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ যে সম্ভবপর তা পরীক্ষা দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে এবং যে সব শিল্পপতির নিজের চাষের ব্যবস্থা আছে তাঁদের ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসলের দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে। ইক্ষুর উৎকর্ষ বিধানের সব চেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে কৃষি এবং শিল্পকে একই মালিকের হাতে রাখা। চাষীর আর্থিক অস্বচ্ছলতায় সে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম। জাভা প্রভৃতি দেশে

এই কাজ একই হাতে থাকায় বেশ সন্তোষজনক ফল হয়ে থাকে। এদেশেও যে সব শিল্পপতিদের নিজেদের ক্ষেত আছে তাঁরা অন্য শিল্পপতিদের চাইতে কম খরচে চিনি উৎপন্ন করে থাকেন। একথা অবশ্য সত্য যে, ইক্ষুর উৎকর্ষ বিধানে খরচ বেশী পড়বে; কিন্তু লাভ হবে ততোধিক। নিচের সংখ্যায় উপরোক্ত মন্তব্যের সত্যতা বোঝা যাবে ঃ

খরচের হিসাব	দেশী ইক্ষু	উৎকৃষ্টতর ইক্ষু
বিছন, চাষ এবং সারের খরচা···	৫১।৶ ০	৫৫॥৵০ আনা
জল সেচনের খরচা······	৭।০	৭।০
খাজনা......	১০৲	১০৲
মোট খরচা	৬৮॥৵০ আনা	৭২৸৵০ আনা
ফসলের পরিমাণ·········	২৫০/০ মন	৩৫০/০ মন
রসের শর্করা দশ ভাগ গুড়ের হিসাবে তিন টাকা মন দরে—		
মোট মূল্য············	৭৫৲ টাকা	.০৫৲ টাকা
মোট লাভ	৬।৵০ আনা	৩২৶ আনা

উপরের আলোচনায় আমাদের কৃষিসংশ্লিষ্ট প্রধান তিনটি শিল্পে কাঁচামালের বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা হল। অন্যান্য যে সব শিল্প কৃষিসংশ্লিষ্ট তাদের বেলায় প্রায় একই কথা বলা যায়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সমস্যা হলো খরচ কমানো এবং তার জন্য চাই কৃষির সর্ববিধ উৎকর্ষসাধন এবং শিল্প আধুনিক

করা। এবারে আমরা অন্যান্য শিল্পের কাঁচামাল ও খনিজ সম্পদের বিষয়ে দুচার কথা বলব। আমরা আগেই বলেছি যে, এদেশে প্রচুর পরিমাণে তৈলবীজ উৎপন্ন হয়, এবং এর অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হয়। এদেশে যদি বনস্পতি তৈল শিল্প গড়ে উঠে, তাহলে এই সব তৈলবীজ এদেশেই ব্যবহৃত হতে পারে। প্রতি বৎসর এই জাতীয় এবং আনুষঙ্গিক বহুসামগ্রী আমরা বিদেশ থেকে আমদানী করে থাকি। এই সকল শিল্পের অভ্যুদয় হলে আমরা স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে পারি। বনস্পতি তৈলশিল্পের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করছে আরও কয়েকটি শিল্প এদেশে গড়ে ওঠার উপর, যেমন, সাবান, রং, নকল চর্বি, মাখন ও ঘি, সংমিশ্রিত পিচ্ছিলকারক পদার্থ, মোমবাতি প্রভৃতি শিল্প। গত কয়েক বছরে এদের মধ্যে কয়েকটি শিল্প এদেশে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু এদের আয়তন এখনও সন্তোষজনক নয়। রঞ্জন শিল্পের কথাই ধরা যাক। এই শিল্প এখনও শৈশবাবস্থায় রয়েছে, এবং এর প্রসারের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ভারতীয় সামগ্রীর প্রতি জনসাধারণের বর্তমান বিরুদ্ধ মনোভাব। তাই বিদেশী রংই এদেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সংমিশ্রিত পিচ্ছিলকারক পদার্থের সরবরাহ বিষয়েও আমরা পরনির্ভরশীল। এই সব পদার্থের জন্য চাহিদা শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে বৈ কমবে না, এবং দেশে উৎপন্ন করতে না পারলে এই চাহিদা বিদেশী সামগ্রী দিয়েই মেটাতে হবে। এবারে নকল চর্বির কথাই বলি। এটি বস্ত্রবয়ন শিল্পে বিশেষ প্রয়োজনীয়, এবং প্রতি বৎসর আমাদের অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড থেকে প্রায় ২২ লক্ষ টাকার চর্বি আমদানী করতে হয়। অয়েলক্লথ, মোমবাতি প্রভৃতিও একই ভাবে বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়ে থাকে। এতে শুধু যে আমাদের আর্থিক ক্ষতিই হচ্ছে তা নয়; সেই সঙ্গে অন্যান্য শিল্পে প্রয়োজনীয় তৈলজাত সামগ্রীর সরবরাহ বিষয়ে আমাদের পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে। অথচ এদেশে যে পরিমাণ তৈলবীজ উৎপন্ন হয় তাতে একথা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে, এই পরনির্ভর-শীলতা দূর করা কঠিন নয়। এবারে কাগজ শিল্পের কথা বলা যাক। পনের

বছর আগেকার কথা; তখন এদেশে যে দু একটি প্রতিষ্ঠান ছিল, কাগজ তৈরী করতে তাদের নির্ভর করতে হত বিদেশ থেকে আমদানী করা কাষ্ঠমণ্ডের উপর। এই কয় বৎসরে বিদেশী মণ্ডের আমদানী প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ কমে গেছে এবং সেই যায়গায় দেশী বাঁশ, ঘাস এবং অন্যান্য পদার্থ থেকে তৈরী মণ্ড ব্যবহৃত হচ্ছে। পাট, চট, ছেঁড়া কাপড়, আখের ছোবড়া প্রভৃতি থেকেও এই মণ্ড তৈরী করা যেতে পারে। এই কাজে দরকারী বাঁশের পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। ১৯৩৮ সালে এই পরিমাণ ৬ লক্ষ টনেরও বেশী ছিল। এছাড়া বিহার, সংযুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং পাঞ্জাবে জাত শাবই ঘাসের পরিমাণও ১৯৩৮ সালে প্রায় ৫০০০০ টন ছিল। এছাড়া নেপালেও এই ঘাস যথেষ্ট পরিমাণ জন্মে। ভাল কাগজ তৈরী করতে অবশ্য কাঠের মণ্ড মেশাতে হয়। চেষ্টা করলে তা ও এদেশে তৈরী হতে পারে। দেবদারু ও পাইন গাছ এ বিষয়ে বিশেষ উপযোগী। ১৯৩১ সালের এক গণনা অনুসারে প্রায় ৩৫ লক্ষ একর জমিতে এই সব গাছ রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সব গাছ থেকে মণ্ড তৈরী করবার প্রায় কোন ব্যবস্থাই গৃহীত হয় নি। এ বিষয়ে যাতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয়, সে দিকে সরকারের দৃষ্টিপাত করা দরকার।

ভারতের খনিজ সম্পদ ও তার ব্যবহারে এদেশবাসীর দক্ষতা ইতিহাস-বিখ্যাত। কম বা বেশী প্রায় সব রকম খনিজ পদার্থ এদেশে রয়েছে। বর্তমান সময়ে এদেশের যে সব খনিজ পদার্থ অধিক উল্লেখযোগ্য, তাদের মধ্যে কয়লা, ম্যাঙ্গানিস, সোনা, লবন, লোহা, অভ্র, সোরা, মোনাজাইট প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে। লোহা সাধারণত চার প্রকার হয়। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান লোহা, হেমাইট, এদেশে পাওয়া যায়। এতে শতকরা ৬০ ভাগই লোহা থাকে। ডাঃ ফক্স বলেন যে, ভারতের লোহা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এর ফলে, অপেক্ষাকৃত সেকেলে প্রণালী ব্যবহার করেও এদেশের লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে

সমকক্ষতা করে আসছে। কয়লা এদেশের আরও একটি খনিজ পদার্থ; কিন্তু ভাল কয়লার খনি কেবল মাত্র রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকায় কয়লার ব্যবহার এদেশে ব্যাপক হতে পারে নি। বর্তমান যুগে বিদ্যুতের শক্তি এ অভাব অনেকখানি পূরণ করেছে। কয়লার ন্যায় পেট্রোলিয়মও ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে সীমাবদ্ধ। পেট্রোলিয়মের ব্যবহার অবশ্য ব্যাপক।

এদেশের আর একটি উল্লেখযোগ্য ধাতু হল ম্যাঙ্গানিজ। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এই ধাতু ভারতেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হত। তারপর এই উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়। এই ধাতুর প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই বিদেশে রপ্তানী হয়ে থাকে। ম্যাঙ্গানিজের ন্যায় অভ্রের ব্যবহারও ভারতীয় শিল্পে যৎসামান্য; তাই অভ্রও বিদেশে রপ্তানী হয়ে থাকে। যে সব শিল্পে এই সব খনিজ বস্তুর ব্যবহার হয় তারা দাঁড়িয়ে গেলে পর এই সব ধাতু এদেশেই ব্যবহৃত হতে পারবে। মোনাজাইটের খনি ১৯০৮-০৯ সালে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে আবিষ্কৃত হয়; পরবর্তী সময়ে মাদ্রাজেও এর খনি পাওয়া যায়। সিমেণ্ট, ইট, টাইল প্রভৃতির প্রস্তুত কার্যে এই জিনিসটি বিশেষ উপযোগী। এই সব খনিজ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হলে অনেক শিল্প এদেশেই বেড়ে উঠতে পারে।

এইবার রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন বিষয়ে দুএক কথা বলা প্রয়োজন। আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন শিল্পে প্রয়োজনীয় অধিকাংশ পদার্থ এদেশে সহজ প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও এই শিল্প বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধ নীতির ফলেই আজও গড়ে উঠতে পারেনি। অথচ অন্য যে কোন শিল্পের চাইতে এই শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। কারণ, অন্য যে কোন শিল্পেই রাসায়নিক পদার্থের কম বা বেশী প্রয়োজন হয়। এই অভাব প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। তাই মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান খাড়া হল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশগুলো, বিশেষ করে ইংলণ্ড ও জার্মানী, যেভাবে প্রতিযোগিতা

শুরু করলো তাতে এই সব নূতন প্রতিষ্ঠান গুলো শৈশবাবস্থা অতিক্রম করার আগেই অদৃশ্য হল। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ সরকারের কাছে সংরক্ষণমূলক নীতির জন্য আবেদন জানালেন, কিন্তু ফল কিছু হল না। এঁরা এমন পর্যন্ত বলেছেন যে, অন্য শিল্পকে যে-মাপকাঠি দিয়ে যাচাই করা হয়, এই শিল্পকে সেই মাপকাঠি দিয়ে যাচাই করা সঙ্গত হবে না। একথা অবশ্য সত্য যে, এই শিল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণ এদেশে পাওয়া গেলেও এর সর্বাধিক প্রয়োজনীয় উপকরণ সালফিউরিক এসিড বিদেশ থেকে বেশির ভাগ আমদানী করতে হয়। তাই বলে এই অতি প্রয়োজনীয় শিল্পকে এতকাল অবহেলা করা সঙ্গত হয় নি। সে যাই হোক, সালফিউরিক এসিড ছাড়া অন্য প্রায় সব উপাদানই এদেশে পাওয়া যায়। তা যদি না'ও পাওয়া যেত, তবু এই সব শিল্পের প্রতিষ্ঠা করার বিষয় সর্বাগ্রগণ্য হওয়া উচিত। সাল-ফিউরিক এসিড এদেশে না পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কৃত্রিম উপায়ে এই বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থটি উৎপাদন করা যায় না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সিনথেটিক অ্যামোনিয়া থেকে গন্ধক তৈরী করা যায়। তাতে খরচ একটু বেশী পড়ে বটে; কিন্তু তাই বলে এবিষয়ে পরমুখাপক্ষী হয়ে থাকা চলে না।

শিল্প-প্রতিষ্ঠায় যে-সব কাঁচামালের প্রয়োজন তার অধিকাংশই যে এদেশে পাওয়া যায়, উপরের আলোচনায় একথা বেশ সুস্পষ্ট হল। জাহাজ, বিমানপোত বা মোটরগাড়ী নির্মাণেও এমন কিছু লাগে না যা এদেশে প্রস্তুত হতে পারে না। এই সব শিল্পের উৎপাদন নির্ভর করে লৌহ এবং ইস্পাত শিল্পের উপর। টাটা কোম্পানীর লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা এর প্রথম স্তর। রেলওয়ে ইঞ্জিন মেরামতের যে সব কারখানা এদেশে আছে, তাদের ঠিকমত বাড়াতে পারলে ইঞ্জিন নির্মাণের কাজও যে চলতে না পারে তা নয়। ভিজাগাপটমের জাহাজ নির্মানের ব্যবস্থা ও মহীশুর রাজ্যের বিমানপোতের কারখানায় স্বচ্ছন্দে এই সব আবশ্যকীয় সামগ্রী উৎপাদনের

কাজ চলতে পারে। তাতে দেশ যেমন স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে, সেই সঙ্গে প্রতি বৎসর বহুকোটি টাকা আর বিদেশে রপ্তানী করতে হবে না। লৌহ এবং ইস্পাত শিল্পের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কলকব্জা এবং তাদের বিভিন্ন অংশ যাতে এদেশে তৈরী হতে পারে সেদিক লক্ষ্য করতে হবে। এই সব সামগ্রীর সরবরাহ বিষয়ে আজও আমরা পরাধীন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিকল হয়ে উঠলেই আমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও এই পরনির্ভর-শীলতার জন্য সঙ্গীন হয়ে ওঠে। স্বাধীন ভারতে আর্থিক স্বাতন্ত্র্য লাভের জন্য এই সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা বা বিস্তার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে।

উৎপাদনসহযোগী বিষয়ক খরচায় কাঁচামালের পরই উল্লেখযোগ্য অংশই হ'ল শ্রমিকদের। এ বিষয়ে প্রথমেই বলা দরকার যে, চল্লিশকোটি লোকের সামান্য একটা অংশই শিল্পে কাজ পেয়ে থাকে। তাছাড়া ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা মোটের উপর বাড়ে নি। এদেশে যে দুচারটি শিল্প আছে তারা এলোমেলো ভাবে গড়ে ওঠায় বিভিন্ন প্রদেশের জনসংখ্যার সঙ্গে শ্রমিক সংখ্যার কোন একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক নেই। কারণ, মোট জনসংখ্যার হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে শতকরা ১৫ এবং বোম্বাইএ ৫ জন লোক কাজ করে, অথচ মোট শ্রমিক সংখ্যার যথাক্রমে শতকরা ২৯ ও ২৩ জন এই দুই প্রদেশে পাওয়া যাবে। গত কয়েক বছরে অনুন্নত প্রদেশগুলি ও দেশীয় রাজ্যে শিল্পের প্রসার হবার একটা ঝোঁক দেখা যায়। এর ফলে এই সব স্থানের শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু শ্রমিকসংখ্যা বাংলায় বেশ খানিকটা এবং বোম্বাইয়ে কিছুটা কমে গেছে। নিম্নলিখিত সংখ্যা থেকে এদেশের শ্রমিক-সংখ্যা বিষয়ে একটা মোটামুটি আভাষ পাওয়া যাবে :—

প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য	১৯২১ সালে জনসংখ্যার শতকরা হিসাব	১৯২১ সালে শ্রমিক সংখ্যার শতকরা হিসাব	শ্রমিক সংখ্যা / জন সংখ্যা	১৯৪১ সালে জন সংখ্যার শতকরা হিসাব	১৯৩৯ সালে শ্রমিক সংখ্যার শতকরা হিসাব	শ্রমিক সংখ্যা / জন সংখ্যা
প্রদেশসমূহ, বেলুচিস্থান, আজমীর-মারওয়ারা এবং দিল্লী……	৭৬.৪	৯১.১	১.১৯	৭৬.০	৮৪.৯	১.১২
দেশীয় রাজ্য	২৩.৬	৮.৯	০.৩৭	২৪.০	১৪.১	০.৬৩
মোট	১০০.০	১০০.০	—	১০০.০	১০০.০	—

যে কোন দেশেই শ্রমিকদের সমস্যা এত জটিল যে তা নিয়ে আলোচনা করলে পৃথক গ্রন্থরচনা করা চলে। বর্তমান প্রসঙ্গে তাই এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। মোটামুটি ভাবে একথা বলা চলে যে, শ্রমিকদের দক্ষতা যেমন তাদের প্রকৃতিদত্ত এবং উপার্জিত ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে, তেমনই আবার মিল মালিকের তত্ত্বাবধান, কলকারখানার অবস্থা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। এদেশের শ্রমিকদের কতকগুলি দুর্বলতা থাকায় তাদের দক্ষতা বা কর্মশক্তি এমনিই কম। এর প্রধান কারণ হল এই যে, পাশ্চাত্য শ্রমিক বলতে যেমন একটি বিশেষ শ্রেণীর লোক বোঝায়, এদেশে সে অর্থে শ্রমিকশ্রেণী গড়ে উঠতে পারে নি, অবশ্য কানপুর বা আহমেদাবাদ প্রভৃতি দুএকটি কেন্দ্রের কথা বাদ দিয়ে। বোম্বাইতে যে সব শ্রমিক কাজ করে তাদের অধিকাংশই ঐ প্রদেশের বিভিন্ন জেলা হতে আমদানি হয়। কিন্তু কলকাতায় শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশী। এই কারণে অন্য জেলা বা প্রদেশের লোক স্থির ভাবে আপন কাজে লেগে থাকতে পারে না। এদের অনেকেরই আবার

জমি জমা আছে, গ্রাম দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটা যোগ আছে। তাই সুযোগ পেলেই এরা গ্রামে ফিরে যায়। শিল্পের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠতে পারে না। তাছাড়া, সুযোগসুবিধা অনুযায়ী এক একবার এক এক শিল্পে কাজ করায় কোন কাজেই এরা পটু হতে পারে না। শিল্প বিষয়ে শিক্ষাও এদের অধিকাংশেরই নেই। এ বিষয়ে ব্যবস্থাও এদেশে নেই বললেই চলে। নীচের সংখ্যা থেকেই এই উক্তির সত্যতা প্রকাশ পাবে।

পেশা ও শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ও তাতে ছাত্রসংখ্যা (১৯৪০-১)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
(ক) উচ্চশিক্ষা মূলক :—			(খ) প্রাথমিক শিক্ষা-মূলক :—		
শিক্ষকতা শিক্ষা	২৭	২৩০৫	শিক্ষকতা শিক্ষা	৬১২	৩১৩৩১
আইন	১৫	৬৪১০	চিকিৎসা	২৬	৫৮২৩
চিকিৎসা	১৪	৬২৫১	ইঞ্জিনিয়ারিং	১০	২০৩৯
ইঞ্জিনিয়ারিং	৭	২৩০৩	শিল্প বিজ্ঞান	৬৬০	৩৮৯৬৪
কৃষি	৬	১৬১৯	বাণিজ্য	৪২৮	১৪৭১৩
বাণিজ্য	৯	৬২৩১	কৃষি	১৮	৮৪৯
শিল্পবিজ্ঞান	২	৪০৬	কলা	১৭	২৯০১
অরণ্য	২	৫৫			
গো চিকিৎসা	৪	৭৬৭			
মোট	৮৬	২৬৩৪৭		১৭৭১	৯৫৯১৯

(ক) ও (খ) এর মোট প্রতিষ্ঠান সংখ্যা-১৮৫৭, ছাত্র সংখ্যা-১২২২৬৬

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৪০-৪০ সালে যখন পৃথিবীব্যাপী এক তোলপাড় চলেছে এবং এই যুদ্ধ-ব্যবস্থার মূলে রয়েছে শিল্প, সেই সময় এদেশের চল্লিশ কোটি নরনারীর জন্য মাত্র সাতটি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং দুটি শিল্পবিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এদেশে স্থাপিত হয়েছে, এবং তাতে যথাক্রমে মাত্র ২৩০৩ ও ৪০০ জন ছাত্র বিদ্যালাভ করেছে। এর চাইতে শোচনীয় অবস্থা আর কি হতে পারে? কোন দেশেই সমস্ত শ্রমিক প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় না। যখন রক্তের সঙ্গে এই শিক্ষার যোগ হয়ে যায়, তখন অবশ্য খানিকটা দক্ষতা এ ভাবে আসে। কিন্তু এর অধিকাংশই উপার্জিত। অথচ এদেশে এই শিক্ষা উপার্জনের ব্যবস্থাই বা কোথায়? তাই বলছি যে, শুধু একথা বললে চলবে না যে, এদেশে সুদক্ষ কারিগরের অভাব, অভাব যাতে দূর হয় সে ব্যবস্থা করবার প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের ও শিল্পপতিদের।

এবারে কাজের সম্বন্ধে দুএকটা কথা বলি। প্রাচ্যে শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত হ্যারোল্ড বাটলার বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের নিকট যে বিবরণ পেশ করেন তাতে ভারতীয় শ্রমিকের কাজের অবস্থা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন যে, আহমেদাবাদ এবং বোম্বাইএ এমন মিল বিরল নয় যেখানে একজন শ্রমিক দুই, চার বা ছয়টি তাঁত নিয়ে একই সময় কাজ করছে; এতে কম সময় কাজ করেও তারা বেশি পারিশ্রমিক রোজগার করতে পারে। এই ধরণের কারখানার মালিকেরা একথা অস্বীকার করছেন যে, শ্রমিকেরা কঠিন পরিশ্রম করতে বা বেশি টাকা রোজগার করতে চায় না। দু'একটি কারখানায় এত সুন্দর কাজ হয় যে, তারা ল্যাঙ্কাশিয়রের প্রায় সমকক্ষতা করতে পারে। টাটা কোম্পানীর কর্মনিপুণতা ইউরোপীয় অনেক কোম্পানীকেই হার মানাতে পারে। তাই বলছি যে, শ্রমিকের দক্ষতা অনেকখানি নির্ভর করে কাজের অবস্থা ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থার উপর। প্রথমে, শ্রমিক নিয়োগের কথাই বলা যাক। এ সম্বন্ধে অনেক প্রতিষ্ঠানের কোন সুসংযত নীতিই নেই। অনেক ক্ষেত্রে আবার নানারকম কুপ্রথা প্রচলিত আছে। এ সম্বন্ধে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের

উচিত একজন নির্দিষ্ট সুদক্ষ কর্মচারীর মারফতে শ্রমিক নিয়োগ করা। কর্তৃপক্ষকেও এবিষয়ে কড়া নজর রাখতে হবে। শ্রম-সময়ের নির্ধারণও একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। অনেক দিন পর্যন্ত শিল্প-পতিদের ধারণা ছিল যে, শ্রমিককে যতই বেশি খাটানো যাবে ততই তাদের লাভ। কিন্তু এ বিষয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে যে, একটি নির্দিষ্ট সময় পরিশ্রম করার পরও যদি শ্রমিকের কাছে কাজ আদায় করা যায় তাহলে কাজটি যেমন ভাল হবে না, সেই সঙ্গে শ্রমিকের পক্ষেও এর ফল হবে প্রতিকূল। এযে শুধু প্রাণীধর্ম তাই নয়, একথা যে কোন জিনিসের পক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য। শ্রম-সময় নির্ধারণের ঊর্ধ্বতন সীমার ন্যায় একটা নিম্নতন সীমাও রয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক যে, শ্রম-সময়ের নিম্নতন সীমা যতই কম হোক না কেন, শিল্প-প্রতিষ্ঠান লোকপরিবর্তন করে নিজের লাভটুকু ঠিকই তুলে নিতে পারবে। কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের কথা ভুললেত চলবে না। জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে তার যে পরিমাণ টাকা চাই সে পরিমাণ টাকা রোজগার করতে তার নির্দিষ্ট সময় কাজ করতেই হবে; কেননা, তার উৎপাদিকা শক্তি অনুসারে সে পারিশ্রমিক পাবে। তাই এই শ্রম-সময় নির্ধারণে একদিকে যেমন তার কর্মশক্তির কথা বিবেচনা করতে হবে, অন্যদিকে আবার তার জীবনযাত্রার মানের কথাও ভুললে চলবে না। আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হ'ল, কাজের অবস্থা নির্ধারণ করা। এর উপরই নির্ভর করবে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা। যে যায়গায় যে সব কলকব্জা নিয়ে তার সারা দিন কাজ করে জীবনপাত করতে হবে, সে যায়গায় কলকব্জার অবস্থা যদি সন্তোষজনক না হয়, তাহলে শ্রমিকের শ্রমশক্তি অল্পদিনেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। কাজের অবস্থা বলতে অনেক কিছুই বোঝায়, যেমন শৈত্যের পরিমাণ, আর্দ্রতা, গোলমাল, ধুলো, আলোবাতাস চলাচলের ব্যবস্থা, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য-রক্ষা-বিষয়ক ব্যবস্থা, প্রভৃতি। এদের যে কোনটি অবহেলা করলেই শ্রমিকদের কর্মশক্তির হানি অপরিহার্য। এদেশে বর্তমানে হচ্ছেও তাই। শ্রমশক্তির এই বিরাট অপচয়ে প্রতিবৎসর এদেশের বহু ক্ষতি হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের স্থির সিদ্ধান্ত

হলো এই যে, এই সব বিষয়ে যদি অবহিত হওয়া যায় তাহলে শুধু যে এই অপচয় নিবারণই হবে তাই নয়, সেই সঙ্গে শ্রমিকের কর্মদক্ষতাও কমপক্ষে শতকরা ২৫।৩০ ভাগ বাড়বে। উপরি উক্ত কোন কোন বিষয়ে সরকার আইন প্রণয়ন করেছেন, কিন্তু উপযুক্ত তদন্তের অভাবে এবং শিল্পপতিদের ঔদাসীন্যের জন্য এই অপচয় আজও নিবারণ করা গেল না। কাজের অবস্থা বলতে আরও একটি জিনিষ বোঝায়; সেটি হলো আসল কর্ম-পদ্ধতি এবং এটি নির্ভর করে কলকব্জা ও তার পরিচালকবর্গের উপর। কলকব্জা শুধু আধুনিক প্রণালীতে নির্মিত হলেই হবে না; এগুলি এমন হওয়া চাই এবং এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই যে, শ্রমিকের কাজ করতে অসুবিধা না হয়। আমাদের দেশের প্রায় শিল্প প্রতিষ্ঠানেই এই দুই অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। শিল্প বিজ্ঞানের উৎকর্ষ এদেশে না হওয়ায় এই সব অসুবিধা বহন করেই কাজ করতে হয়। এই কারণে বিজ্ঞানের গবেষণার সঙ্গে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির যোগাযোগ স্থাপন করা উচিত। এবিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ উৎকর্ষ সাধিত হলেই অনেক অপচয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। কলকব্জার উপরই কাজের অবস্থা ষোল আনা নির্ভর করে না, কলকব্জার ব্যবহার যারা করে সেই সব শ্রমিকের উপরও কাজের অবস্থা নির্ভর করে। শ্রমিকের দক্ষতা বিষয়ে উপরে যা বলা হ'ল তা হচ্ছে তার প্রকৃতিদত্ত বা স্বোপার্জিত। এ ছাড়াও এই দক্ষতার আর একটি দিক আছে—সেটি শিল্পের সঙ্গে জড়িত। আমি শিল্প মনস্তত্ত্বের কথা বলছি। শিল্প মনস্তত্ত্বের বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে কর্ম নির্বাচন, কাল ও গতি নিরীক্ষণ, শ্রমসময়ের স্থিরীকরণ প্রভৃতি অন্যতম। অবশ্য এসব বিষয়ে আজও কোন চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর হয় নি। শিল্পবিষয়ে প্রগতিশীল দেশগুলিতে আজও এ নিয়ে গবেষণা চলছে। এই সব গবেষণার ফলাফল আমরা ব্যবহার করবো বটে, তবে স্থান ও কালের পার্থক্য অনুসারে এদের উপযোগী করে নেবার এবং এদেশের যে সব বিশেষ সমস্যা রয়েছে সে সব সমস্যা নিয়ে অন্তত গবেষণা করবার প্রয়োজন আছে।

উপরিউক্ত বিষয় গুলি নিয়ে বিবেচনা করতে হবে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে।

কিন্তু কোন কোন বিষয়ে দেশজোড়া সাদৃশ্য বজায় রাখার জন্য এবং মোটামুটি সীমা চৌহদ্দী নির্ধারণ করে দেবার জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থাকেও এগিয়ে আসতে হবে। এ পর্যন্ত শ্রম প্রভৃতি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণমুলক কিছু কিছু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু এখনও অনেক বিষয়ে অভাব রয়ে গেছে। শ্রমিক সংঘ বিষয়ক সুব্যবস্থা, শিল্প জগতে শ্রমিক-ধনিক সংঘর্ষের অবসান, সামাজিক বীমা, প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার লক্ষ্য করতে হবে।

এইবার আমরা শিল্পপ্রসারে প্রয়োজন পুঁজির বিষয়ে দুএক কথা বলেই বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করবো। পরিকল্পনার চেহারা যাই হোক না কেন এবং এর পেছনে যে কোন আদর্শবাদের সমর্থনই থাকুক না কেন, একে সফল করতে হলেই পুঁজি চাই। বোম্বাই পরিকল্পনার কথাই ধরা যাক না কেন। এতে কৃষির যে পরিমাণ বিস্তারের কথা বলা হয়েছে তাতে, শিল্পপতিদের অনুমান অনুসারে, স্থায়ী খরচ পড়বে প্রায় ৮৪৫ কোটি টাকা, এবং পৌনঃপুনিক বার্ষিক খরচ পড়বে ৪০০ কোটি টাকা। শিল্পে স্থায়ী খরচ পড়বে ৪৪৮০ কোটি টাকা, যানবাহনাদিতে স্থায়ী ৮৯৭ কোটি টাকা, এবং পৌনঃপুনিক ৪৯ কোটি টাকা। শিক্ষায় স্থায়ী ২৬৭ কোটি টাকা এবং পৌনঃপুনিক ২৩৭ কোটি টাকা, স্বাস্থ্যে স্থায়ী ২৮১ কোটি টাকা, এবং পৌনঃপুনিক ১৮৫ কোটি টাকা, গৃহনির্মাণে স্থায়ী ২২০০ কোটি টাকা এবং পৌনঃ পুনিক ৩১৮ কোটি টাকা, এবং অন্যান্য বিষয়ে স্থায়ী ২০০ কোটি টাকা। এই ভাবে, নিম্নোক্ত প্রকারে মোট দশ হাজার কোটি টাকা খরচ পড়বে :

(কোটি টাকায়)

শিল্প	....	৪৪৮০
কৃষি	....	১২৪০
যানবাহন	....	৯৪০
শিক্ষা	....	৪৯০
স্বাস্থ্য	....	৪৫০

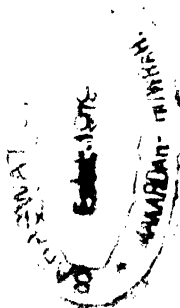
গৃহনির্মাণ	....	২২০০
বিবিধ	....	২০০
	মোট	১০,০০০

কিন্তু এই পুঁজি আসবে কোথা থেকে? বোম্বাইয়ের শিল্পপতিরাও এবিষয়ে মোটামুটি একটা আভাস দিয়েছেন। এই পুঁজির প্রায় তিনচতুর্থাংশই এদেশে জোগাড় করতে হবে। এ দেশের জনসাধারণের কাছে লুকানো বা পোঁতা প্রায় ১০০০ কোটি টাকা আছে। যথেষ্ট লাভের প্রলোভনে এই গচ্ছিত টাকার অন্তত এক তৃতীয়াংশ আর্থিক ব্যবস্থায় খাটবার জন্য এগিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়। এই ভাবে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। জনসাধারণের সঞ্চয় প্রায় ৪০০০ কোটি টাকাও পরিকল্পনার কাজে পাওয়া যাবে। এই টাকাটি লুকানো নয়; এ হলো সত্যিকারের সঞ্চয়। আধুনিকতম কেইনসীয় মতবাদ অনুসারে সঞ্চয় যদি পুঁজিনিয়োগের সমানই হয়, তাহলে একথা বলা চলে যে, এই মোট টাকাই আর্থিক উন্নতিকল্পে পাওয়া যাবে। এর পর থাকল আমাদের স্টার্লিং সম্পদ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগে এই সম্পদ বিলেতে আমাদের হিসাবে জমা আছে। এথেকে প্রায় হাজার কোটি টাকা পাওয়া যাবে। সাধারণ সময়ে বহির্বাণিজ্যে আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি হওয়ায় পনেরো বছরে আমাদের প্রায় ৬০০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে বলে অনুমান করা যায়। এই ভাবে মোট ৫৯০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু উপরিউক্ত পরিকল্পনায় লাগবে দশ হাজার কোটি টাকা বাকি টাকার কি ব্যবস্থা হবে? শিল্পপতিদের পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, বাকি ৪১০০ কোটি টাকার মধ্যে ৭০০ কোটি টাকার বিদেশী ঋণ গ্রহণ করতে হবে এবং ৩৪০০ কোটি টাকা পরিমাণ নূতন মুদ্রা সৃষ্টি করে আর্থিক ব্যবস্থায় ঢেলে দিতে হবে। এই ভাবে ১০,০০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে।

আপাতদৃষ্টিতে উপরের হিসাব বেশ নিখুঁত বলেই মনে হবে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, উপরের মোট টাকা ওভাবে পাওয়া

যাবে না। প্রথমেই বলি আমাদের গচ্ছিত স্টার্লিং মুদ্রার ভবিষ্যতের কথা। মার্কিন দেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডা যুদ্ধ চালু থাকা কালেই আপন কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। এককালে ইংলণ্ড নানাভাবে এ সব দেশে যে পুঁজি খাটিয়েছিল, এই টাকায় সে সব শিল্প বাণিজ্য এরা খালাস করে নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসেছে। এদেশেও ইংলণ্ডের বহু টাকা খাটছে। এই টাকার সঠিক হিসাব আজও দেওয়া কঠিন। ১৯১৪ সালে এই পুঁজির পরিমাণ নাকি ২৯৮ মিলিয়ন পাউণ্ড ছিল। ১৯৩২-৩৩ সালে এই পরিমাণ ৮৩১ মিলিয়ন পাউণ্ড হয়। ১৯৩০ সালে বিলিতি পত্রিকা ফিনানসিয়াল টাইমসের অনুমান অনুসারে এই পুঁজির পরিমাণ ৭০০ মিলিয়ন পাউণ্ড ছিল। ব্রিটীশ অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের হিসাব অনুসারে ভারত সরকারের বিদেশী ঋণ সহ এই পুঁজির পরিমান প্রায় ১০০০ মিলিয়ন পাউণ্ড। দ্বিতীয় মহাসমরের প্রারম্ভ কালে ভারত সরকারের ঋণ বাদেও এদেশে নিম্নলিখিত পরিমাণ বিদেশী পুঁজি বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায় খাটানো হচ্ছিল :—

		পাউণ্ড
রেল ও ট্রাম কোম্পানী	....	২৩,০০০,০০০
অন্যান্য যানবাহন	....	১২,০০০,০০০
চা বাগান	....	২৬,৭০০,০০০
অন্যান্য আবাদ	....	২,৫০০,০০০
কয়লা খনন	....	২৪০,০০০
অন্যান্য খনিজ পদার্থ খনন	....	১১০,৮০০,০০০
বস্ত্রবয়ন	....	২৭০,০০০
পাট	....	৩,২৯০,০০০
তুলার বীজ নিষ্কাশন, চাপ প্রয়োগ ও গাঁইট বাঁধা প্রভৃতি কাজ	....	১৫০,০০০
জমিদারী, ইমারত, প্রভৃতি	....	৩৪০,০০০



শর্করা	....	৩,০০০,০০০
অন্যান্য যৌথ কারবার	....	৭,২৯০,০০০
মোট		১৮৬,৮৮০,০০০
ব্যাঙ্ক এবং ঋণদানের অন্য প্রতিষ্ঠান	....	৯৬,২৫০,০০০
বীমা	....	৭৮,১২০,০০০
পোত	....	৩৫,৫১০,০০০
ব্যবসায়	....	৩৪৪,৩৭০,০০০
মোট		৭৪১,১৩০,০০০

এ দেনা আজও রয়ে গেছে। অথচ আমাদের ষ্টার্লিংএর ভবিষ্যৎ আজও অনিশ্চিত। উপরের দেনাও যদি শোধ হ'ত তাহলেও আমরা একথা বলতে পারতাম যে, আজ আমরা আর্থিক বিষয়ে সম্পূর্ণ নিজের পুঁজির উপর নির্ভর করছি। অথবা, এই স্টার্লিং দিয়ে যদি আমরা উৎপাদন উপকরণ ক্রয় করে নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করতে পারতাম, তাহলেও কাজ হ'ত। এ দু'য়ের কোনটাই এখনও সম্ভবপর হয়নি। কিছুদিন আগে তদানীন্তন বৃটিশ অর্থ-সচিব ডাঃ ডল্টন বলেছিলেন যে, ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সুস্থির হলেই ভারতের যে স্টার্লিং সঞ্চিত আছে সে সম্বন্ধে কথাবার্তা আরম্ভ করা হবে। স্বাধীন ভারতের কর্ণধারদের এবিষয়ে শীঘ্রই আলাপ আলোচনা শুরু করতে হবে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই স্টার্লিংএর কতখানি আমাদের আর্থিক উন্নতির কাজে লাগতে পারবে তা কিছুতেই বলা যায় না। বহির্বানিজ্য থেকে যে-পরিমাণ টাকা উদ্বৃত্ত হবে বলে বোম্বাইএর শিল্পপতিরা আশা করেছেন সে সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট কিছু বলা যায় না। ভবিষ্যৎ বহির্বাণিজ্যের চেহারা কি দাঁড়াবে তা নির্ভর করবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর। কিছুদিন থেকে আন্তর্জাতিক

পরিস্থিতি যেমন ঘোরালো হয়ে উঠেছে এবং প্রত্যেকটি দেশ যেভাবে ভাবী মহাসমরের আশঙ্কায় ভীত হয়ে সর্বপ্রকার সরবরাহ বিষয়ে স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করছে তাতে এই সহযোগিতা যে ষোলআনা ফিরে আসবে না তা'ও বেশ বোঝা যাচ্ছে। আর একটি বিষয় হ'ল এই যে, ভারতীয় সামগ্রীর মোটারকমের বাজার বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে, বিশেষ করে ইউরোপ ও জাপানে। অথচ এই সব দেশের আর্থিক পরিস্থিতি এত বিশৃঙ্খল যে, এরা কতদিনে সাবেক পরিমাণ কাঁচা মাল নিতে পারবে তার ঠিক নেই। এইসব কারণে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা কঠিন যে, বহির্বাণিজ্য থেকে আমরা কত টাকা আমাদের আর্থিক উন্নতির জন্য পেতে পারবো। বাকি থাকলো লুকোনো টাকা, বিদেশী ঋণ, সঞ্চয় ও মুদ্রাস্ফীতি। এই চারটির মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি ও বিদেশী ঋণ পরস্পর বিরোধী। কারণ মুদ্রাস্ফীতির স্বাভাবিক পরিণতিই হ'ল এই যে, আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দেশের সম্ভ্রম হ্রাস পায়। তাই যদি হয়, তাহলে আমাদের পক্ষে বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণও অসম্ভব বা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে মুদ্রার ক্রয়শক্তি কমে গেলে বিদেশীয়েরা নিজেদের পুঁজি এদেশে খাটাতে চাইবে কেন? অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, ঋণ আমরা একেবারেই পাবোনা বা কিছু স্টার্লিংএর বিনিময়ে কিছু সামগ্রী আমরা বিদেশ থেকে আন্‌তে পারবো না। তবে মোটের উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে আমাদের অতীত ও বর্তমান সঞ্চয় ও মুদ্রানীতির উপর। সঞ্চিত পুঁজি যদি আর্থিক ব্যবস্থায় খাটাতে হয় তাহলে তার জন্য পুঁজিপতিদের সামনে যথেষ্ট প্রলোভন দিতে হবে এবং সেইভাবে রাজস্বনীতির প্রবর্তন করতে হবে। এবিষয়ে পরে দু'এক কথা বলব। মুদ্রাস্ফীতির কথা যে বললাম তাতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, মুদ্রার স্ফীতি মাত্রেই অনিষ্টকর নয়। মুদ্রাস্ফীতি বিষয়ে এদেশ বা অন্য দেশের যে অভিজ্ঞতা আছে তাতে অবশ্য চাঞ্চল্যের কারণ রয়ে গেছে। কিন্তু আমরা যে উদ্দেশ্যে মুদ্রাস্ফীতিকে সমর্থন করছি তার সঙ্গে এইসব মুদ্রাস্ফীতির আকাশপাতাল পার্থক্য রয়ে

গেছে। মুদ্রাস্ফীতি বলতে সাধারণত যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির কথাই মনে আসে, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির পেছনে চলছে ধ্বংসমূলক কাজ, গঠনমূলক নয়; মুদ্রা বাড়ছে, ক্রয়শক্তিও বাড়ছে অথচ সামগ্রীর পরিমাণ দিন দিনই কমছে। কিন্তু আমরা যে মুদ্রানীতির কথা বলছি তাতে গঠনমূলক কাজকেই সমর্থন করা হচ্ছে। এতে সামগ্রীর পরিমাণ বাড়তে থাকবে। ফলে, শেষ পর্যন্ত আবার সামগ্রীমূল্য সুস্থির হতে বাধ্য। দশটি সামগ্রী কিনবার জন্য যদি বাজারে দশটি টাকা থাকে তাহলে যেমন সামগ্রী প্রতি মূল্য হবে এক টাকা, কুড়িটি সামগ্রী ও কুড়িটি টাকা থাকলেও এর ব্যতিক্রম হবে না; কিন্তু কুড়িটি টাকা যদি দশ বা পাঁচটি সামগ্রী ক্রয় করবার কাজে ব্যয় হয় তাহলে সামগ্রী মূল্য দ্বিগুণ বা চারগুণ হয়ে যাবে। তাই বলছি যে, আর্থিক ব্যবস্থা যখন এগিয়ে চলেছে তখন মুদ্রাস্ফীতিতে অনিষ্ট হবে না, যদি বা হয় তাহলে তা ক্ষণস্থায়ী হবে। অবশ্য, মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রীর পরিমাণ বাড়বে না, এবং যখন সামগ্রীর পরিমাণ বাড়বে তখনও ঠিক মুদ্রাস্ফীতির অনুপাতে বাড়বে না। আজ যে পুঁজি খাটানো হ'ল, শিল্পভেদে বিভিন্ন কাল ব্যবধানে তার প্রতিক্রিয়া আর্থিক ব্যবস্থায় দেখা যাবে। এই পুঁজির মোট-পরিমাণও আর্থিক ব্যবস্থায় থাকে না; কিছু ভোগ-ব্যবহারে, কিছু সঞ্চয় বা অন্যভাবে ব্যয় হয়ে যায়। এইভাবে মুদ্রাস্ফীতির ফলে সাময়িক ব্যতিক্রম অপরিহার্য হয়ে উঠে। কিন্তু কিছু দিনেই যখন আর্থিক ব্যবস্থার যথেষ্ট প্রসার হয় এবং সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন এই ব্যতিক্রম অন্তর্হিত হয়, আর্থিক ব্যবস্থারও শ্রীবৃদ্ধি হয়। তাই বলছি যে, মুদ্রাস্ফীতি ও অতীত এবং বাৎসরিক সঞ্চয়ের উপরই আমাদের অনেকখানি নির্ভর করতে হবে। মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ যাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত না হয় এবং ধাপে ধাপে যাতে এ কাজ হয় তার জন্য উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও সংখ্যা সংগ্রহ করতে হবে। তাহলেই আমাদের পুঁজি বিষয়ক সমস্যার অনেকখানি সমাধান হতে পারবে।

(৭) বাণিজ্যনীতি ও মুদ্রাবিনিময় হারের ভবিষ্যত

এবারে আমরা বাণিজ্যনীতি বিষয়ে আলোচনা করব। বাণিজ্য বলতে আমরা এখানে বহির্বাণিজ্যই বুঝবো। সাধারণভাবে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যই হ'ল সামগ্রীর আদানপ্রদান। যে সামগ্রী এদেশের চাই অথচ এদেশে আদৌ উৎপন্ন হতে পারে না বা অল্প ব্যয়ে উৎপাদন করা চলে না সেইসব সামগ্রী এদেশের ব্যবহারাতিরিক্ত সামগ্রীর বিনিময়ে বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর বহির্বাণিজ্যে ইংলণ্ডেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল। জার্মান বণিক তখন সবে পৃথিবীর বাজারে আনাগোনা শুরু করেছিল। মার্কিন-দেশ ও জাপান তখনও নিজের নিজের শিল্পবিস্তার নিয়েই ব্যস্ত। এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতির গোড়ার কথা ছিল 'যাহচ্ছে হতে দাও' নীতি। ইংলণ্ড সেই নীতি অনুসরণ করে সারা পৃথিবীর বাজার জুড়ে বসল অথচ বিদেশী সরকার ভারতে সেই একই নীতি অনুসরণ করে এদেশের শিল্প ও বাণিজ্য একেবারে ধ্বংস করেছে। এদেশে বিলিতি সামগ্রী বিক্রি করা ছাড়া ভারতের বিদেশী সরকারের কোন নীতিই ছিল না। মুদ্রাবিনিময় হার বিষয়েও ঠিক একই প্রকার ঔদাসীন্য দেখা গেছে। এই ঔদাসীন্য আজও চলেছে। গত শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্যন্ত সোনা ও রূপার বিনিময় হার মোটামুটি সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ় ছিল। এমনকি, তার আগে প্রায় দু'শ বছর ধরে এই দুই ধাতুর বিনিময় হারের সর্বাপেক্ষা অধিক তারতম্য যদি হয়ে থাকে তাহ'লে তা কোন সময়ই শতকরা তিন ভাগের বেশী হয় নি। কিন্তু গত শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই স্বর্ণ মুদ্রার ব্যবহার আরম্ভ করায় রূপার কদর কমে যায়; ফলে, রূপার মূল্য পর পর ত্রিশ বছরে অধেক দাঁড়িয়ে যায়। এদেশে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত থাকায় টাকার ক্রয়শক্তি প্রায় আট আনা হয়ে পড়ল। কেউ কেউ একথা বলে থাকেন যে, টাকার মূল্য হ্রাস হওয়ায় ভারতের বহির্বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধা হয়েছিল। যুক্তিটি কিন্তু তখনই মাত্র ঠিক যখন টাকার মূল্য-হ্রাস, হয় কোন পূর্ব নির্দিষ্ট নীতি

অনুসারে ঘটছে, নয়ত এই হ্রাস ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক পূর্বেই অনুমিত হচ্ছে। কিন্তু টাকার মূল্য-হ্রাসের যে প্রসঙ্গ আমরা উত্থাপন করেছি তাতে উপরের দুই বিষয়েরই অভাব ছিল। এর পেছনে সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি ত ছিলই না, ব্যবসায়ীগণও এই পরিবর্তন অনুমান করতে পারে নি। ফলে, তারা এই মূল্য হ্রাসের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে নি; এবং আকস্মিক ব্যাপক পরিবর্তনে তাদের অনেককেই সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকে প্রথম মহাসমরের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত টাকা-স্টার্লিং বিনিময়-হার মোটের উপর সুস্থির ছিল। অতএব সরকারের তরফ থেকে কোন সুনির্দিষ্ট বাণিজ্যনীতি না থাকলেও ব্যবসায়ীরা আমদানী রপ্তানীর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। মুদ্রা বিনিময়-হারের অনিশ্চয়তা দূর হওয়ায় বিদেশী পুঁজিও এদেশে আসতে শুরু করে। কেবলমাত্র রূপার মূল্য স্থির না থাকায় চীনদেশের সঙ্গে আমাদের যে বাণিজ্য ছিল তা চিরকালের জন্য বন্ধ হ'ল। যদিও যুদ্ধের সময় মুদ্রা ব্যবস্থা ঠিকমত কাজ করতে পারছিল না তবুও সরকারী ব্যবস্থায় একে অনেকখানি কার্যোপযোগী রাখা হয়। তবে বহির্বাণিজ্য নিয়ে যাদের কারবার ছিল তাদের নানা কারণে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। বহির্বাণিজ্যের গতি-নিয়ন্ত্রণ ও কাউন্সিল বিলের বিক্রয় কমিয়ে দেওয়ায় বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতিতে বিঘ্ন উপস্থিত হ'ল। কিন্তু সব চেয়ে দুর্দিন এলো মহাসমরের অবসানে। ১৯১৯ সালে মার্কিন দেশ রৌপ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে নেওয়ায় রূপার মূল্য আরও বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে ডলার-স্টার্লিং সংযোগের বিচ্ছেদ হওয়ায় স্টার্লিং এর মূল্য হ্রাস হয়। এই দুই কারণে টাকা-স্টার্লিং বিনিময়-হার বাড়তেই থাকে এবং ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই বিনিময় হার ১৲ টাকা= ২ শিলিং ৪ পেন্স হয়। এর ফলে একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলো বহির্বাণিজ্যে পুঁজি খাটাতে অস্বীকার করে বসল। এদেশ থেকে মাল রপ্তানি প্রায় বন্ধই হল। ধীরে ধীরে এর প্রতিক্রিয়া বিদেশী মাল আমদানীর উপরও গিয়ে পড়ল। এর কিছুদিনের মধ্যেই সরকার দেশী বিদেশী মুদ্রা বিনিময়-হারের সুস্থিরতা বজায়

রাখা বিষয়ে তাঁদের অসামর্থ্য ঘোষণা করায় অনিশ্চয়তার মাত্রা বাড়লো বৈ কমলো না। এদেশে নূতন ও পুরোনো শিল্পের পক্ষে ভয়ানক দুর্দিনের সূত্র-পাত হ'ল। সেই সঙ্গে বাড়ল বিদেশী প্রতিযোগিতা। সর্বোপরি জাপান, ইতালি, প্রভৃতি দেশের মুদ্রার মূল্য হ্রাস হওয়ায় ঘরে বাইরে সর্বত্রই এরা ভারতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলো। সরকার এই সময় উদাসীন হয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন।

প্রথম মহাসমরের পর ইংলণ্ড আবার আপন যুদ্ধ-পূর্ব আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তৎপর হয়ে উঠলো। পাউণ্ডের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বিদেশী মুদ্রা বা স্বর্ণের সঙ্গে পাউণ্ডের বিনিময় হার নানা অসুবিধা সত্ত্বেও অপরি-বর্তিত রাখা হ'ল। বিশ্বরাষ্ট্র সংঘও এ বিষয়ে নানা যুক্তি দেখিয়ে প্রচারকার্য আরম্ভ করলেন। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালীন আর্থিক পরিস্থিতি এঁরা বুঝতে পারেননি। যুদ্ধের পর সব দেশই স্বাবলম্বী হবার প্রয়াস করতে থাকে; তাছাড়া মার্কিন দেশ ও জাপানের অভ্যুদয়ে ক্ষীয়মান পৃথিবীর বাজারে ইংলণ্ডের একচেটিয়া প্রভুত্ব অসম্ভব হয়ে উঠে। তদুপরি পাউণ্ডের সঙ্গে বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার বেশী থাকায় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও বৃটিশ উৎপাদকদের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ফল হল এই যে, যুদ্ধোত্তর কালের আর্থিক আবহাওয়ায় যুগান্তকারী পরিবর্তন হওয়ায় অবাধ বাণিজ্য অসম্ভব হয়ে উঠে। ১৯২৯ সালে জেনেভায় এক অর্থনৈতিক বৈঠক হয় তাতে একথা পরিষ্কার ভাবে স্বীকার করা হয় যে, অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রাবল্যে অবাধবাণিজ্য প্রায় কোণঠাসাই হয়ে এসেছে। পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত মূলক যে নীতি ঘোষিত হ'ল তাতেই অবাধ বাণিজ্যের পুরোপুরি অবসান সূচিত হয়।

বাণিজ্য নীতি বিষয়ে গৌরচন্দ্রিকা করতে গিয়ে এতগুলো বলে ফেলবার কারণ হ'ল এই যে, আজও এদেশে যাঁরা অবাধ বাণিজ্যের স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা এক মস্ত মরীচিকার অনুসরণ করে চলেছেন। একথা অবশ্য ঠিক যে, পৃথিবীর

সমস্ত দেশের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। কিন্তু একে বর্তমান পরিস্থিতিতে কখনই মুখ্য অংশ দেওয়া চলবে না। তাছাড়া আরও একটা কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশের যা আর্থিক পরিস্থিতি তাতে আমরা নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে থাকতে পারি। ইংলণ্ড বা জাপানের যা অবস্থা তাতে তাদের পূর্ণ নিয়োগের জন্য বহির্বাণিজ্য অপরিহার্য। মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া বা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। এই সব দেশের কৃষি ও খনিজ সম্পদ এত বেশী যে তাতে আমরা শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামালই দেশ থেকেই সরবরাহ হতে পারে। আবার এই সব দেশের বাজারও সুবিস্তৃত। তাই এই সব দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় বর্হি-বাণিজ্য সামান্য অংশই গ্রহণ করে। আমাদের আর্থিক নীতির প্রধান লক্ষ্যই এই যে, যে-সামগ্রীর সরবরাহ বিষয়ে আমরা আজও বিদেশের উপর নির্ভর করে থাকি সেই সব সামগ্রী এদেশে কি ভাবে উৎপাদন করা যায়। এই ভাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দিকে যদি আমরা অগ্রসর হতে থাকি তাহলে অনেক সামগ্রী যেমন আমাদের বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে না, অনেক সামগ্রী তেমনি আবার বিদেশে পাঠাবার প্রয়োজনও হবে না। পৃথিবীর প্রত্যেক স্বাধীন দেশই আজ এইভাবে অগ্রসর হচ্ছে ; স্বাধীন ভারতও ঘুমিয়ে থাকবে না।

আর একটি বিষয়ে স্বাধীন ভারতকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। একটু আগেই বললাম যে, ভারতে বহু বিদেশী টাকা খাটছে। ভারতের বিদেশী সরকার আইন প্রণয়ন করে এই সব বিদেশী স্বার্থ সংরক্ষণ করে আসছেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে ভারতে বিদেশী টাকা স্বচ্ছন্দে খাটতে পারে, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অন্যায় প্রতিযোগিতা করে ভারতীয় স্বার্থে ঘা দিতে পারে ; কিন্তু ভারতীয় পুঁজিপতিরা বিদেশে বানিজ্য করতে পারেন না বা শিল্পপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। বিদেশ বলতে আমি শুধু ইংলণ্ডকেই লক্ষ্য করছি না ; এতে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই রয়েছে। পৃথিবীর প্রায় দেশেরই ব্যাঙ্ক ও বীমা কারবারীরা এদেশে

কাজ করেছে, এদেশের মাল সমুদ্র পথে বহন করছে, বিদেশ থেকে সামগ্রী আমদানী করছে, এদেশের শিল্পে পুঁজি খাটিয়ে মুনাফা টেনে নিচ্ছে। এই যে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ-এর অবসান ঘটাতেই হবে। একথা সবারই জানা আছে যে, শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে, বিশেষ করে প্রথম মহাসমরের পর সাম্রাজ্য-বাদের চেহারা বদলে গেছে। একদেশের উপর অন্য দেশের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব থাকলেই যে সামাজ্যবাদ হয় তা নয়; রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অভাবেও সামাজ্য বাদ হতে পারে এবং এই সামাজ্যবাদই নিকৃষ্টতম। চীনদেশে বৃটেন ও আমেরিকার টাকা খাটছে, চীন ও ভারতে বিদেশী উৎপাদন-উপকরণ আসছে, এই সব দেশ থেকে কাঁচা মাল বিদেশে যাচ্ছে, বিদেশী কারবারীরা এই সব দেশে নানা ভাবে শিল্প বাণিজ্যের মুনাফা খাচ্ছে। এই সব সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন রূপ। আজ এদেশে দারিদ্র্য চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্নভাবে কাজ করে বর্তমান অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী। স্বাধীন ভারতকে এদায় থেকে অব্যাহতি পেতেই হবে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা একালপর্যন্ত আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ধূয়া ধরে আসছেন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে এই যুক্তি দিয়ে সমর্থনও করা হয়েছে। কিন্তু যে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ আর্থিক সাম্রাজ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাতে শ্রমবিভাগের সুযোগ টুকুও নেই। ভারত রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করতে পারে, জাহাজ ও বিমান তৈরী করতে পারে, উৎপাদন-উপকরণ শিল্প এদেশেও গড়ে উঠতে পারে। সুদক্ষ কারিকরের অভাব হবে বটে, কিন্তু কোন দেশেই আগে কারিকর তৈরী করে তারপর শিল্প প্রসারে অগ্রসর হয় না। শিল্প-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কারিকরদের সংখ্যা বাড়তে থাকে, তাদের শিক্ষারও সুযোগ হয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের আর্থিক প্রগতির সব চেয়ে বড় অন্তরায় হ'ল বিদেশী শক্তির আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ। স্বাধীন ভারতে এই সব বিদেশীয়দের প্রভুত্বের অবসান ঘটাতেই হবে। যারা এদেশে থাকবে তাদের এদেশবাসীর স্বার্থের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে; তার প্রতিকূলাচরণ করলে চলবে না। এছাড়া যে সব দেশ এদেশে ব্যবসার বাণিজ্য করতে

বা পুঁজি খাটাতে চায় তাদেরও এদেশবাসীকে অনুরূপ সুযোগসুবিধা দিতে হবে।

কোন দেশের বাহির্বাণিজ্যের সঙ্গে দেশী-বিদেশী মুদ্রাবিনিময়-হারের একটা বিশেষ সম্পর্ক থাকে। একটু আগেই বলছিলাম যে. এই বিনিময়-হার বিষয়ে এদেশের বিদেশী সরকারের কোন সুস্পষ্ট নীতি না থাকায় এবং প্রথম মহাসমরের পরে বিদেশী ঔদাসীন্যের ফলে এ দেশের বহির্বাণিজ্যে সমূহ ক্ষতি হয়েছে। অবশেষে সরকার যখন ব্যবস্থা গ্রহণে স্বীকৃত হলেন তখন তাঁদের সেই ব্যবস্থা এদেশের বণিক-সম্প্রদায়ের মনঃপূত হল না। তাঁরা বললেন যে, এদেশ ১৮৯৮ সাল থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ১ টাকা = ১ শিলিং ৪ পেন্স বিনিময় হারের সঙ্গে পরিচিত এবং এই দেশের আর্থিক ব্যবস্থাও এই হারের সঙ্গে সঙ্গে থাপ খাইয়ে নিয়েছে। এই অবস্থায় ১ টাকা = ১ শিলিং ৬ পেন্স করায় এদেশের আর্থিক পরিস্থিতিতে একটা গোলযোগ উপস্থিত হবে। এবং এতে বিদেশীদের ১২½% সুবিধা হয়ে যাবে। আগে একটাকায় পাওয়া যেত ১ শিলিং ৪ পেন্সের সমান মাল; এখন পাওয়া যাবে ১ শিলিং ৬ পেন্সের সমান। টাকার মুল্য বাড়লো, তার ফলে বিদেশী মাল স্বচ্ছন্দে এদেশে আসতে পারবে অথচ ভারতীয় মাল সহজে বিদেশে যাবে না। উভয় দেশের উৎপাদন খরচা ও যানবাহন বিষয়ক খরচা যদি এক হয় তবুও বিদেশী সামগ্রী কেবল মাত্র টাকার বহির্মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতেই সুবিধা পাবে শতকরা ১২½ এবং এদেশের সামগ্রী বিদেশে ঐ পরিমাণ অসুবিধা ভোগ করবে। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হল এই যে, যখন বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্কটের করাল ছায়ায় পৃথিবী ব্যাপ্ত হয়েছে এবং পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ উৎপাদন-ব্যয় কমাতে অসমর্থ হয়ে মুদ্রার বহির্মূল্য কমিয়ে বিদেশী বাজারে প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াস করছে, ঠিক সেই সময় এদেশের বিদেশী সরকার জনমত উপেক্ষা করে এদেশের আর্থিক স্বার্থের বিরুদ্ধে টাকা-স্টার্লিং বিনিময়-হার বাড়িয়ে দিলেন। এমনিই কৃষিপ্রধান দেশে মন্দার প্রভাব সব চেয়ে বেশী হয়; তার উপর এলো প্রতিকূল মুদ্রানীতি।

ফলে অন্যান্য দেশে অল্পদিনেই তেজির সূত্রপাত হওয়া সত্ত্বেও ভারত যে তিমিরে সে তিমিরেই রইল। ১৯৪১সাল পর্যন্ত এদেশের আর্থিক ব্যবস্থা থেকে মন্দার প্রভুত্বকে কিছুতেই হটানো গেল না।

দ্বিতীয় মহাসমরের ফলে আবার প্রত্যেকটি দেশের আর্থিক পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রম হয়েছে; ভারতেও বটে। এই ব্যতিক্রমের প্রধান কারণই হ'ল এই যে, প্রত্যেক দেশেই উৎপাদন-ব্যয় কম বা বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ এটা সহসা কমিয়ে ফেলবার ও কোন উপায় নেই। এই অবস্থা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য প্রায় দেশেই আপন আপন প্রয়োজন অনুযায়ী মুদ্রার মূল্য কমিয়ে ফেলতে চাইবে। একথা অবশ্য সত্য যে, স্বয়ং-সম্পূর্ণ আর্থিক ব্যবস্থায় এ জাতীয় কোন প্রয়োজনেরই অবসর ঘটে না; কিন্তু পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা যতই আর্থিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতার কথা বলি না কেন, বহির্বাণিজ্যকে একেবারে বাদ দেওয়া যাবে না। আর্থিক জাতীয়তাবাদের চরম সীমায় যে সব দেশ পৌঁছেছে তারাও ষোল আনা স্বাবলম্বী নয়। আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যদি একবারে বাদ দেওয়া না যায়, তাহলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে টিকতে হবে এবং তার জন্য হয় উৎপাদন খরচা কমাতে হবে, না হয় মুদ্রার মূল্য-হ্রাস করতে হবে। এই মাত্র বললাম যে, প্রথম উপায়টি অবলম্বন করা সহজ সাধ্য নয়। অতএব প্রত্যেকটি দেশেই মুদ্রার মূল্য-হ্রাস করে ফেলতে চাইবে। এবিষয়ে আমাদেরও নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবে না। একথা মনে রাখতে হবে যে, আলোচ্য বিষয়ে আমাদের সমস্যা অন্য যে কোন দেশের সমস্যার চাইতে জটিল। অন্যান্য দেশের সামনে মাত্র একটি সমস্যা—মুদ্রার মূল্য কিভাবে কতখানি হ্রাস করা যেতে পারে। আমাদের সমস্যা দুটি—প্রথম, স্টার্লিং এর সঙ্গে টাকার যে বর্তমান যোগাযোগ রয়েছে তা অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন কিনা, এবং দ্বিতীয়, টাকার মূল্যের কত খানি হ্রাস আমাদের বর্তমান আর্থিক পারিস্থিতির পক্ষে প্রয়োজন।

প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে যে স্টার্লিংএর সঙ্গে টাকার যোগাযোগ

অপরিহার্য কিনা এবং তারপরই বিবেবনা করতে হবে যে এই যোগাযোগ আমাদের আর্থিক স্বার্থে প্রয়োজনীয় কি না। ১৯৩১সালে যখন স্টার্লিংএর সঙ্গে টাকাকে জুড়ে দেওয়া হয়, তখন অনেক ভারতবাসী এই নীতির তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতা করেন; কিন্তু সরকার আপন নীতিকে এই বলে সমর্থন করলেন যে, ইংলণ্ডের কাছে ভারতের যে ঋণ আছে, সেই ঋণ পারস্পরিক স্বার্থে ঘা না দিয়ে পরিশোধ করতে হলে টাকা স্টার্লিং-বিনিময়-হার সুনির্দিষ্ট রাখতে হবে; সেই সেই সঙ্গে একথাও বলা হয় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যদি ভারতের বাণিজ্য বাড়াতে হয় তাহলে এই প্রকার যোগাযোগ প্রয়োজন। বর্তমানে এই দুই প্রকার প্রয়োজন আর পরিলক্ষিত হয় না। দ্বিতীয় মহাসমরের সুযোগে বৃটেনের কাছে ভারতের যে দেনা ছিল তা' ত শোধ হয়েছেই; অপরপক্ষে, বৃটেনই আজ ভারতের কাছে ঋণী। তাছাড়া, আমাদের রপ্তানীর একটা মোটা অংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে যায়। ইংলণ্ড ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ থেকে আমাদের আমদানীর পরিমাণ বর্তমানে অবশ্য বেশী; কিন্তু এদেশের শিল্পপতিরা আজ সস্তা অথচ উচ্চাঙ্গের উৎপাদন-উপকরণ প্রভৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানী করার জন্য উদ্‌গ্রীব। এই অবস্থায় স্টার্লিংএর সঙ্গে টাকার যোগাযোগ মোটেই অপরিহার্য নয়। প্রয়োজনের দিক থেকেও প্রায় একই কথা বলা চলে। অন্য দেশের মুদ্রার সঙ্গে এই প্রকার যোগাযোগ স্থাপন করায় সেই দেশের আর্থিক পরিস্থিতির উত্থানপতনের প্রতিক্রিয়া এদেশের স্কন্ধে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এদেশের ও ইংলণ্ড বা অন্য যে কোন দেশের আথিক পরিস্থিতি এক নয়। ইংলণ্ডের মুদ্রার ক্রয়শক্তির ব্যতিক্রম হবে সেই দেশের অবস্থা অনুসারে। আমাদের মুদ্রা যদি স্টার্লিং এর সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তনও এদেশের আর্থিক পরিস্থিতিতে ঘা দেবে, বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রেও এতে ভয়ানক অসুবিধা হয়। আমেরিকা বা অন্য দেশ থেকে যদি আমাদের মাল আনতে হয় তাহ'লে তার মূল্য সরাসরি দেওয়া চলে না। প্রথমে টাকাকে স্টার্লিংএ পরিবর্তিত করা হয় এবং পরে স্টার্লিংকে ডলারে

রূপান্তরিত করা হয়। স্টার্লিং-ডলারের বিনিময়-হার নির্ভর করে ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থার উপর। আমাদের আর্থিক পরিস্থিতিতে এই বিনিময় হারের উপযোগিতা থাক বা না থাক, একে আমাদের স্বীকার করেই নিতে হয়। এই সব দিক থেকে বিবেচনা করলে বলতে হয় যে, স্টার্লিং এর সঙ্গে আমাদের বাধ্যতামূলক যোগসূত্র অচিরে ছিন্ন করাই কর্তব্য।

১৯৪৭ এ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন করে টাকা ও স্টার্লিং-এর "বাধ্যতা-মূলক" সংযোগ তুলে দেওয়া হয়েছে। টাকা-স্টার্লিং বিনিময়ের হার এখনো ১৮ পেন্সই আছে। কিন্তু এ হার বজায় রাখতে রিজার্ভ এখন আর বাধ্য নয়।

স্টার্লিং এর ভবিষ্যত অনিশ্চিত এজন্যও আমাদের এই যোগসূত্র ছিন্ন করা করা উচিত। ইংলণ্ডের সামনে আজ যে সমস্যা তাতে পূর্ণনিয়োগ মোটের উপর অপরিহার্য একথা বলা চলে। পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌছানও ইংলণ্ডের পক্ষে কষ্ট সাধ্য হবে না, অন্তত মুদ্রানীতির দিক থেকে। পূর্ণনিয়োগের জন্য চাই সস্তা মুদ্রা বা কম সুদে পুঁজি। যুদ্ধকালীন মুদ্রানীতির ফলে ইংলণ্ডে মুদ্রাস্ফীতি না হওয়ায় কমসুদে পুঁজি পাবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হবে না। সেই সঙ্গে ইংলণ্ডের আর একটি সমস্যা হ'ল বিদেশের কাছে তার যা দেনা আছে তা মেটানো। এর জন্য ইংলণ্ডকে আমদানীর পরিমাণ যথাসম্ভব কমিয়ে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়াতে হবে। জীবন-যাত্রার মান বজায় রাখতে হলে মূল্য নিয়ন্ত্রণ, সামগ্রীর সরবরাহ অনুযায়ী বিতরণ-বরাদ্দ প্রভৃতি করতে হবে এবং বিদেশে পুঁজির রপ্তানীর উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী করতে হবে। রপ্তানীর পরিমাণ বাড়াতে হলে স্টার্লিং-ডলার বিনিময় হারেরও পরিবর্তন করতে হবে। এই সব কারণে ইংলণ্ড আপন প্রয়োজন অনুসারে তার মুদ্রানীতির নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থায় ইংলণ্ড এবিষয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভও করেছে আমাদের সমস্যাও পূর্ণনিয়োগের আদর্শে পৌছান কিন্তু, সমাধানের স্তরগুলো একেবারেই বিভিন্ন। আমরা আজও কৃষিপ্রধান দেশ; পূর্ণনিয়োগ যদি আমাদে আনতে হয় তাহলে তা শিল্পের প্রসার ছাড়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়। শিল্পে

প্রসারের জন্য আমাদের চাই উৎপাদন-উপকরণ; বিদেশ থেকে এই সব উপকরণ আমাদের আমদানী করতেই হবে এবং তার জন্য এদেশ থেকে কিছুকাল পর্যন্ত কাঁচামাল প্রভৃতি যা এদেশে উৎপন্ন হয় তাই বিদেশ রপ্তানী করতে হবে। এই সব দিক থেকে বিদেশী মুদ্রার সঙ্গে টাকার বিনিময়মূল্য কম করতেই হবে। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, ভারত আজ পাওনাদার, দেনাদার নয়। এ অবস্থায় টাকার মূল্য কমিয়ে দেওয়ার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই, বরং টাকার মূল্য বাড়িয়ে দেওয়াই আবশ্যক। যাঁরা এই প্রকার যুক্তি দিয়েছেন তাঁরা বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করেই দেখছেন। ভারত যে আজ পাওনাদার হয়েছে এ নিতান্তই একটা অস্থায়ী অবস্থা, এবং এই অস্থায়ী অবস্থাও এসেছে দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবননাশের মধ্য দিয়ে, আধিব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, বস্ত্রসমস্যা প্রভৃতি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বরণ করে। এই কষ্টোপার্জিত অবস্থাও আবার অস্থায়ী; কেননা, আজও এদেশ ব্যাঙ্ক, বীমা, জাহাজ, বড় বড় চাকুরী ও শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিদেশী প্রতিষ্ঠান, পুঁজি ও লোকের উপর স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নির্ভর করে আছে। এদের বেতন, সুদ ও লাভ যোগাতে যে টাকা প্রতিবৎসর লাগবে তাতে অল্প দিনেই আমাদের পাওনাদার অবস্থার অবসান ঘটবে। তাই বলছি, স্থায়ী পাওনাদারী ও অস্থায়ী স্বচ্ছলতার মধ্যে যে পার্থক্য আছে ভারতের বর্তমান অবস্থার কথা বিচার করতে গিয়ে সে কথা ভুললে চলবে না। অবশ্য, স্বাধীন ভারতের কর্ণধার যাঁরা হবেন তাঁদের লক্ষ্যই হবে উপরোক্ত সমস্ত বিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়া, এবং যখন আমরা সেই স্তরে পৌছাব তখন তৎকালীন অবস্থা অনুযায়ী দেশী-বিদেশী মুদ্রাবিনিময় হারের পরিবর্তন করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কিন্তু বিদেশী মুদ্রার সঙ্গে টাকার বিনিময়মূল্য বাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে কোন যুক্তিই খাটে না।

বিদেশী মুদ্রার সঙ্গে টাকার বিনিময় হার কমিয়ে দেওয়ার পক্ষে প্রধান যুক্তি পাওয়া যাবে এদেশের বর্তমান সামগ্রীমূল্যের মধ্যে। কোন কোন অর্থশাস্ত্রীর মতে, এদেশে যুদ্ধকালে পাইকারী মূল্য আড়াই গুণ বেড়েছে, আবার কারও মতে সাড়ে তিন গুণ। অথচ ইংলণ্ডে মূল্যের হার ১০৩ স্থলে ১৬৩ হয়েছে।

এদেশে পাইকারী মূল্যের আড়াই গুণ বৃদ্ধিকেই যদি যথাযথ বলে ধরা হয় তবে টাকার সঙ্গে স্টার্লিং এর বিনিময় হার '১৲ টাকা=১ শিলিং' এর চাইতে বেশী হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, পাইকারী দরের হিসাবে মুদ্রাবিনিময় হার নির্ধারিত হওয়া ঠিক নয়; কেননা, পাইকারী দর নির্ধারণে এমন অনেক জিনিসেরই দর ধরা হয়েছে যা বিদেশে রপ্তানী হয় না। এদের আপত্তি মেনে নিলেও আমাদের সিদ্ধান্তে বিশেষ পরিবর্তন করবার কারণ নেই। ভারত সরকারের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা কর্তৃক সংগৃহীত সংখ্যা অনুসারে খাদ্য সামগ্রী ব্যতিরেকে কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্য ১০০ স্থলে ২০০ হয়েছে। যে সব কৃষিজাত সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী হয় তাদের মূল্য ১০০ স্থলে ২৪০ হয়েছে। অথচ ইংলণ্ড থেকে রপ্তানী শিল্পজাত সামগ্রীর মূল্যমান ১০৬ স্থলে ১৬৫ হয়েছে। এদিক থেকেও টাকা-স্টার্লিং বিনিময় হার ১৲ টাকা = ১ শিলিংএর চাইতে কিছু কমই হয়। যে ভাবেই ধরা যাক না কেন, বিদেশী মুদ্রার সঙ্গে টাকার বিনিময় হার কমাতেই হবে।*

এই প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। বর্তমানে আমাদের অনেক জিনিসেরই বাজার যুদ্ধের কারণে কমে গেছে, বিশেষ করে, তুলো ও পাট, লোহা ও ইস্পাত, পরিষ্কৃত ও অপরিষ্কৃত চামড়া, প্রভৃতির চাহিদা আপাততঃ অনেকখানি কমে গেছে। কেননা, যে সব দেশে এই সব সামগ্রী রপ্তানী হতো তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে এখনও অনেক সময় লাগবে। যে সব দেশে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা সরাসরি ভাবে গিয়ে পড়েনি, যেমন, দক্ষিণ আমেরিকা, মিসর প্রভৃতি, তারা আবার আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই

*দ্রষ্টব্য—ভারত বর্তমানে আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থা সমিতির সদস্য হয়েছে। এই ব্যবস্থার নিয়ম অনুসারে স্বেচ্ছায় কোন দেশই মুদ্রার বিনিময় হার শতকরা ১০ ভাগের বেশী কমাতে পারে না। মুদ্রাসঙ্ঘের বিশেষ অনুমতি নিয়ে আরও দশভাগ কমানো চলে। অথচ আমাদের হিসাবে টাকার বিনিময় হার অন্তত ৩৩ ভাগ কমা উচিত। যাই হোক, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা স্বেচ্ছায় যেটুকু কমাতে পারি অন্তত সেটুকুর সুযোগ আমাদের অচিরে গ্রহণ করাই উচিত। স্যর চুণীলাল মেহতাও এই অভিমত পোষণ করেন।

কারণে আমাদের বহির্বাণিজ্যের ভবিষ্যত বিশেষ আশাপ্রদ দেখা যায় না। তাছাড়া কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বা দক্ষিণ আমেরিকায় সামগ্রীমূল্য এত কম বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এসব দেশে উৎপাদনেরআনুষঙ্গিক খরচা প্রায় স্বাভাবিকই রয়ে গেছে। এ অবস্থায় টাকার বিনিময় হার না কমাবার অর্থই হবে এই যে, ভারত স্বেচ্ছায় বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকে সরে থাকছে। বর্তমান অবস্থায় আমরা যখন ষোল আনা স্বাবলম্বী হতে পারছি না, তখন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্য আমাদের সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে।

(৮) ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সংস্কার

একথা বরাবরই জানা আছে যে আর্থিক উন্নতির গোড়ার কথাই হল টাকা, আর ব্যাঙ্কই এই টাকা একত্রীকরণের কেন্দ্র। অতএব স্বাধীন ভারতের আর্থিক সংগঠনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে ব্যাঙ্কের কথা না বললে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয় না। এদেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, দেশী, দ্বিতীয় আধুনিক। এদের সংগঠন ও কর্মপদ্ধতি আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। আমরা শুধু এদের সংস্কারের কথা আলোচনা করব। দেশী ব্যাঙ্ক এদেশের বাণিজ্যের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ হস্তগত করে রেখেছে। এদের কর্মপদ্ধতি সেকেলে হলেও এদেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে তা খুবই সুবিধাজনক। হাজার দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ব্যাঙ্কব্যবস্থা থেকে এদের কোনদিনই বাদ দেওয়া চলবে না। স্যর সোরাবজী পোচখানওয়ালার ভাষায়,—গলদ ততখানি মহাজনদের নয় যতখানি ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার। দেশী ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাতো আজও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংগঠিত হয়নি! তাই এর প্রতিকার, যুগোপযোগী ব্যবস্থা অনুসারে এর পুনর্গঠনেই, বহুনিন্দিত মহাজনী প্রথার নির্মূলীকরণে নয়। এই পুনর্গঠন কি ভাবে হবে? এবিষয়ে যাঁরা মতামত জ্ঞাপন করেছেন, তাঁরা চান আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সঙ্গে এদের জুড়ে দিতে। ১৯২৯ সালে ব্যাঙ্ক বিষয়ে যে তদন্ত হয় তাতে একথা বলা হয়েছে যে, এই সব মহাজনেরা যদি অন্যান্য ব্যবসায়ে লিপ্ত না থাকেন এবং হিসাব রক্ষা বিষয়ে কতকগুলি বিধিনিষেধ

স্বীকার করেন, তাহলে এঁদের আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় স্থান দেওয়া সমীচীন হবে। আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় এঁদের স্থান দেওয়া যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তা বেশ বোঝা যায়; কেননা, এঁরা যদি ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার বাইরে থেকে কারবার চালান তাহলে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিছুতেই এঁদের বা এঁদের কারবারের পরিমাণের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না; ফলত, নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গৃহীত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যে কোন নীতিই পণ্ড হতে বাধ্য। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও এ বিষয়ে দুটি পরিকল্পনা খাড়া করেছিলেন, কিন্তু মহাজনেরা তা গ্রহণ করেন নি। এঁরা বলেন যে, আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার শাখাপ্রশাখার বিস্তারে এবং বিভিন্ন আইন প্রণয়নের ফলে এঁদের মহাজনী কারবার দিনদিনই হাতছাড়া হচ্ছে; এই অবস্থায় এঁরা যদি ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ না করেন তাহলে এঁদের পুঁজির মোট অংশকে খাটানো যায় না। এছাড়া আমানত গ্রহণ ও হিসাব-প্রকাশ বিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণ করতেও এঁরা রাজী নন। একথা ঠিক যে, মহাজনদের আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিরাপত্তা-বিষয়ক নীতি ত্যাগ করতে পারেন না; তবে একথা বলতেই হবে যে, দেশকাল অনুসারে সব জিনিসকেই খাপ খাইয়ে নিতে হয়। অতএব, বর্তমান অবস্থায় মহাজনেরা যদি মহাজনী ব্যবসায় ছাড়া অন্য ব্যবসায় গ্রহণ করতে বাধ্য হন তাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আপত্তি করা উচিত নয়। মহাজনেরা যদি তাঁদের মহাজনী ও অন্যান্য কারবারের হিসাব পৃথক রাখেন, তাহলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। এছাড়া এবিষয়েও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, মহাজনদের আসল কারবার যেন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কারণ মহাজনী কারবারেই যদি এঁদের সম্পূর্ণ টাকা আশানুরূপ লাভে খাটাবার সুযোগ পান তাহলে এঁরা ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করবেনই বা কেন? এই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য আধুনিক ব্যাঙ্কগুলি যদি মহাজনদের বিল বা চেকের টাকা আদায় প্রভৃতি কাজে লাগাতে থাকেন তাহলে এই সমস্যার অনেক খানি সমাধান হবে। অপর পক্ষে, এঁদের যতই কোনঠাসা করবার প্রয়াস করা হবে এঁরাও ততই

অস্পৃশ্যবৎ দূরে সরতে থাকবেন। তাই এবিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাকে উদার দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করতে হবে।

আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থারও আবার দুটি ভাগ আছে—স্বদেশী এবং বিলাতি। একস্চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলো আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার বিলাতি অংশের অন্তর্ভুক্ত। এরাই ভারতীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থার সব চেয়ে খাপছাড়া অঙ্গ। এ যাবৎ এই সব ব্যাঙ্ক এদেশের বহির্বাণিজ্যেই পুঁজি খাটিয়ে আসছিল; এখন আভ্যন্তরীন বাণিজ্যে পুঁজি খাটানো ব্যাপারেও এরা প্রতিযোগিতা করতে শুরু করেছে। তাই আজও আমাদের এদেশী ব্যাঙ্কগুলো বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করে নি। এই সব বিদেশী ব্যাঙ্কের অনেকেরই প্রধান কারবার বিদেশে; এদের পুঁজিও প্রায় বিদেশ থেকে আসে; এদের উপর দেশবাসীর কোন নিয়ন্ত্রণাধিকারই নেই। অথচ অন্য কোন স্বাধীন দেশ এই প্রকার অবস্থা সহ্য করবে না। এদের নীতিরও আবার এমন চমৎকারিত্ব যে দেশী ব্যাঙ্ক কিছুতেই এদের একচেটিয়া অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অথচ এদেশে কাঁচামাল রপ্তানী ও বিদেশ থেকে শিল্পজাত সামগ্রীর আমদানীর জন্যও এরা অনেকখানি দায়ী। ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়কে এরা কথনই সুযোগ সুবিধা দিতে চায় না। এই সব কারণে স্বাধীন ভারত এদের কথনই বরদাস্ত করতে পারে না। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে ব্যাঙ্ক-বিলের খসড়া উপস্থাপিত করা হয়েছে তাতেও এদের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কোন ব্যবস্থা নাই। স্বাধীন ভারতে এদের নিয়ন্ত্রণতো করতেই হবে, সেই সঙ্গে এদের তথনই মাত্র এদেশে বাণিজ্য করবার অধিকার দেওয়া হবে, যখন দেখা যাবে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিকে ঐ সব দেশে অনুরূপ অধিকার দেওয়া হয়েছে।

এদেশের যৌথব্যাঙ্ক গুলোর ব্যবসায় ক্ষেত্র অতীব সংকীর্ণ। এই অবস্থার জন্য অনেকগুলো কারণ দায়ী। প্রথমেই বলতে হয় যে, এদেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার গোড়াপত্তনই হ'লো স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, বিশেষ করে, প্রথম মহাসমরের পর; অথচ এদেশে যে দু'চারিটি শিল্প গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে

শর্করা শিল্প ব্যতিরেকে অন্য সব গুলোই গত শতাব্দীর শেষার্ধে বা বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে কাজ শুরু করে। তার পর নানা কারণে এই সব যৌথ ব্যাঙ্ক অনেক দিন পর্যন্ত লোকের আস্থাভাজন হতে পারে নি। এ দিকে আভ্যন্তরীন ব্যবসায় বাণিজ্য থেকে মহাজনদের সরিয়ে দেওয়াও সহজ ব্যাপার নয়। বহির্বাণিজ্য আজও বিদেশী ব্যাঙ্কগুলোর হাতে। সর্বোপরি আমানত গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রতিযোগিতার ফলে যৌথ ব্যাঙ্কগুলি কিছুদিন আগে পর্যন্ত অনেকখানি পিছিয়ে ছিল। দ্বিতীয় মহাসমরের সুযোগে এবং মহাজনী আইনের ফলে এদের খানিকটা সুবিধা হয়েছে বটে; কিন্তু এরা এলোমেলো ভাবে শাখা-প্রশাখার বিস্তার করে চলায় কোন কোন যায়গায় চাহিদার চাইতে এদের সরবরাহ বেশী হয়ে পড়েছে। কিন্তু গ্রামদেশে যেখানে মহাজনী প্রথা দিন দিন খসে পড়ছে, সে দিকে এদের নজর নেই। এদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতারও অভাব। সে বিষয়ে সঙ্ঘ মারফতে কোন চেষ্টাও হয় নি। তাছাড়া এত বেশী চুনোপুঁটি ব্যাঙ্ক গড়িয়েছে যে, এরাই ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাকে আরও দুর্বল করে তুলেছে। এদের নীতি ও কর্মপদ্ধতিও সব সময় এদেশী বণিকদের মনঃপূত হয়ে ওঠে না। এই সব বিষয়ে অদূর ভবিষ্যতে যত্নবান হওয়া উচিত। যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উপরেই ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার ভবিষ্যত নির্ভর করবে।

পৃথিবীর যৌথব্যাঙ্কের ইতিহাসে এদেশের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক এক অদ্ভূত পদার্থ। এই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাকালে থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ ভারত সরকার ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মধ্যে বিভক্ত ছিল; অথচ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অনেক বিষয়ে অন্য যে কোন যৌথ ব্যাঙ্কেরই মত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক আর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ করছে না; কিন্তু তার বিগত জীবনের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুযোগসুবিধার অনেকখানি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়ায় এই ব্যাঙ্কটি অন্য যৌথ ব্যাঙ্কগুলোর পক্ষে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবার পর

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের উচিত ছিল বহির্বাণিজ্যে পুঁজি খাটানো বিষয়ে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রভূত প্রতিপত্তি ও সম্পদ এই কার্যে বিশেষ উপযোগী হ'ত। কিন্তু এবিষয়ে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অগ্রসর হয়নি; বরং আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে প্রতিযোগী হওয়ায় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার পক্ষে সমূহ ক্ষতির কারণ হয়েছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক যদি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-ব্যাপারে হস্তক্ষেপই করে, তাহলে তার উচিত অন্ততপক্ষে অন্যান্য যৌথব্যাঙ্কদের নিয়ে একটা সংঘ বা সংগঠন তৈরী করা। এই ভাবে সংঘশক্তিতে বলীয়ান হয়ে এরা সবাই অগ্রসর হতে পারবে। বড় ব্যাঙ্ক যদি মনে করে যে, ছোট ব্যাঙ্কগুলির কাজ গুটানোতে তাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, তাহলে তারা মস্ত ভুল করবে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সাধারণত জনসাধারণের আস্থার উপর নির্ভর করে। যদি কোন কারণে জনসাধারণের আস্থা বিনষ্ট হবার সুযোগ ঘটে তাহলে তার প্রথম চোট ছোট ব্যাঙ্কগুলির উপর পড়বে সত্যি, কিন্তু বড় ব্যাঙ্কও এথেকে একেবারে অব্যাহতি পাবে না।

এইবারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ১৯৩৫ সালের আগে এদেশে কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই ছিল না। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজকর্ম ভারত সরকার ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে ভাগাভাগি করে করতে হত। এতে কাজের সুবিধা হয় নি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হবার পরে এই অসুবিধা দূর হয়েছে বটে, কিন্তু সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয় নি। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যেসব ক্ষমতা থাকা উচিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে তার সবগুলোই দেওয়া হয়েছে; কিন্তু নানা কারণে অনেক ক্ষমতাই সুযোগের অভাবে ব্যবহৃত হতে পারছে না। কাগজের মুদ্রা ও অন্য ধাতব মুদ্রা তৈরী করে বের করবার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা হিসাবে ঐই ব্যাঙ্ক কতকটা সফল হয়েছে মাত্র। এ ক্ষমতাও ষোল আনা এই ব্যাঙ্কের হাতে নেই। এক টাকার নোট আজও ভারত সরকারের নামে ছাপা হয়। বৃহত্তর ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উপরও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আধিপত্য যৎসামান্যই। একথা আমরা জানি যে, মহাজনেরা এই ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণের বাইরে; এক্সচেঞ্জ

ব্যাঙ্কগুলোও কার্য্যতঃ তাই। যৌথব্যাঙ্কের মধ্যে যারা তপশীলভুক্ত নয় তাদের উপরও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সরাসরি কোন অধিকার নেই। এই সব নানা কারণে গত দশ বৎসরকাল কাজ করেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুদার দৃষ্টিভঙ্গীই এই অবস্থার জন্য অনেকখানি দায়ী। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতি বিষয়ে প্রাচীন-পন্থী আলোচনার উপর ষোল আনা নির্ভর করে কোন ব্যাঙ্কই কোন দিন অগ্রসর হতে পারে না। তা ছাড়া বর্তমান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর রাজনৈতিক প্রভাব অত্যন্ত বেশী। সরকারী স্বার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফল আমরা বিগত মুদ্রাস্ফীতিকালীন আর্থিক পরিস্থিতির সময়ই পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। এতো হল নীতিবিষয়ক সংস্কারের কথা। সংগঠনের দিক থেকেও বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক। ভারতবর্ষকে প্রায় একটা মহাদেশই বলা চলে; এবং এর বিভিন্ন অংশের আর্থিক অবস্থাও বিভিন্ন। এ অবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সারা দেশের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। এক এক প্রান্তের জন্য এক এক প্রকার নীতির প্রয়োজন। এই কারণে স্বাধীন ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিষয়ে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি অবলম্বন করা হয় তাহলে সুফলের আশা করা যায়। এদেশের জন্য অন্ততপক্ষে পাঁচটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দরকার এবং এদের নীতি বিভিন্ন প্রদেশের প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারিত হবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় আশা করা গিয়েছিল যে, এবারে টাকার বাজারে বিল বাজারের অভাব পূর্ণ হবে। কিন্তু সে বিষয়েও আমরা হতাশ হয়েছি। বিল বাজারের আবির্ভাবে শুধু যে শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রসারই সূচিত হয় তাই নয়; সেই সঙ্গে এদের প্রসারেরও সুবিধা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, বিলের অভাবেই বিল বাজার গড়ে উঠছে না; কিন্তু এই প্রকার যুক্তি ঠিক নয়। বিলের বাজার গড়ে উঠবার সুবিধা দিলেই বিলের সংখ্যা বাড়তে পারে। বিলের সংখ্যা তখনই মাত্র বাড়তে পারে যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিল জমা রেখে টাকা ছাড়তে প্রস্তুত। "অনুমোদিত বিল"—এই শব্দদ্বয়ের এমন অনুদার

ব্যাখ্যা এদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ দিয়ে থাকেন যে প্রায় কোন বিলই—এক সরকারী কাগজ ছাড়া—এই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। আইনে একথা লিখে দেওয়া হয়েছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন কোন বিল গ্রহণ করবে তখনই তপশীলী ব্যাঙ্ককে আপন মক্কেল সম্বন্ধে বিশদ ও অবিরত সংবাদ দিতে হবে—তাদের অবস্থা, ব্যবসায়, কোন ব্যবসায় সংক্রান্ত বিল, তাদের মোট দেনার পরিমাণ কিরূপ, এই প্রকার আরও কতকি খুঁটিনাটি সংবাদ দিতে হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এইসব বিষয়ে নিজেও তদন্ত করে দেখতে পারে। এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী যেখানে রয়েছে, সেখানে বিলের ব্যবহারে প্রসার আশা করা নিরর্থক। স্বাধীন-ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্বার্থে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গঠন ও দৃষ্টিভঙ্গীতে আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

(৯) আর্থিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্থান

আর্থিক পরিস্থিতির বর্ধমান জটিলতার দরুণ এবিষয়ে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে আমূল পরিবর্ত্তন হয়েছে। মোটামুটিভাবে, দার্শনিকেরা এই বিষয়ে তিন প্রকার সিদ্ধান্ত করেছেন। অরাষ্ট্র-তান্ত্রিক যাঁরা, তাঁরা রাষ্ট্রকে কোন মতেই সমর্থন করেন না। এঁদের মতে রাষ্ট্র অনিষ্টের মূল, অতএব নিস্প্রয়োজন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদীরাও রাষ্ট্রকে অনিষ্টের মূল বলে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তাঁরা এর উপযোগিতার কথা একেবারে অস্বীকার করেন নাই। অপরপক্ষে সমাজ-তান্ত্রিকেরা ষোল আনাই রাষ্ট্রবাদী। দেশের আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে, আজ সারাটা পৃথিবী এমন একটা আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে এসে পৌছেছে যে, পৃথিবীর কোন দেশই রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি বাদ দেওয়ার কথা ভাবতে পারে না। আর্থিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ শুধু যে প্রয়োজন তাই নয়, সেই সঙ্গে অপরিহার্যও বটে। এ অবস্থায় আমাদের শুধু একথা বিচার করতে হবে যে, রাষ্ট্রের কি পরিমাণ হস্তক্ষেপে আর্থিক ব্যবস্থার যথার্থ কল্যাণ সাধিত হবে। এবিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট সীমা নির্দেশ করা সম্ভবপর নয়। পৃথিবীর অবস্থা এবং দেশের আভ্যন্তরীণ আর্থিক উৎকর্ষের উপরই এই হস্তক্ষেপের

পরিমাণ নির্ভর করবে। বিভিন্ন দেশের আর্থিক প্রগতিবিষয়ে দু'এক কথা বলে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইংলণ্ডের আর্থিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র এক উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিল। এর পেছনে ছিল বাণিজ্যনিষ্ঠ অর্থশাস্ত্রীদের বিরাট সমর্থন। তারপর অবশ্য রাষ্ট্রব্যবস্থা কিছুদিনের জন্য সরে দাঁড়াল। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শৈশবে এই নীতি একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তখন অন্য কোন দেশে শিল্প-ব্যবস্থার আবির্ভাব হয় নি; ইংলণ্ডের অধিকার ছিল একচ্ছত্র। তাই ধনিকদের হাতে শিল্প-ব্যবস্থার স্থাপন ও প্রসারের যোলআনা ভার দিয়ে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত হল, অন্তত ধনতন্ত্রের কল্যাণে। অথচ আজ যদি কোন দেশ শিল্প প্রতিষ্ঠা করে ধনতন্ত্রের গোড়াপত্তন করতে চায় তাহলে তার জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার পূর্ণ সহযোগিতাই দরকার হবে। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন নীতির উপযোগিতায় কালধর্মই সূচিত হচ্ছে। যাই হোক, ইংলণ্ডের তৎকালীন আর্থিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ক্ষতির কারণই হ'ত। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, ইংলণ্ডের তখন পূর্ণ কর্তৃত্ব পৃথিবীর বাজারে। ইংলণ্ডই এসময় পৃথিবীর কারখানা ছিল। অন্যান্য দেশ হয় তখনও ঘুমিয়ে, নয়তো আভ্যন্তরীন ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত। পরবর্তী কালে যেসব দেশ ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলো তাদের সবাই এসময়ে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগ নিয়েই ব্যস্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর চরম পরিণতি হ'ল গৃহবিবাদ। জার্মানী সর্বপ্রথম ১৮৭০ সালে অখণ্ড রাষ্ট্রে পরিণত হ'ল। ইতালী তার প্রায় দশ বছর আগে স্বাধীনতা পেয়েছে। রুশিয়া দাসপ্রথার উচ্ছেদ করল ১৮৬২ সালে। কিন্তু এতে যেসব নূতন সমস্যার উদ্ভব হ'ল বর্তমান শতাব্দীতে প্রথম মহাসমরের সময় পর্যন্ত তার সমাধান ত হ'লই না বরং আর্থিক প্রগতির পথ আরও রুদ্ধ হ'ল। বর্তমান জাপানের গোড়াপত্তনই হ'ল ১৮৬৮ সালে। অথচ ইতিমধ্যে যান্ত্রিক ও শিল্প বিপ্লবের প্রথম অধ্যায় ইংলণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এই যে একটা চমৎকার অবস্থা এতে সব বিষয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজনই ছিল না। অবশ্য কারখানা-নিয়ন্ত্রণমূলক আইন বা শ্রমিক-আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে যেসব

আইন ইতিপুর্বেই প্রণয়ন করা হয়ে ছিল তা এখনও বলবৎ থাকলো এবং প্রয়োজন অনুসারে তার রদবদলও হয়েছিল, কিন্তু মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থা আর্থিক বিষয়সমূহ নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায়নি। জার্মানী, রুশিয়া বা জাপানে ঠিক একই কারণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হয়েছিল, যদিও হস্তক্ষেপের পরিমাণ বিভিন্ন। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ মোটামুটি তিন প্রকার হয়ে থাকে—রাষ্ট্রের মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ বা বিধিব্যবস্থা। অবস্থাভেদে দুই বা তিনপ্রকার রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপই প্রয়োজন হতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে আবার এক এক সময় এক এক প্রকার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়। জাপানে শিল্পের প্রথম অবস্থায় রাষ্ট্রের মালিকানা ও বিধিব্যবস্থা ও পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণই দেখা যায়। রুশিয়ার শিল্প প্রগতির পেছনে উপরে উক্ত তিন প্রকারেই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ঘটেছে, অথচ জার্মানীতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণই প্রধানতম।

আমরা বর্তমানে যে পরিস্থিতিতে বাস করছি এতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অপরিহার্য। বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারাও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সমর্থন করেছেন, কিন্তু এদেশে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের মাত্রাবিষয়ে আমরা তাঁদের সঙ্গে পুরোপুরি একমত নই। বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা অধ্যাপক পিগুর দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্রার সমর্থন করেছেন। অধ্যাপক পিগু প্রাচীনপন্থী। এই কারণে তিনি 'যা হচ্ছে হতে দাও' নীতি হজম করেই মানুষ। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তিনি খানিকটা রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছেন। আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে আজও যে পরিমাণে পিছিয়ে আছি, তাতে অল্পমাত্রায় হস্তক্ষেপ বিশেষ কার্যকরী হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া সারাটা দেশ জুড়ে অকেন্দ্রীভাবের যেসব শক্তি আজ ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিচ্ছে তাতে দেশজোড়া কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাই বিশেষ উপযোগী। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার উপযোগিতা রুশিয়ার গত পনের বছরের ইতিহাসে বেশ দেখতে পাওয়া যায়। আদর্শের দিক থেকে আমরা রুশিয়ার সঙ্গে একমত হই বা না হই, একথা বলতেই হবে যে, রাষ্ট্রের অধীনে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কায়েম করার

মধ্যেই রুশিয়ার আশ্চর্যজনক শিল্পোন্নতির বীজ নিহিত রয়েছে। ১৯১৭ সালে রুশিয়া কৃষিপ্রধান ছিল; অকেন্দ্রীভাবের বিভিন্ন শক্তিরও কোন অভাব ছিল না। সেইস্থলে আজ যে বিরাট শক্তিশালী শিল্পপ্রধান রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের অভাবে কোনদিনই সম্ভবপর হ'ত না। আমাদের দেশও আজ প্রায় অনুরূপ অবস্থাতেই রয়েছে। কৃষি আজ এদেশের একমাত্র পেশা, অথচ অর্থকরী পেশা হিসাবে কৃষি নির্ভরযোগ্য নয়। জনসংখ্যা দিনদিনই বাড়ছে, অথচ সম্পদবৃদ্ধি না হওয়ায় জনসংখ্যার সামান্য বৃদ্ধিও ভারস্বরূপ হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্রা কম হলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে বেশী সময় অতিবাহিত হবে।

আর্থিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এই দুই কারণে হয়ে থাকে—প্রথম, উৎপাদন ব্যবস্থার বিস্তার এবং দ্বিতীয়, বর্তমান সম্পদ যথাযথভাবে পুনর্বিতরণের ব্যবস্থা। আমাদের দেখতে হবে যে, জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার জন্য এই দুয়ের কোনটি অধিকতর প্রয়োজনীয়। সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যাঁরা বিচার করেন তাঁদের বক্তব্য এই যে, বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থায় সম্পদের মোটা একটা অংশ ব্যষ্টির হাতে রয়েছে; অতএব সমষ্টির কল্যাণে সম্পদের পুনর্বিতরণ হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশের একদল লোক এই প্রকার যুক্তি দিয়ে থাকেন; কিন্তু এই প্রকার যুক্তি এখনও আমাদের দেশের পক্ষে উপযোগী নয়। উপরে যে দুটি বিষয়ের কথা বলা হ'ল, আর্থিক প্রগতির একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত এরা প্রায় পরস্পর বিরোধী। যে অবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থা পূর্ণ পুঁজিনিয়োগের স্তর থেকে অনেক দূরে রয়েছে তখন যদি সম্পদের পুনর্বিতরণকল্পে উচ্চহারে কর নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাহলে পুঁজিসঞ্চয়ের উপর তার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হওয়ার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারের পথে মস্ত বিঘ্ন উপস্থিত হবে। আমরা আজও সে আর্থিক অবস্থার স্তরে পৌঁছাতে পারিনি, যেখানে অফুরন্ত সঞ্চিত পুঁজি সেই উৎপাদন ব্যবস্থাকে সাহায্য করার জন্য রয়েছে। এদেশে প্রতিষ্ঠান-গত সঞ্চয়ও নাম-

মাত্র। এই অবস্থায় উৎপাদনব্যবস্থার প্রসার কল্পে আমাদের বেশীর ভাগ নির্ভর করতে হয় ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর। উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার যে আজও আমাদের অনেকখানি করতে হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পুঁজির সঙ্গে সঙ্গে তাই আমাদের পুঁজিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং পুঁজিনিয়োগ বাড়াতে হলে আমাদের সব সময়ই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, পুঁজির সঞ্চয়ে যেন কোন ব্যাঘাত না পড়ে। অতএব সম্পদের পুনর্বিতরণ কল্পে যদি রাজস্বনীতি গৃহীত হয় তাহলে পুঁজির সঞ্চয় হতে পারে না। সম্পদের পুনর্বিতরণ কল্পে গৃহীত রাজস্বনীতিতে বণিকদের উপরই মোটা হারে কর ধার্য করা হয়; অথচ বণিকদের সঞ্চয়ের উপরই আজও আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে উৎপাদনব্যবস্থার বিস্তারের জন্য। তাই বলছি যে আমাদের বর্তমান লক্ষ্যই হবে উৎপাদন-ব্যবস্থার বিস্তার। অবশ্য একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে উৎপাদন বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধনবিতরণ বৈষম্য যেন আর না বাড়ে। তার জন্য একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয়কে গড়ে উঠবার স্থান দিতে হবে, অন্যদিকে তেমনি দেখাতে হবে যে, যৌথকারবারের মালিকানা সাধারণ লোকের হাতেও গিয়ে পড়ছে। তবে একথা সর্বদাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এদেশে বর্তমানে যেন এমন কোন রাজস্বনীতি গৃহীত না হয় যার ফলে ব্যক্তির সঞ্চয়ের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে। উৎপাদনব্যবস্থার প্রসারে আমরা যখন আর্থিক প্রগতির একটা বিশেষ স্তর অতিক্রম করব, তখন আর উপরিউক্ত রাজস্বনীতির বিশেষ উপযোগিতা থাকবে না। সঞ্চয় আপনা থেকেই হবে, কেননা, লোকে সঞ্চয় না করে পারবে না। সেই স্তরে যদি সম্পদের পুনর্বিতরণমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়, তাহলে তাতে উৎপাদনব্যবস্থার প্রসারে বিশেষ ক্ষতি হবে না। আর একটু বাড়িয়ে বলতে গেলে বলা চলে যে, উৎপাদনব্যবস্থা একটা বিশেষ স্তর ছাড়িয়ে যাবার পর এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করবার জন্যই ভোগব্যবহার বাড়ানো একান্ত আবশ্যক, এবং তার জন্য প্রয়োজনানুসারে সম্পদের পুনর্বিতরণ করতে হবে। কেননা, জনসাধারণের হাতে যদি ক্রয়শক্তি না থাকে এবং

তার ফলে সামগ্রীর বাজারের প্রসার না হয়, তাহলে কেবল মাত্র উৎপাদন-ব্যবস্থা বাড়িয়ে আর্থিক পরিস্থিতিতে মন্দাকে স্থান দেওয়ার কোন তাৎপর্যই হয় না। এ অবস্থায় উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ভোগব্যবহারও বাড়াতে হবে, এবং তার জন্য প্রয়োজনানুরূপ রাজস্বনীতির প্রবর্তন করতে হবে।

উপরে আমরা আর্থিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্থানের দু'টো দিক লক্ষ্য করলাম—প্রথম, রাষ্ট্রের মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ বা বিধিব্যবস্থা, এবং দ্বিতীয়, রাজস্বনীতি। রাষ্ট্রের সঙ্গে আর্থিক ব্যবস্থার সম্পর্কের আরও কয়েকটা দিক আছে। তাদের কয়েকটার কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, যেমন বাণিজ্যনীতি, শ্রমিকদের স্বার্থ-সংরক্ষণ, শিল্প-পরিকল্পনা প্রভৃতি। আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করেই বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করব। বিষয়টি হ'ল, ভোগব্যবহারকারীদের স্বার্থ ও শিল্পের প্রসার। একটু বুঝিয়ে বলা যাক। পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি কোন দেশ শিল্প বিষয়ে অগ্রসর হতে চায় তাহলে তার রক্ষণমূলক বাণিজ্যনীতি অবলম্বন করতে হবে; অবাধ বাণিজ্য চলবে না। রক্ষণমূলক বাণিজ্যনীতি অবলম্বন করলে সামগ্রী মূল্যের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। এতকাল পর্যন্ত ভারতের বিদেশী সরকার ভোগব্যবহারকারী কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থ-রক্ষা করার অজুহাতে পুরোপুরি বা প্রয়োজনানুযায়ী রক্ষণমূলক বাণিজ্য-নীতি গ্রহণ করেন নাই। এতে ভোগব্যবহারকারীদের অল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন স্বার্থের পার্থক্য করা হয়েছে। ভোগব্যবহারকারীদের অল্পকালীন স্বার্থ দিয়ে দেখলে অবশ্য এ প্রকার রক্ষণমূলক নীতি অবলম্বন করা চলে না। তবে দীর্ঘকালীন দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রয়োজন হলে ভোগব্যবহারকারীদের স্বার্থ উপেক্ষা করা যেতে পারে। এদেশের বিদেশী সরকার যদি তাই করতেন, তাহলে দ্বিতীয় মহাসমরের সময় সামগ্রীর অভাবে এদেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যতখানি নেমে গিয়েছিল তা যেত না। স্বাধীন ভারত জনসাধারণের দীর্ঘকালীন স্বার্থকেই প্রাধান্য দেবে, যাতে ভবিষ্যতে সামগ্রীর অভাব না হয়; কৃষি এবং শিল্পজাত সমস্ত সামগ্রীই প্রয়োজনানুসারে যাতে

এদেশে উৎপন্ন হতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনমত রক্ষণমূলক বাণিজ্যনীতির অবলম্বন করতে হবে, এবং প্রয়োজনমত আর্থিক সাহায্য প্রদান করার কথাও বিবেচনা করতে হবে। কিছুদিনের জন্য এতে ভোগব্যবহারকারীদের পক্ষে অসুবিধা হতে পারে; কিন্তু এদেশে শিল্প গড়ে উঠায় এই ক্ষণকালীন আত্মত্যাগ তার অধিক মূল্য ফিরে পাবে। দেশ স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে, এবং তার ফলে বরাবরের জন্য অল্পমূল্যে সামগ্রীর সরবরাহ হতে থাকবে।

(১০) অখণ্ড ভারত—না পাকিস্তান

বর্তমান প্রসঙ্গে অখণ্ড ভারত ও পাকিস্তানের অর্থনৈতিক তাৎপর্য ও তার সফলতার বিষয়ে আলোচনা একান্তই প্রয়োজনীয় বলে এ প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা দরকার। অর্থশাস্ত্রী হিসাবে এই প্রসঙ্গের আলোচনা আমাদের যথাসম্ভব নিরপেক্ষ ভাবে করা উচিত। সেই সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কি কি শক্তি কাজ করেছে সেই সম্বন্ধেও আমাদের সজাগ থাকা দরকার। একথা বোধ হয় কেউই অস্বীকার করবেন না যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বাঁচতে হলে চাই জনবল ও অর্থবল। এ দু'য়ের একটির অভাবেই সমূহ অনর্থলাভের সম্ভাবনা। প্রথমেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কথা ধরা যাক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ ধনবল ও জনবলে বলীয়ান। প্রায় কোন অংশ আজ ইংলণ্ডের উপর নির্ভরশীল নয়, এমন কি দেশরক্ষা ব্যাপারেও নয়। তবুও এরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন করছে না। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, এই সব দেশের অধিবাসীদের রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। কথাটা একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। তবে আসল কথা হল এই যে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পাঁচ জনে এক সঙ্গে থাকার একটা সুবিধা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও প্রায় একই অবস্থা। ৪৮টি রাজ্য নিয়ে এই যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই স্ব স্ব আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন। শুধু তাই নয়; যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কর্তৃত্ব, শাসন বিষয়ক

আইন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়ই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই নির্দিষ্ট বিষয়গুলি ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যাপারে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র আপন আপন এলাকায় স্বাধীনভাবে কাজ করে। কিন্তু এ সত্ত্বেও কিছুদিন যাবৎ একথা বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের বৃহত্তর কল্যাণে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট সীমারেখার বাহিরেও কাজ করতে হচ্ছে, বিশেষ করে আর্থিক ব্যাপারে। ভূতপূর্ব রাষ্ট্রনায়ক রুজভেল্টের 'নিউ ডিল' পরিকল্পনাই এর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এইভাবে যে কোন দেশের কথাই পর্যালোচনা করে দেখা যাক না কেন, সর্বত্রই দেখা যাবে যে, অকেন্দ্রীভাবের শক্তিগুলো দুর্বল হতে দুর্বলতর হয়ে পড়ছে, এবং কেন্দ্রীভাব বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার আনাচে কানাচে কাজ করছে। কেননা আজ প্রত্যেক দেশকে বাঁচতে হবে, এবং তার জন্য চাই শক্তি ও সহযোগিতা। যারা আজ এভাবে কাজ গুছিয়ে নিতে পারবে না, প্রতিযোগিতায় তাদের শুধু পরাজয়ই হবে না, সেই সঙ্গে তাদের অনেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, বিশেষ করে এই আধুনিক শক্তির যুগে। দেশরক্ষার কথাই বলি, কেননা, এই প্রশ্নই আজ সর্বাগ্রে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ যদি অস্ট্রেলিয়া, কানাডা বা আফ্রিকা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন একটি রাজ্য আপন শক্তির উপর পুরোপুরি নির্ভর করে থাকে, তাহলে দেশ-রক্ষা ব্যাপারে তাদের যা খরচ পড়বে, তা বহন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব, আর্থিক দিক দিয়ে তো বটেই, খনিজ এবং রাসায়নিক পদার্থের সরবরাহের দিক দিয়েও। এ অবস্থায় পারস্পরিক সহযোগিতাই একমাত্র সহায়। আর্থিক উৎকর্ষ বিষয়েও ঠিক একই কথা বলা চলে। একটু আগেই বললাম, রাষ্ট্রব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের মাত্রা বিভিন্ন দেশের আর্থিক পরিস্থিতি অনুসারে বিভিন্ন হলেও, হস্তক্ষেপ যে অপরিহার্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে আমরা আরও বলতে চাই যে, এই হস্তক্ষেপ করবে প্রাদেশিক বা বিভিন্ন প্রদেশের সরকার নয়, কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার। পূর্ণনিয়োগই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে বিচ্ছিন্ন ভাবে এই লক্ষ্যে পৌছান কখনই সম্ভবপর নয়। দেশের বিভিন্ন অংশ একযোগে কাজ

করে তবেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। এই বিষয়ে সাম্রাজ্যিক পক্ষপাতই চরম নিদর্শন। যে ইংলণ্ড এক কালে সাম্রাজ্যিক পক্ষপাতের সঙ্গে প্রকাশ্যে হাত মিলাতে পারে নি, সেই ইংলণ্ড ১৯৩২ সালে প্রকাশ্যভাবে একে সমর্থন করল। ইংলণ্ড আপন চেষ্টায় উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রসার করতে পারে, কিন্তু সাম্রাজ্যের বাজার ছাড়া সেই প্রসার টিকবে কি করে? তাই বলছি, যেদিক থেকেই দেখা যাক না কেন, কেন্দ্রীভাবের শক্তিই আজ বিভিন্ন দেশের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পূর্ণোদ্যমে কাজ করে চলেছে।

এইবারে আমরা ভারতীয় সমস্যার কথা বলব। এবিষয়ে একাল পর্যন্ত বিস্তর আলোচনা হয়েছে। প্রত্যেক লেখকই আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিষয়টির আলোচনা করে পাকিস্থান বা অখণ্ড ভারতের সমর্থন করেছেন। আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েও যে বিচার হয়নি তা নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য বৈজ্ঞানিক আলোচনা গড়ে উঠতে পারেনি। সাম্প্রদায়িক সমস্যা বিষয়ে সপ্রু-কমিটি বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন; তার এক অংশে পাকিস্থানে আর্থিক সম্ভাবনার বিষয়ও লক্ষ্য করা হয়েছে। এদেশে যে সব অর্থশাস্ত্রী অর্থনৈতিক-দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পাকিস্থানের সমর্থন করেছেন, তাঁরা সেই সঙ্গে একথাও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'হিন্দুস্থানের' সঙ্গে পাকিস্থানের শুধু যোগাযোগ রাখলেই চলবে না, সেই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাও অপরিহার্য। কারণ, এরা একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, আর্থিক ও দেশরক্ষা ব্যাপারে পাকিস্থান খুবই দুর্বল রাষ্ট্র হবে। স্যর হোমী মোদী ও ডাঃ মাথাই সপ্রু-কমিটির কাছে যে মতামত পেশ করেছেন, তাতে তাঁরাও ঠিক এই কথাই বলেছেন। তাঁদের ভাষায়, "কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, যদি দেশরক্ষা ও আর্থিক উৎকর্ষ বিষয়ে কোন না কোন প্রকার কার্যকরী ও নিরবছিন্ন সহযোগিতাকে কোন বিচ্ছেদমূলক পরিকল্পনার অপরিহার্য পূর্ব-প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে বিভিন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে ভারতের বিচ্ছেদ স্থায়ী অবস্থার সৃষ্টি করবে এবং এতে ভয়ানক বিপদেরও সম্ভাবনা রয়েছে।

অখণ্ড ভারতের যে সব সমর্থক এই কথা বলেন যে, ভারত পূর্বেও অখণ্ড ছিল অতএব পরেও অখণ্ড থাকবে, তাঁদের সঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে আমরা কখনই একমত হতে পারি না ; সেই সঙ্গে, যাঁরা বলেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের সভ্যতা ও কৃষ্টি হিন্দুদের চাইতে পৃথক, অতএব তাঁদের স্বাতন্ত্র্যাধিকার আছে, তাঁদের যুক্তিও ভ্রান্ত। রাজনৈতিক দিক থেকে অবশ্য একদল লোক আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য হিন্দু-মুসলমানের এক সঙ্গে থাকাটা সাময়িক ভাবে অসম্ভব করে তুলতে পারে, বর্তমান সময়ের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যদি বিচার করা যায় এবং সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য করা হয়, তাহলে একথা বলতে হবে যে, শুধু মাত্র অখণ্ড ভারতের প্রতিষ্ঠা করেই আমাদের ক্ষান্ত থাকলে চলবে না, সেই সঙ্গে পূর্ব এশিয়ার দেশ ও লোক একত্র করে আরও মজবুত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য হবে। আমার একথা বলবার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আজ ভারতই শুধু নিপীড়িত নয়, প্রাচ্যের প্রায় সমস্ত দেশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের তাঁবেদার হয়ে রয়েছে। এইসব দেশ আজ যে ভাবে নানা প্রকার অত্যাচার ও পীড়নের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা লাভের জন্য বদ্ধ-পরিকর হয়েছে তাতে তারা যে স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়ী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বিজয় যাতে স্থায়ী হয়, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের অত্যাচার যাতে চিরকালের জন্য নির্মূল হয়, তার জন্যও এদের ব্যবস্থা করতে হবে। সে ব্যবস্থা কখনই এককভাবে হবে না। তাই বলছি, সারাটা পূর্ব এশিয়া জুড়ে বিরাট যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা যাতে গড়ে ওঠে সেইটিই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কিন্তু এ হল দূরের স্বপ্ন—কোন দিন বাস্তবে পরিণত হবে কিনা জানিনা। তবে ভারতের অখণ্ডত্ব যে তার আপন স্বার্থেই প্রয়োজন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মোদী-মাথাই সিদ্ধান্ত অনুসারে, পাকিস্থান আর্থিক দিক দিয়ে সম্ভবপর হলেও হিন্দুস্থানের সঙ্গে সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক হবে। সহযোগিতা ছাড়া এই দুই রাষ্ট্রের যদি না চলে, অন্তত হিন্দুস্থানের সহযোগিতা ছাড়া পাকিস্থান যদি

অসম্ভবই হয়, তাহলে এই প্রকার বিচ্ছেদের সার্থকতাই বা কোথায় ? রাজনৈতিক দিক থেকে অবশ্যই বিচ্ছেদের দাবী উঠবে ; কিন্তু সারা ভারতে সংখ্যা-ঘনিষ্ঠ বলে যদি মুসলমানেরা পাকিস্থানের দাবী তোলে, পাকিস্থানের এলাকার যে সব হিন্দু বা শিখ বা অন্য জাতির লোক থাকবে তাদেরও অনুরূপ দাবী তোলবার পূর্ণ অধিকার আছে। এতে সমস্যাটির সমাধান না হয়ে বরং জটিলতাই বাড়বে। এই ভাবে কলিকাতা যদি হিন্দুপ্রধান হওয়ায় পাকস্থানী এলাকা থেকে বাদ যায় তাহলে পূর্ব-পাকিস্থান আর্থিক বিষয়ে অসচ্ছল হয়ে উঠবে। এ অবস্থায় পাকিস্থানের সীমা-নির্দেশ করাও কঠিন। তাছাড়া কিছুদিন থেকে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলির পুনর্গঠনের একটা কথা উঠেছে। এ প্রস্তাব যদি কাজে পরিণত হয় এবং আমার মতে হওয়াই উচিত, তাহালে বাংলা দেশে আজ মুসলমানেরা যে কিঞ্চিৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ আছে তাও থাকবে না। বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম থেকে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলগুলি ফিরে আসলে হিন্দুরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ না-ও হয়, তবুও তারা সংখ্যালঘিষ্ঠও থাকবে না, হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫০।৩০ বা তারই কাছাকাছি একটা কিছু হবে। এ অবস্থায় অল্পসংখ্যক এক সম্প্রদায়কে দাবিয়ে আর এক সম্প্রদায়ের দাবী অনুসারে পাকিস্থান রচনা করলে এক সম্প্রদায়ের পক্ষে ঘোরতর অন্যায় আচরণ করা হবে। এই হল সীমা-নির্দেশ বিষয়ক প্রশ্নের সঙ্গে পাকিস্থানের সম্পর্ক।

এইবারে আমরা পাকিস্থানের আয়ব্যয় ও দেশরক্ষা-বিষয়ক খরচের কথা বলব। মোদী-মাথাই সিদ্ধান্ত অনুসারে, দেশরক্ষা-বিষয়ক খরচ বাদ দিয়ে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের যুদ্ধপূর্ব-হিসাবের ভিত্তিতে, পাকিস্থানের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে ব্যয় নির্বাহ হতে পারবে। সরকারের আয়ের তুলনায় ব্যয় গত কয়েক বৎসরে অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধকালীন ব্যয় স্বাভাবিক ভাবে পূরণ না হওয়ায় অতি-মুদ্রানীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। যুদ্ধকালীন ব্যয়ের তুলনায় বর্তমান ও ভবিষ্যত ব্যয় অনেক কম হলেও যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থা কোন দিনই ফিরবে না। অপর পক্ষে আয়ের অনেকগুলি পথ

রুদ্ধ হবে। শিল্পপ্রচেষ্টা বাড়াতে হলে অনেকগুলো করের হারও কমাতে হবে বা একেবারেই রদ করতে হবে। এ যুগে যে-কোন দেশে খরচের হিসাবে দেশরক্ষা বিষয়ক খরচই সবচেয়ে বেশী; অথচ এই খরচই উপরের সিদ্ধান্তে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই খরচ সমেত ধরলে পাকিস্থান যে কোন দিনই ব্যয়সংকুলান করতে পারবে না শুধু তাই নয়; বৃহত্তর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই পাকিস্থানের দেশরক্ষা-বিষয়ক খরচও বাড়বে। পাকিস্থান ভারতের যে দুই প্রান্ত নিয়ে গঠিত হতে পারে, সেই দুই প্রান্ত দিয়েই বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা ও সুযোগ সব চেয়ে বেশী। সীমান্তদ্বয় রক্ষার কাজে স্বাভাবিক সময়েও এদেশের অজস্র টাকা ব্যয় করতে হয়। স্বতন্ত্র পাকিস্থান আয়তনে ক্ষুদ্র হওয়ায় এইসব আক্রমণের আশঙ্কা বাড়বে বই কমবে না। এ অবস্থায় পাকস্থানী রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে আপন তহবিল থেকে দেশরক্ষার কাজে প্রায় সমস্ত অর্থই উজাড় করে দিতে হবে। রাষ্ট্রের অন্যান্য গঠনমূলক কাজের জন্য আর অর্থ পাওয়া যাবে না; দারিদ্র্য পাকিস্থানের চিরসহচর হয়ে পড়বে। মিঃ জিন্না বলেছেন যে, আফগানিস্থান, ইরাক গরীব দেশ; তারা যদি স্বাধীন-ভাবে থাকতে পারে, তাহলে পাকিস্থান পারবে না কেন? কিন্তু তিনি একথা ভুলে যাচ্ছেন যে, এই সব দেশের স্বাধীন থাকা না থাকা তাদের ইচ্ছাধীন নয়; শক্তিশালী দেশগুলো এদের পারস্পরিক সংঘর্ষ যথাসম্ভব কম করার উদ্দেশ্যে এদের স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন করে রাখে বলেই এদের স্বাতন্ত্র্য। এবিষয়ে তাই এদের খরচ অস্বাভাবিক কিছু হয় না। পাকিস্থানের প্রান্তদ্বয় যদি এই উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়, তাহলে অবশ্য বলবার কিছু নেই; কিন্তু যখন আমরা পূর্ব এশিয়াকে এক মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ দেখতে চাই, তখন এই প্রকার দরিদ্র রাষ্ট্রদ্বয় ভারতের দুই প্রান্তে স্থাপন করার কোন অর্থই হয় না। শুধু তাই নয়, ভারতকে এই ভাবে বিভক্ত করায় মনকষাকষি অনেক গুণে বাড়বে এবং তাতে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এতে দুই পক্ষেরই খরচ বাড়বে। ম্যাজিনো বা

সীগফ্রীদ লাইনের মত ব্যয়সাপেক্ষ দেশরক্ষার ব্যবস্থাও অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে। পাকিস্থান এত অর্থ যোগাবে কোথা থেকে ?

এইবারে আমরা আর্থিক বিষয়ের আলোচনা করব। মোদী-মাথাই সিদ্ধান্ত অনুসারে দেশের জীবনযাত্রার বর্তমান মান পাকিস্থানে বজায় রাখা যাবে অবশ্য যুদ্ধ-পূর্ব কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের পরিমাণ অনুসারে। দুটি জিনিষ এখানে লক্ষ্য করতে হবে। উপরের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থা অনুসারে। গত কয়েক বৎসরে কৃষির উন্নতি বড় একটা হয় নি। বাংলায় শিল্পের বিস্তারও এ কয় বছরে বিশেষ হয় নি; কারণ, কিছুদিন থেকে ভারতের অনুন্নত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে শিল্প বিস্তারের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে জীবনযাত্রার বর্তমান মানের কথা বলা হয়েছে। জীবনযাত্রার মান যদি উন্নত করতে হয়, তাহলেই অসুবিধার সৃষ্টি হবে। একথা অবশ্য সত্য যে, বাংলায় বা পাঞ্জাবে খাদ্যশস্যের অভাব হবে না, কিন্তু শিল্পের বিষয়ে হিন্দুস্থানই অধিকতর অগ্রসর হতে পারবে। কারণ, খনিজ যা কিছু সামগ্রী তার অধিকাংশই পাকিস্থানী এলাকার বাহিরে। কয়লার প্রায় শতকরা ৩০ ত্রিশ ভাগ এবং লোহার প্রায় ষোল আনাই হিন্দুস্থানের এলাকায়। বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের খনিজ সম্পদের শতকরা মাত্র ৫ ভাগ পাকিস্থানে পড়বে; খনিজ তেলের কিয়দংশ পাকিস্থানে পড়লেও এর অধিকাংশই হিন্দুস্থানে পড়বে। এইভাবে দেখা যায় যে, পাকিস্থানের শিল্পের ভবিষ্যতও উজ্জ্বল নয়। মিঃ জিন্না পাকিস্থানের জন্য দারিদ্র্য বরণ করতেও প্রস্তুত আছেন, কিন্তু এ প্রকার উক্তি বোধ হয় দারিদ্র্যের মহাপাপের সঙ্গে পরিচয় না থাকার জন্যই করা সম্ভব হয়েছে। এ অবস্থায় জীবনযাত্রার মানও উন্নততর করা যাবে না এবং জনসাধারণের করদান-ক্ষমতাও যৎকিঞ্চিৎ হওয়ায় রাষ্ট্র-ব্যবস্থাও অগ্রসর হতে পারবে না। মোদী-মাথাই সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, হিন্দুস্থানের সঙ্গে আর্থিক বিষয়ে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে চললে পাকিস্থানের স্বপ্ন সফল হতেও পারে। কিন্তু শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ঠিকই বলেছেন যে, যারা অখণ্ড ভারতের অংশ

বিশেষ হয়ে থেকে সহযোগিতা করতে চায় না, বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা কি করে সহযোগিতা করতে পারবে। এর উত্তরও তিনিই দিয়েছেন। তাঁর মতে এ প্রকার সহযোগিতা শুধু যে কষ্টসাধ্য তাই নয়, প্রায় অসম্ভবও বটে।

এ অবস্থায় পাকিস্থান ও হিন্দুস্থানের মধ্যে বাণিজ্যও ঠিকমত গড়ে উঠতে পারবে না। ভারতের পশ্চিম সীমান্ত আজও কৃষিপ্রধান; পাকিস্থানের এই অংশ কোন দিনই স্বতন্ত্রভাবে শিল্প বিস্তার করতে পারবে না; একে হিন্দুস্থানের উপরই নির্ভর করতে হবে শিল্পজাত অনেক সামগ্রীর সরবরাহ বিষয়ে। তর্কের খাতিরে কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, পাকিস্থানের পশ্চিম অঞ্চল আফগানিস্থান, ইরান প্রভৃতি মুসলমান দেশগুলির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করতে পারে; কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে এরাও প্রগতিশীল নয়। যে ভাবেই হোক, আর্থিক বিষয়ে এই অঞ্চল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হতে পারবে না। পূর্ব অঞ্চলেরও প্রায় অনুরূপ অবস্থা। বাংলা দেশে শিল্প কিছু গড়ে উঠেছে, কিন্তু এক পাটের কথা বাদ দিলে আর কোন শিল্পেরই পর্যাপ্ত পরিমাণ বিস্তার হয় নি; এই সব কারণে পাকিস্থানকে হিন্দুস্থানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। অপর পক্ষে, পাকিস্থানের এলাকা বাদ দিয়েও হিন্দুস্থানের স্বচ্ছন্দে নির্বাহ হতে পারে।

এ অবস্থায় জীবনযাত্রার মান উন্নত করা ত দূরে থাক, বর্তমান মানকে বজায় রাখাও কঠিন হয়ে উঠবে। অবশ্য পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের যথেষ্ট কৃষি-সম্পদ আছে; কিন্তু কৃষিজাত সামগ্রীর সরবরাহ বিষয়েও এরা ষোল আনা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়; চিনি, তেল, মসলা, প্রভৃতি বিষয়ে এদের পরের উপর নির্ভর করতে হয়। খনিজ পদার্থ ও শিল্প বিষয়ে এই নির্ভরশীলতা আরও বেশী। ভবিষ্যতে যে এই অবস্থার অবসান ঘটবে তারও আশা কম। এ অবস্থায় জীবনযাত্রার মান উন্নততর করার কোন প্রসঙ্গই ওঠে না। রাজনৈতিক দিক থেকে পাকিস্থান যতই অপরিহার্য হয়ে উঠুক না কেন, এর বিষময় প্রতিক্রিয়া অবশেষে পাকিস্থানের উপরই গিয়ে পড়বে। তাছাড়া, বিশ্বশক্তির প্রভাবও কেন্দ্রীভাবের দিকে; এই প্রভাবই বা কে রোধ করতে পারে? এই সব বিশ্বশক্তির বিরোধিতা করতে

গিয়ে যদি এদেশে গোটা কয়েক দুর্বল রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহলে পারস্পরিক অসদ্ভাব ও দ্বন্দ্বে, সম্পূর্ণ আর্থিক ব্যবস্থাই ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে। লণ্ডনের 'ইকনমিস্ট' পত্রিকার ভাষার প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, একথা সুস্পষ্ট যে যতদিন সারা ভারতের জন্য সংকল্প এবং কাজ করতে পারে, এইরূপ যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন সরকার কায়েম করা না হবে, ততদিন পুনর্গঠনের কোন পরিকল্পনাই কাজে পরিণত করা যাবে না।

(১১) উপসংহার—জীবনযাত্রার মান ও অভাব থেকে মুক্তি।

এইবারে আমরা আলোচনার উপসংহারে এসে পড়লাম। পরিকল্পনার কথা নিয়ে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ আজ চিন্তা করতে আরম্ভ করেছে। পরিকল্পনার নাম বা চেহারা যাই হোক না কেন, এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, কি করে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের ব্যবহার করে সব চেয়ে বেশী উপকার পাওয়া যাবে। পৃথিবীতে কোন জিনিষই অফুরন্ত নয়; এলোমেলো ভাবে এদের ব্যবহার করে কখনই চরম উপকার পাওয়া যাবে না। কাজের গুরুত্ব হিসাবে নির্দিষ্টপরিমাণ সম্পদ বিভিন্ন কাজে লাগানোই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এই ভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্পদের ব্যবহারের পেছনে এক মহান উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করা। মানুষ বাঁচতে চায়, একথা ঠিক; কিন্তু মানুষ সুখ-শান্তিতে মানুষের মত বাঁচতে চায়, সমৃদ্ধি চায়, অন্য দেশের প্রগতির সঙ্গে সামনে এগিয়ে যেতে চায়। যে সব দেশ শিল্প-বাণিজ্যে অনেক খানি এগিয়ে গেছে, সেখানে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করার জন্য রাজস্বনীতির শরণাপন্ন হতে হয়; যারা ধনিক, তাদের উপর উঁচু হারে কর বসিয়ে সম্পদের পুনর্বিতরণের ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু যেসব দেশ শিল্প-বাণিজ্যে পিছিয়ে আছে, তাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা। কেউ কেউ হয়তো এই বলে আনন্দ পাবেন যে, শিল্প-বাণিজ্যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু তাঁরা কয়েকটি কথা ভুলে যান। ভারতে যেটুকু শিল্পবিস্তার বা বাণিজ্যের প্রসার হয়েছে তা এই দেশের

আয়তনের ও জনসংখ্যার অনুপাতে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। তারপর এ দেশে কেবল মাত্র ভোগব্যবহার্য সামগ্রী শিল্পেরই যৎকিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, উৎপাদন উপকরণ শিল্পের নয়। এই সব শিল্পের অধিকাংশ আবার বিদেশীদের হাতে, তাদের টাকায় পুষ্ট, তাদেরই স্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই কারণেই বলছি যে, এদেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করতে হলে প্রথমেই উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রসারের উপর নজর দিতে হবে। এবিষয়ে আমরা উপরেই আলোচনা করেছি।

উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মান উন্নততর করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে যা অবস্থা তাতে জীবনযাত্রার মান খুবই নেমে গেছে। এর জন্য প্রথমেই আমাদের দরকার, জীবনযাত্রার মানের একটা নিম্নতম সীমা নির্দেশ করে দেওয়া। এই প্রকার সীমানির্দেশ করতে হলে প্রথমেই আমাদের পরিবারের গঠন, বা একটি সাধারণ পরিবারে আয় করবার এবং খাবার কয়জন করে লোক থাকে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হবে এবং তার পরই দেখতে হবে এক একটি পরিবারে মোটামুটি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখবার জন্য খাদ্য, বাসস্থান, পরিধেয় প্রভৃতির কতখানি প্রয়োজন এবং বর্তমান সামগ্রীমূল্যে সেই প্রয়োজন মেটাবার জন্য কমপক্ষে কত আয় হওয়া চাই। এদেশে পরিবারের গঠন নির্ধারণ করা একটু শক্ত ব্যাপার। প্রায় সর্বত্রই একান্নবর্তী পরিবার থাকায় প্রত্যেকটি পরিবারের জনসংখ্যা বিভিন্ন প্রকারের। সে যাই হোক, বর্তমানে বিভিন্ন কেন্দ্রে শ্রমিকদের আয় ও ব্যয় নিম্নলিখিত প্রকার। পরপৃষ্ঠার সংখ্যা থেকে বেশ বোঝা যাবে যে, অনেক জায়গাতেই শ্রমিকদের আয়ে হয় কোন প্রকারে তাদের বর্তমান জীবনযাত্রা বজায় রাখা যায়, নয়তো তাও সম্ভবপর নয়। উক্ত সংখ্যাগুলি আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে :

স্থান ও শিল্প	পরিবার সংখ্যা	মাসিক গড় আয়	মাসিক গড় খরচ	ভোগব্যবহারের বিভিন্ন বিষয়ে খরচার শতকরা হার						উদ্বৃত্ত
				খাদ্য	পরিধেয়	ঘর ভাড়া	আলো ও জ্বালানি কাঠ	গৃহস্থালীর সরঞ্জাম	বিবিধ	
বোম্বাই (১৯২১-২২) সমস্ত শিল্প	২৪৩৭	৫২৷৬পাই	৪৭৸৶৫ পাই	৫২.৩২	৮.৪০	৭.৬৭	৭.২৯	২.২৬	১৮.০৬	৪৷৶১
সোলাপুর (১৯২৫) বস্ত্রবয়ন	৯০২	৩৯৸৶১০	৩৭৸/১১	৫২.৭৬	১২.৭০	৬.৭২	১০.১৮	১.০৮	১৬.৪৬	২৻১১
আহমেদাবাদ(১৯২৬) বস্ত্রবয়ন ও সাধারণ শ্রমিক	৮৭২	৪৪৷৵২	৩৯৷/৮	৫৭.৯০	৯.৪৫	১১.৭৪	৭.০৪	১.১৬	১২.৭১	৫/৬
বোম্বাই (১৯৩০) বস্ত্রবয়ন	৮৫	৫৫৲৯	৫১৻৪	৫৭.১১	৭.৩৩	১০.৫৮	৭.১২	৩.১৪	১৪.৭২	৩৷৵৫
কলিকাতা বস্ত্রবয়ন	১২৫	৩৪৷৵০	৩২/৬	৬৪.৯	৭.৫০	৪.৭৪	৭.১৩	১.৭২	১৪.০১	১৷/৬
মান্দ্রাজ-বস্ত্রবয়ন	৭৯	৩৩৸৩	৩২৷৷/৭	৬০.৭১	৩.৮৪	৮.২৯	৭.৫৪	০.২৯	১৯.৩৩	১৶৮

স্থান ও শিল্প	পরিবার সংখ্যা	মাসিক গড় আয়	মাসিক গড় খরচ	ভোগব্যবহারের বিভিন্ন বিষয়ে খরচার শতকরা হার						উদ্বৃত্ত
				খাদ্য	পরিধেয়	ঘর ভাড়া	আলো ও জ্বালানি কাঠ	গৃহস্থালীর সরঞ্জাম	বিবিধ	
কোইম্বাটোর বস্ত্রবয়ন	৯৬	২৮৶২	৩৩৲৩	৫৭.৭০	৬.২১	৫.০৫	৬.৮১	০.৪৪	২৩.৭৯	৪৸/১
কানপুর-বস্ত্রবয়ন, ইঞ্জিনিয়ারিং চর্মশিল্প	৭২৯	২৫৷৶	২৪৸৵১০	৪৮.১২	৭.৪৪	৮.৭৬	৬.০২	১.৭৫	২৭.৯৯	ঘাট্‌তি ৷৴৮
নাগপুর-বস্ত্রবয়ন ও অন্যান্য শিল্প	১০২	২৯৷০	৩০৷০	৫৮.১৩	৮.৩২	২.১৫	৭.৯৯	১.৫৬	২১.৮৭	১৲ ঘাট্‌তি
সংযুক্তপ্রদেশ রেলওয়ে	২৫৩	২২৲	—	৫৭.৩০	৮.৮০	৪.৮০	৬.১০	২.১০	২০.৯০	—
বিহার ও উড়িষ্যা রেলওয়ে	২১৩	২৪৲	—	৫৯.১০	৬.৮০	১.৮০	৪.৪০	১.৮০	২০.১০	—
বাংলা-রেলওয়ে	১৫৬	২৭৵৪	—	৫২.৭০	৫.৭০	৪.৬০	৪.৪০	১.৪০	৩১.২০	—

এইবারে আমরা জীবনযাত্রার মানের একটা নিম্নতন সীমা নির্দেশ করার চেষ্টা করব। বোম্বাই এবং আহমেদাবাদে সাধারণ পরিবারের লোকসংখ্যা হল যথাক্রমে ৪·৮০ এবং ৪·০০ ।এবং বাংলা, বিহার-উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের যথাক্রমে ৫·৩১, ৫·৫৩ এবং ৫·৮৮। তাহলে বলা চলে যে, গড়ে সারা ভারতে এক একটি পরিবারে ৫ জন লোক আছে। এদের সবাই পূর্ণবয়স্ক নয়; স্ত্রীলোকদেরও ভোগ-ব্যবহার শক্তি পুরুষদের চাইতে কম। এইভাবে 'খানেওয়ালা'র সংখ্যা মোটামুটি ভাবে পরিবার প্রতি ৩·৬। অন্যান্য বাধ্যবাধকতার কথা ধরে মোট ৪ জন পূর্ণবয়স্ক 'খানেওয়ালা' নিয়ে এক একটি পরিবার, একথা ধরে নেওয়া যাক। এইবারে আমরা খাদ্য বরাদ্দ বিষয়ে আলোচনা করব। এদেশের বিভিন্ন অংশ থেকে যে সব সংখ্যা সংগৃহীত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, খাদ্য সংগ্রহ করতেই প্রায় অর্ধেক আয় নিঃশেষ হয়। এখানে একটা কথা বলি। খাদ্যের প্রকারভেদের উপর শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা অনেকখানি নির্ভর করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শ্রমিকেরা যেমন দুধ, মাছ, মাংস প্রভৃতি অধিক পরিমাণ ব্যবহার করে, তাদের গড় আয়ও তেমনি বেশী; সীমান্ত প্রদেশের শ্রমিকদের গড় আয় যেখানে ৩৮।৶৪ পাই, সেখানে বিহারী শ্রমিকদের গড় আয় মাত্র ২৩৴৭ পাই। তাই বৈজ্ঞানিক ভাবে নির্বাচিত পুষ্টির উপযোগী খাদ্য নির্বাচন করা কর্তব্য। বিশেষজ্ঞ-দের মতে পুষ্টির দিক থেকে নিম্নলিখিত পরিমাণ খাদ্য বিশেষ উপযোগী হবে: আউন্স হিসাবে পরিমাণ ধরা হয়েছ।

দৈনিক পূর্ণবয়স্ক লোক পিছু	দৈনিক পূর্ণাঙ্গ লোক পিছু
দৈনিক সাধারণ খাদ্য············১৬	ফল········· ·······২
ডাল·········৩	তৈলজাতীয় উপাদান · ১·৫
শর্করা ······ ২	দুধ বা মাংস ········ ৮
শাকশব্জী ··· ৬	মাছ ও ডিম········ ২·৮

উপরে যে খাদ্যতালিকা দেওয়া হল তাতে বৈজ্ঞানিক ভাষায় ২৬০০ ক্যালরি শক্তির খাদ্য হয়। খাদ্যের কিছু অপচয় হয়, একথা ধরে ২৮০০ ক্যালরি শক্তির

খাদ্য একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের পক্ষে দৈনিক প্রয়োজন, একথা বলা চলে। যুদ্ধ-পূর্ব সামগ্রী-মূল্যে এই পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করতে মাথা পিছু মাসিক খরচা পড়বে ৫৲ টাকা থেকে ৬৲ টাকা। এই হিসাব অনুসারে চার জন ভোক্তার জন্য মাসিক খরচ ২০৲ থেকে ২৪৲ টাকা পড়বে। যুদ্ধ-পূর্ব সামগ্রী-মূল্যের তুলনায় বর্তমান সামগ্রী-মূল্য অনেক বেশী। এ অবস্থায় শুধু ৫০৲ থেকে ৬০৲ টাকা পর্যন্ত এক একটি পরিবারের খাদ্য বিষয়ে খরচা করা উচিত। এ দেশের অনেক পরিবারের মোট আয়ই ৬০৲ টাকা হয় না। এ যে শুধু শিল্প ও কৃষিশ্রমিকের বেলায়ই সত্যি তা নয়, অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরও এই অবস্থা। এই সামান্য আয়ের মোটটাও আবার খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করতে খরচা করা চলে না; ঘর-করনার প্রয়োজনীয় আরও সমস্ত সামগ্রী ঐ আয় থেকেই কিনতে হয়। একটু আগেই বললাম যে, আয়ের শতকরা ৫০ ভাগই খাদ্য-সামগ্রীর পেছনে ব্যয় করা হয়। এই হিসাব অনুসারে যারা ৬০৲ টাকা রোজকার করে, তারা মাত্র ৩০৲ টাকার খাদ্য কিনে থাকে, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্যালরির অর্ধেক মাত্র পায়। বর্তমানে ৬০৲ টাকার নীচে যাদের আয়—এদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী—তারা ১৪০০ সংখ্যক ক্যালরির খাদ্যও পায় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতীয় জনসংখ্যার মোটা একটা অংশ শুধু অর্ধভুক্তই নয়, অভুক্তও বটে। পুষ্টির পক্ষে উপযোগী খাদ্য যদি দেশের বর্তমান জাতীয় আয় থেকে পেতে হয়, তাহলে এই আয়ের মোট অংশই শুধু খাদ্যের জন্য খরচ করা প্রয়োজন। এই কারণে খাদ্যবিষয়ক খরচ যদি মোট সাংসারিক খরচের অর্ধেক হয়, তাহলে একটা অতিসাধারণ জীবনযাত্রার মান এদেশে আনতে হলেও কমপক্ষে জাতীয় আয় দ্বিগুণ হওয়া উচিত। তারপর একথাও মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান উৎপাদন ও সমাজ-ব্যবস্থায় আয় কোন দিনই সমভাবে জনসাধারণের হাতে গিয়ে পড়ে না; ধনিকেরাই ধনিক হতে থাকে। এ অবস্থায় জাতীয় আয় দ্বিগুণ করলেই যে জনসাধারণের জীবনযাত্রার নিম্নতম মান নিরাপদ হতে পারবে তা নয়; কেন না, জাতীয় আয়ের মোটা একটা অংশ ধনিকদেরই হাতে গিয়ে পড়বে। উপযুক্ত

রাজস্বনীতির প্রবর্তন করেও সহসা এই আয়ের পুনর্বিতরণ করবার চেষ্টা করা চলবে না ; কেননা, আজও যখন উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রসারের জন্য আমাদের ধনিক-দের সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করতে হয়, তখন এই প্রকার রাজস্বনীতিতে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারে মস্ত বিঘ্ন উপস্থিত হবে। অতএব জাতীয় আয় অন্ততপক্ষে তিনগুণ বাড়াবার উদ্দেশ্যেই আমাদের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

খাদ্যের পরেই প্রয়োজনীয়তা হিসাবে পরিধেয় বস্ত্রাদির স্থান। খাদ্যের ন্যায় পরিধেয় বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তাও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এক প্রকার নয়। কাপড়ের প্রকার ও পরিমাণ সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে অনেকখানি বিভিন্ন। কিন্তু একথা কেউই অস্বীকার করবে না যে, ভারতের জনসাধারণ আজ অর্ধনগ্ন। যুদ্ধের পূর্বে গড়ে মাথা পিছু ১৫ গজ কাপড়ের ব্যবহার হত ; এখন এই পরিমাণ আরও কম। জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত জাতীয় পরি-কল্পনা সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে, ভারতীয় অবস্থায় কম পক্ষে মাথা পিছু ৩০ গজ কাপড় দরকার। একথা অবশ্য সত্য যে, ভারতীয় আবহাওয়ায় পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় অনেক কম কাপড়েই চলতে পারে ; তাতে জনসাধারণের কর্মদক্ষতার উপর কিছুমাত্র বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হবে না। কিন্তু তাই বলে মনুষ্য জীবনে লজ্জা নিবারণের জন্য অন্ততপক্ষে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাপড়ের প্রয়োজন। মাথা পিছু ৩০ গজ কাপড় এই প্রকার চাহিদাই মাত্র মেটাতে পারে। এইভাবে পরিধেয় বস্ত্রাদির জন্য বর্তমান মাথা পিছু যা খরচ পড়ছে তার চাইতে দ্বিগুণ খরচ পড়বে, অর্থাৎ মাথা পিছু গড়ে ৭৲ টাকা লাগবে। পরিধেয় বস্ত্রাদি বিষয়ে আরও একটু স্বচ্ছন্দভাবে থাকতে হলে খরচ আরও বেশী পড়বে।

এইবার বাসস্থানের কথা। বাসস্থানের প্রয়োজন নির্ভর করে সামাজিক প্রথা ও পরিবারের জীবনযাত্রার মানের উপর। স্থানভেদে এই প্রয়োজনের তারতম্য হয়ে থাকে। বোম্বাই-এর 'বাড়ীভাড়া তদন্ত কমিটি'র সিদ্ধান্ত অনুসারে একটি সাধারণ পরিবারের কম পক্ষে ১৮০ বর্গফুট জমি দরকার। অন্যান্য

অঞ্চলে, যেখানে লোকের বসতি ঘন নয়, সেই সব জায়গায় এক একটি পরিবার আরও বেশী জমি পেতে পারে। বর্তমানে যা অবস্থা তাতে এর ছয় ভাগের এক ভাগ জমিও পরিবার পিছু পড়ে না। বোম্বাইতে এর পরিমাণ ২৭·৫৮ বর্গ ফুট, আহমেদাবাদে ৪৩ বর্গ ফুট এবং শোলাপুরে ২৪ বর্গ ফুট। অন্যান্য প্রদেশেও প্রায় অনুরূপ অবস্থাই। বাংলায় জনসংখ্যার চাপ বেশী হওয়ায় অবস্থা আরও শোচনীয়। বোম্বাই বাড়ীভাড়া তদন্ত কমিটির সিদ্ধান্তই যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে, বোম্বাই বস্ত্রবয়ন শিল্প-শ্রমিকদের অবস্থা তদন্তকারী কমিটির হিসাব অনুসারে, বাড়ী ভাড়া বাবদ বোম্বাইএ খরচ পড়বে ১২৲ টাকা, আহমেদাবাদে ৬৷৷০ থেকে ৭৲ টাকা এবং সোলাপুরে ৬৲ টাকা থেকে ৪৷৷০ টাকা। এইভাবে জীবনযাত্রার একটা মোটামুটি মান বজায় রাখতেই উপরের তিন বিষয়ে যুদ্ধ-পূর্ব সামগ্রীমূল্য অনুসারে স্থানভেদে ৩৪৲ টাকা থেকে ৪৩৲ টাকা খরচ পড়বে এবং বর্তমান সামগ্রীমূল্যে খরচ পড়বে এই সংখ্যার দ্বিগুণেরও কিছু বেশী। এ ছাড়া আরও অনেক প্রকার খরচ আছে। এই সব বিবিধ খরচের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই স্বাস্থ্যের কথা বলা দরকার। স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট ব্যবস্থা না থাকায় যে প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এদেশে মৃত্যুর হারই যে বেশী তা নয়; অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশের জনসাধারণের গড় পরমায়ুও অনেক কম। নিম্নলিখিত তুলনামূলক সংখ্যা থেকেই তা বেশ বোঝা যায়।

দেশ	গড় পরমায়ু		১০০০ প্রতি বার্ষিক মৃত্যুর হার
	পুরুষ	স্ত্রী	
ক্যানাডা	৫৯ বৎসর	৬১ বৎসর	১০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৬১ ,,	৬৪ ,,	১১
জার্মানী	৬০ ,,	৬৩ ,,	১২
ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ	৬০ ,,	৬৪ ,,	১২

	বৎসর	বৎসর	
(আয়ারল্যাণ্ডের স্বতন্ত্র অংশবাদে)			
অষ্ট্রেলিয়া…………	৬৩ „	৬৭ „	১০
জাপান……………	৪৭ „	৫০ „	১৮
ভারতবর্ষ… ……	২৭ „	২৭ „	২২

এবিষয়ে অন্য দেশের সমকক্ষ হতে হলে আমাদের দুই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে; প্রথমে, ব্যাধির প্রতিরোধক ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়, ব্যাধির আরোগ্যমূলক ব্যবস্থা। বর্তমানে ব্যাধিপ্রতিরোধক ব্যবস্থা নামমাত্রই রয়েছে, তা ভারতের যে-কোন স্থানের সাধারণ স্বাস্থ্য থেকেই বোঝা যায়। জনপদ-গুলির স্বাস্থ্যরক্ষার ভার স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ এই সব প্রতিষ্ঠানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও দেশের প্রায় সর্বত্রই স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে এক ব্যাপক ঔদাসীন্য দেখা যায়। বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করাও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার একটা বিশেষ অঙ্গ; ভারতের অনেক যায়গাতে আজও তার সুব্যবস্থা নেই। ব্যাধি আরোগ্যের ব্যবস্থাও এদেশে সন্তোষজনক নয়। সহরে চিকিৎসকদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও সারা দেশের অবস্থা নিম্নোক্ত প্রকারঃ—(১৯৩৯ সালের সংখ্যা)।

প্রতি ৪১০০০ লোকের জন্য একটি হাসপাতাল বা ডাক্তারখানা;

প্রতি ৪০০ লোকের জন্য হাসপাতালে একটি স্থান;

প্রতি ৯০০০ লোকের জন্য একজন ডাক্তার; এবং

প্রতি ৮৬০০০ লোকের জন্য একটি ধাত্রী।

প্রত্যেকটি গ্রামে যদি একটি ডাক্তারখানা খুলতে হয় এবং তাতে যদি একজন পাশকরা ডাক্তার, একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও একজন ধাত্রী রাখা হয়, তাহলে বোম্বাই পরিকল্পনার হিসাব অনুযায়ী তার প্রাথমিক খরচা প্রায় ২০০০৲ টাকা এবং গৃহ-সংস্কার খরচা বাদে বার্ষিক চলতি খরচা ২০০০৲ টাকা পড়বে। এই পরিকল্পনায় সহর অঞ্চলে প্রতি ১০০০০ লোকের জন্য একটি করে হাসপাতাল

প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে প্রাথমিক খরচ পড়বে ৫০০০০ টাকা এবং গৃহ-সংস্কার খরচা বাদে বার্ষিক চলতি খরচা ২৮০০০ টাকা। প্রত্যেকটি হাসপাতালে চল্লিশ জন রোগীর স্থায়ী ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া প্রত্যেকটি মাঝারি রকম সহরে এক একটি শিশু ও মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান থাকবে; এতে এক কালে ৩০ জন গর্ভিণীর ব্যবস্থা থাকবে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ব্যাধির জন্য বড় বড় সহরে বিশেষ হাসপাতালেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

এই ত হ'ল রাষ্ট্রের ন্যূনতম কর্তব্য। ব্যক্তিবিশেষকেও আপন স্বাস্থ্য ও আপন পরিবারের স্বাস্থ্য বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে এবং তাদের আয়ের একটা অংশ এবিষয়ে খরচ করতে হবে। এসম্বন্ধে যে সব তদন্ত করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, সাধারণ লোকেরা স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ নয়; স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বোম্বাই-এর শ্রমিকেরা পরিবার প্রতি গড়ে ১৵৯ পাই খরচ করে, জামসেদপুরের ।৶৮ পাই এবং বিহারে কয়লার খনির শ্রমিকেরা মাত্র ৶৪ পাই; অথচ কয়লার খনির এই সব শ্রমিকেরাই মদ্যপান প্রভৃতি যথেচ্ছাচারে—যাতে স্বাস্থ্যবিনাশের আরও সুযোগ করে দিচ্ছে—প্রায় ৷৷৵৩ পাই খরচ করে।

শরীরের স্বাস্থ্যের ন্যায় মনের স্বাস্থ্যও প্রয়োজন এবং এর জন্য চাই শিক্ষা, যথেষ্ট পরিমাণ আনন্দ ও চিত্তবিনোদন-ব্যবস্থা। এবিষয়ে এত বেশী আলোচনা ইতিপূর্বেই হয়ে গেছে এবং ওয়ার্ধা পরিকল্পনা, সার্জেণ্ট শিক্ষা পরিকল্পনা প্রভৃতি খাড়া করা হয়েছে যে, এবিষয় আর কিছু বলা যেমন নিষ্প্রয়োজন তেমনই অসম্ভব। শুধু এইটুকু বলা চলতে পারে যে, এই সব পরিকল্পনাকে ব্যাপকভাবে অদূর ভবিষ্যতে কার্যকরী করা উচিত। এবিষয়ে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকেই নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং ব্যক্তিরও ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না। শরীর ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষা কল্পে যুদ্ধপূর্ব সামগ্রীমূল্যে পরিবার-পিছু ১৫ টাকা থেকে ২০ টাকা খরচ হওয়া উচিত। এই ভাবে জীবনযাত্রার একটা সাধারণ মান বজায় রাখার জন্যও যুদ্ধ-পূর্ব ক্রয়-শক্তির হিসাবে পারিবারিক আয় স্থানভেদে ৪৯ টাকা থেকে ৬৩ টাকা পর্যন্ত

হওয়া উচিত। বর্তমান সামগ্রীমূল্যে এই আয় উপরিউক্ত সংখ্যার দ্বিগুণেরও কিছু বেশী হওয়া দরকার।

এ ত গেল জীবনযাত্রার সাধারণ মানের কথা। এবারে একটি ছোটখাটো প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বর্তমান আলোচনা শেষ করব। প্রসঙ্গটি ছোট হলেও পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই এর প্রতি একটা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে, এবং অবস্থা অনুসারে এর বিরুদ্ধে যথাসম্ভব জেহাদ ঘোষণা করেছে। আমরা অভাব থেকে মুক্তির কথা বলছি। প্রসঙ্গটি এদেশে নূতন না হলেও আজ নূতন ভাবে দেখা দিয়েছে; তাই উপসংহারে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। যখনই নির্দিষ্ট জীবনযাত্রার মানের অনুপাতে আয় না হয়, তখনই অভাব দেখা দেয়, একথা বলা চলে। 'অভাব' ও 'দারিদ্র্য,' এদের চলতি ভাষায় আমরা একার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করে থাকি। অভাব দারিদ্র্য-জনিত; তবে 'দারিদ্র্য মোচন' এই কথাটির ভিতর যেন সহানুভূতির একটা সুর বাজছে। 'অভাব থেকে মুক্তি' এই কথাগুলির একালীন অর্থনৈতিক তাৎপর্যে জনসাধারণের একটা দাবীর কথাই মনে হয়। এই দাবী তারা জানাচ্ছে সমাজ-ব্যবস্থার কাছে। এই যে একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যক্তির জন্য সমাজের দায়িত্ব, এই দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় সমাজের ও একান্নবর্তী পরিবারের পরিবেশে নূতন না হলেও পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় বা যুগের প্রারম্ভ ঘোষণা করেছে। আর্থিক বিচারে আমরা অভাবের তিনটি কারণ দেখতে পাই—প্রথম, পরিবারে জনসংখ্যার অনুপাতে রোজকারী লোকের সংখ্যা কম বা আয় কম; দ্বিতীয়, কোন না কোন কারণে আয় করবার শক্তির পথে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হওয়া, যেমন ব্যাধি, বার্ধক্য বা দুর্ঘটনা জনিত অকর্মণ্যতা; এবং তৃতীয়, স্বাভাবিক ভাবে বা মন্দার কারণে কাজের অভাব। এই তিনটি কারণই এদেশে পূর্ণোদ্যমে কাজ করছে; তাই অভাব থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার সমস্যা সব চেয়ে এই দেশে জটিল। এই কারণে দেশের সামাজিক, আর্থিক বা রাজনৈতিক কোন প্রকার উন্নতিই হতে পারছে না। অভাবমোচনের ফলে একদিকে জনসাধারণের আর্থিক কল্যাণ

সাধিত হবে, অন্যদিকে এদের ক্রয়শক্তি ও চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ায় শিল্পের সমৃদ্ধি হবে। একটা সামান্য উদাহরণ দেওয়া যাক। বর্তমানে মাথা পিছু বার্ষিক ১৬ গজ কাপড়ের ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের উপরের আলোচনায় দেখালাম যে, কমপক্ষে ৩০ গজ কাপড় দরকার। এই পরিমাণ কাপড়ের চাহিদা যখনই দেশে গজিয়ে উঠবে, তখন সেই কাপড় সরবরাহ করার জন্য বস্ত্রবয়ন শিল্পের বিস্তার করতে হবে। এই ভাবে প্রত্যেকটি ভোগব্যবহার্য সামগ্রীর উৎপাদন শিল্প ও উৎপাদন উপকরণ শিল্পের বিস্তার অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে নিয়োগের পরিমাণও বাড়বে। অনেক নূতন নূতন শিল্প গড়ে উঠবে।

কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, সত্যি সত্যিই অভাব থেকে মুক্তি আমাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় সম্ভবপর কি না। এদেশে যত প্রকার অভাব যত ভাবে মাথা চাড়া দিয়েছে, এবং এদেশের আর্থিক অবস্থা যে প্রকার, তাতে অভাব থেকে মুক্তির যে কোন পরিকল্পনাই কার্যকরী করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। নবীন ভারতীয় পরিকল্পনা সংঘ কর্তৃক প্রচারিত "অভাব থেকে মুক্তি" নামক পুস্তিকায় এ খরচের বিষয়ে খানিকটা আভাষ দেওয়া হয়েছে। এদেশের বেকারদের বিষয়ে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরাইয়া যে সংখ্যা সংগ্রহ করেছেন, সেই সংখ্যা অনুসারে প্রায় ৪।৫ কোটি লোক বেকার। এছাড়া আরও অনেক লোক অর্ধ বেকার। দৈনিক চার আনা হিসাবে এদের সাহায্য দিলে বৎসরে খরচ পড়বে ৩৭০ কোটি টাকা। দৈনিক চার আনায় আজ কাল কিছুই হয় না। জীবনযাত্রা নির্বাহের খরচ প্রায় চার গুণ বেড়ে গেছে। সেই অনুসারে বেকারদের সাহায্য দিতে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা খরচ পড়বে। আরও অসুবিধার কারণ হল এই যে, যে তহবিল থেকে এই টাকা দেওয়া হবে, সেই তহবিল আসবে কোথা থেকে? বেকার যারা তারা এই তহবিলে আপন দেয় অংশ কি করে দেবে? এদেশে যারা বেকার তাদের অনেকেরই আয়ের কোন সূত্রই নেই। শিক্ষিত বেকারদের জীবনযাত্রার মান উঁচু, অথচ বেকার সমস্যা এদের মধ্যেই সব চেয়ে বেশী। সামাজিক নিরাপত্তা বা বীমার আর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা। সামাজিক

স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য কত খরচ হতে পারে, এসম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট সংখ্যা আজও সংগৃহীত হয় নি। ১৯৩৭-৩৮ সালে শুধু ব্রিটিশ ভারতে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল; সমস্যাটির গুরুত্ব অনুসারে কম পক্ষে ৫০ কোটি টাকা স্বাস্থ্য-রক্ষা বিষয়ে ব্যয় হওয়া উচিত। এই ভাবে সামাজিক নিরাপত্তার প্রত্যেকটি দিক যদি মজবুত করতে হয় তাহলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। একথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে এই অর্থব্যয় আর্থিক দিক থেকে ষোল আনাই খরচের ঘরে গিয়ে পড়বে না। জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উদ্যম প্রভৃতির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কর্মশক্তির স্ফুরণ হবে, এদের সহযোগিতায় নয়া আর্থিক ব্যবস্থা সর্ব-সুন্দর হয়ে উঠবে। পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু ঠিকই বলেছেন যে, এত বড় বড় যুদ্ধ পরিচালনায় যদি টাকার অভাব না হয়ে থাকে তাহলে জনসাধারণের, এবং সেই সঙ্গে আর্থিক ব্যবস্থার, কল্যাণে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হবারও কোন কারণ দেখা যায় না।

সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে ভারতীয় সমস্যা অন্যদেশের সমস্যা থেকে একে-বারে পৃথক। এখানে একথা মনে রাখা দরকার যে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক ব্যবস্থা কেবল সেই সব দেশেই সফল হতে পারে যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থার যথেষ্ট বিস্তার হয়েছে, এবং বেকার সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করেনি। অন্যান্য দেশে সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা, জাতীয় সম্পদ পুনর্বিতরণের একটা প্রকৃষ্ট উপায় মাত্র। এদেশে ধনবিতরণ বৈষম্য রয়েছে; কিন্তু এদেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ এত কম, এবং উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার এত কম হয়েছে যে, সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক ব্যবস্থাকে ধনবিতরণ বৈষম্য দূর করার উপায় হিসাবে ব্যবহার করলে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারে বিশেষ বাধা পড়বার সম্ভাবনা। এমন কি ইংলণ্ডের মত দেশেও, যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থার যথেষ্ট প্রসার হয়েছে এবং বেকার সংখ্যা খুব গুরুতর আকার ধারণ করে নি, সেখানেও বেভারিজ পরিকল্পনার ন্যায় একটা মাঝারি রকমের পরিকল্পনা পূর্ণনিয়োগের পথে বাধা সৃষ্টি না করে ষোল আনা প্রয়োগ করা সম্ভবপর কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু তাই

বলে অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকাও যুক্তিযুক্ত নয়। ষোলআনা সামাজিক নিরাপত্তা আমাদের বর্তমান অবস্থায় সম্ভবপর না হতে পারে; কিন্তু যথাসম্ভব এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, পূর্ণনিয়োগের আবির্ভাবেও এই সব সমস্যার অনেকখানি সমাধান হতে পারবে। স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক সংগঠন যাই হোক না কেন, যাঁরা এই সংগঠনের নেতৃত্ব করবেন তাঁদের বিভিন্ন আদর্শবাদের "বাদ" নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবে না। "বাদ"কে বাদ দিয়ে অতীতের দিকে ঠেলে ধরে, জাতিকে গৌরবমণ্ডিত, শ্রীসম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে হবে। এঁরা যদি "বাদ" থেকে দূরে এসে ন্যায়ের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে নিরপেক্ষভাবে জাতির কল্যাণ চিন্তা করেন, সমাজে আর্থিক নব বিধান আনতে পারেন, তবেই পৃথিবীর বুকে গড়ে উঠবে নবীন ভারত; আর এই নবীন ভারতই পাশ্চাত্য জড়বাদের বা বস্তুনিষ্ঠার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পৃথিবীতে শাশ্বত শান্তি আনতে সক্ষম হবে। ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের বিফলতা সূচিত হবে, প্রাচ্যদেশই কেবলমাত্র এ সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু তার জন্য চাই এক নবজাগ্রত জাতি। ভারতকেই এ বিষয়ে এগিয়ে যেতে হবে। জয় হিন্দ্ !!!

প্রথম প্রবন্ধের পাদটীকা

১। ভারতবর্ষ বহুসম্প্রদায়-অধ্যুষিত দেশ। একবার রাষ্ট্রবিভাগের নীতিকে স্বীকার করিয়া লইলে, ভারতীয় রাষ্ট্রকে যে কত খণ্ডে বিভক্ত করিতে হইবে, তাহা বলা কঠিন।

২। "Baneful influence of Personalism" : Priestley : The Mexican Nation. ভারতবর্ষের রাজনীতিকে যুক্তি ও ন্যায়ের ভিত্তি হইতে বিচ্যুত করিবার যে সকল চেষ্টা বর্তমানে চলিতেছে, তাহাতে দুষ্ট ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হইবার আশংকা যথেষ্ট। মেক্সিকোতে Santa Annaকে যেমন "Stormy petrel of Mexican politics" বলা হইত, ভারতের কোন কোন রাজনীতিজ্ঞকে তেমনি 'Stormy petrel of Indian politics' বলা চলে। ঝড় যদি উঠেই, তবে তাহার গতি কি আর লেখনী নিরূপণ করিতে পারিবে?

দ্রষ্টব্য—Williams : People and Politics of Latin America Vol. 2

৩। সোশ্যালিস্ট্ ডিমক্রেসী এবং সোশ্যাল ডিমক্রেসী দুইটি পৃথক বস্তু। সোশ্যাল ডিমক্রেসী ধনিক-শ্রমিকের সম্বন্ধ পর্যালোচনা করিবার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভংগী। ইহার বিপরীত কম্যুনিজ্‌ম্। সোশ্যালিস্ট্ ডিমক্রেসী একটি স্বতোগ্রাহ্য সমাজব্যবস্থা—লিবারেল্ ডিমক্রেসী ইহার উদ্ভবস্থল। কম্যুনিজ্‌ম্ এবং ডিমক্রেসী যদি প্রকৃত হয়, তবে তাহা সমাজতন্ত্র অভিমুখী হইবে না কি?

৪। দ্রষ্টব্য—৺ অনাথগোপাল সেন : 'জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজীর অর্থনীতি'।

৫। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থাকিলেই যে এক রাজ্যবন্ধনে বাঁধা পড়িতে হইবে, এমন কোনো নিয়ম নাই। নতুবা, ইউরোপে এতগুলি 'স্বাধীন' দেশ

থাকিতে পারিত না। তবে, অর্থনীতিবিদ্‌রা রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধিটাকে দূর করিয়া দিতে পারিলেই বাঁচেন। অথচ ইহা যে সুদূর কল্পনা, এ জ্ঞানও তাঁহাদের আছে।

৬। ইনিই অর্থশাস্ত্রী গান্ধী। গান্ধী-অর্থনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণাংগ আলোচনার একান্ত অভাব। কল্পনার দিক দিয়া অধ্যাপক অগ্রবাল, এবং তত্ত্বের দিক দিয়া মিনু মাসানী, অধ্যাপক দাতওয়ালা, আঞ্জারিয়া, নির্মল বসু অংশত আলোচনা করিয়াছেন। স্বর্গত অনাথগোপাল সেন গান্ধীনীতির মূল কথাটি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা বড়ো কিছু আশা করিতেছিলাম, এমন সময় তাঁহার লোকান্তর ঘটিল।

৭। Shakespeare: Macbeth. Act I. Scene VII. ll. 26-28.

৮। ইংরাজি হইতে ভাবানুবাদ। মূল নিবন্ধটির জন্য দ্রষ্টব্য—ইংরাজি 'হরিজন' পত্রিকা, ২৯. ৯. ১৯৪০।

৯। 'কেহ কেহ বলিবেন, মূল অর্থনীতিশাস্ত্রের জন্ম ফ্রান্সে। তাহা হইলেও অর্থনীতিশাস্ত্রের যে ধারাটি রাষ্ট্রের হাতে আর্থিক সুব্যবস্থার ভার তুলিয়া দিতে সমুৎসুক, তাহার জন্মস্থান প্রধানত ইংলণ্ডে। এ প্রসংগে ফেবিয়ান্ (Fabian)-মার্কা সমাজতন্ত্রের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

১০। ডক্টর কণ্ড্‌লিফ্ (J. B. Condliffe) তাঁহার Reconstruction of World Trade গ্রন্থে Economics ও Political Economyর মধ্যে যে প্রভেদ দেখাইয়াছেন, তাহাই এ স্থলে স্মরণীয়।

১১। 'Economics of Khadi' গান্ধীজির সম্বন্ধে অন্যতম প্রধান পুস্তক। তাঁহার অর্থনীতিতে খাদি কেন্দ্র-বিন্দু। খাদি তাঁহার কাছে স্বাবলম্বন ও সারল্যের প্রতীক। 'Young India' পত্রিকার ৮. ২. ২১ তারিখের সংখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন,—"চরকা বাণিজ্য-সংগ্রামের প্রতীক নহে, বাণিজ্যশান্তির তাহা মন্ত্র। চরকা স্বাবলম্বনের বাণী। যন্ত্রাশ্রয়ী শিল্পসংরক্ষণের নিমিত্ত বিশ্ব-

শান্তি-ঘাতক নৌবহর চাই। তাহার খোরাক কাঁচামাল সংগ্রহের নিমিত্ত নৌ-বহরের হুমকি দরকার। চরকা রক্ষার্থ ইহার কোনো কিছুরই প্রয়োজন নাই।"

১২। ভারতবর্ষে সাত লক্ষ গ্রাম, প্রতি সাতটি গ্রাম লইয়া গড়িয়া উঠিবে এক লক্ষ স্বাবলম্বী পল্লীসমাজ। অবশ্য, এই হিসাব যে অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া নিতে হইবে, এমন নহে; কিন্তু গ্রামসমাজগুলির আর্থিক বুনিয়াদ এইরূপে বিকেন্দ্রীভূত হইয়া গড়িয়া উঠিবে।

১৩। ইংরাজি হইতে ভাবানুবাদ। দ্রষ্টব্য—ইংরাজি 'হরিজন' পত্রিকা, ৩০. ১২. ৩৪।

১৪। কোনো কোনো সমাজতন্ত্রবাদী সমালোচক এই ভুল করিয়াছেন। যে হেতু গান্ধীজী আর্থিক জীবনের উপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিস্তার পছন্দ করেন না, অতএব তিনি অবাধ ধনতন্ত্রে বিশ্বাসী, এ ধারণা ঠিক যুক্তিসহ নয়। গান্ধীদর্শনে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে স্বেচ্ছা-সমবায়ী সমাজের স্থান গেছে এবং সে-সমাজ আমাদের ক্ষুদ্র, পঞ্চায়েতি সমাজ। তৃতীয় অধ্যায়ে গান্ধীজির এই মতবাদের আলোচনা করা হইয়াছে।

১৫। অনুবাদ। Young India পত্রিকা, ১৬. ২. ২৪।

১৬। দ্রষ্টব্য—ইংরাজি 'হরিজন' পত্রিকা ১২. ২. ১৯৩৮।

১৭। গান্ধীজি বলেন, "প্রাণহীন যন্ত্রকে দেহ-যন্ত্রের স্থানে বসাইয়া এই অনুপম দেহ-যন্ত্রকে অযত্নে আমরা অসাড় ও অকেজো করিয়া ফেলিতেছি। কাজের জন্যই দেহ, তাহা দিয়া ষোলো আনা কাজ করিতে হইবে, ইহা ভগবানের বিধান।" মূল নিবন্ধটির জন্য দ্রষ্টব্য—'Young India' ৮. ১. ১৯২৫।

১৮। Sismondi ফরাসী অর্থনীতিবিৎ। তাঁহার Nouveaux Principes গ্রন্থে তিনি শিল্প-বিপ্লবের বিপুল লোভ ও অবাধ বিস্তারকে নিন্দা করিয়াছেন। অধ্যাপক্ জিদ্ (Gide) এবং রিস্ত্ (Rist) প্রণীত History of Economic Doctrines গ্রন্থে উপরি-উদ্ধৃত উক্তিটি পাওয়া যাইবে। পৃ. ১৮০—৮১।

১৯। অধ্যক্ষ অগ্রবাল তাঁহার The Gandhian Plan নমেক গ্রন্থে আধুনিক বেকার-বীমার ব্যবস্থাকে "Unnatural, degrading and harmful" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাকে আমরা গান্ধীজির মতের প্রতিধ্বনি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। কেন না মানুষের আর্থিক জীবনে রাষ্ট্রের পরোক্ষ হস্তক্ষেপও গান্ধীজির মনঃপূত নয়।

২০। ভাবানুবাদ। ইং 'হরিজন' পত্রিকা ১৬. ১১. ১৯৩৪।

২১। পূর্বে বলিয়াছি, (পৃ. চার দ্রষ্টব্য) গান্ধীজির অর্থনীতি ব্যক্তি-চরিত্রের সদ্ব্যবহার করিবার একটি উপায় মাত্র। ব্যক্তিকে ভোগ্য সামগ্রী দেওয়ার অর্থ তাহাকে বিলাসী করিয়া তোলা ; যে যন্ত্র মানুষকে অলস রাখিয়া শুধু ভোগ্য-বস্তুর বিধান করে, তাহা দুর্নীতিমূলক। আলাদিনের প্রদীপের মতো যন্ত্র (বণ্টনের ব্যবস্থা যতই সুচারু হোক্ না কেন) গান্ধীজির কাম্য নয়। তিনি বলেন :

"জটিলতম যন্ত্র-ব্যবহারেও আমার আপত্তি নাই, যদি তাহাতে ভারতের হীন দারিদ্র্য এবং যন্ত্র-সঞ্জাত ক র্ম হী ন তা ঘুচাইতে পারা যায়।" (Young India পত্রিকা, ৩. ১১. ১৯২১)।

২২। 'Young India' পত্রিকা (৮. ১. ২৫) হইতে অনুবাদ।

২৩। 'Young India' পত্রিকা (১৩. ১১. ২৪) হইতে অনুবাদ।

২৪। যন্ত্রের বিস্তার এবং সহজাত বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে গান্ধীজির প্রধান আলোচনার কালকে সংক্ষেপে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার যুগ (১৯১৯-১৯৩১) বলা চলে। বিগত মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯) পরবর্তী কালের নানা সামাজিক সমস্যা তখন গান্ধীজির হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছিল। তাহাদের সবগুলিকেই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার 'অবশ্যম্ভাবী' ফল বলা চলে কি না এ প্রবন্ধে সে আলোচনার অবকাশ নাই।

২৫। অর্থনীতির পাঠক মাত্রেই জানেন, লর্ড কেইন্স্ (Keynes) তাঁহার General Theory of Employment, Interest and Money গ্রন্থে

এই সমস্যা লইয়াই প্রধানত আলোচনা করিয়াছেন। এ প্রসংগে হ্যান্‌সেন্‌-এর (Hansen) Fiscal Policy and Business Cycles গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য। আধুনিক অর্থনীতি উৎপাদনসমস্যাকে সরাইয়া রাখিয়া সাম্যস্থাপন ও নিয়োগ-বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে, এ সকল গ্রন্থ তাহার প্রমাণ।

২৬। বর্তমানে খাদ্য ও বস্ত্রের মতো উপযুক্ত কর্মপ্রাপ্তিতেও মানুষের অধিকার আছে, রাষ্ট্রকে ইহা স্বীকার করিয়া নিতে হইতেছে। কাজেই, রাষ্ট্র মানুষকে কাজ না দিয়া কেবল তাহার জীবিকার সংস্থান করিয়া দিবে, এ ধারণা সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে তো বটেই, ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রেও একটু অবাস্তব বলিয়া মনে হয়। অবশ্য, মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের তত্ত্বে বেকার-সমস্যার আলোচনা অল্প ; সেটা ছিল ধনতন্ত্রের বিস্তৃতির যুগ, এ সমস্যার তখনো উদ্ভব হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র এ সমস্যার সমাধানের জন্য অংগুলি হেলনও করিবে না, এ কথা কল্পনা করা অসম্ভব।

২৭। লীগ্‌ অব্‌ নেশ্যন্‌স্‌ হইতে প্রকাশিত Economic Stability in the Post-war World গ্রন্থে এ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হইয়াছে।

২৮। অর্থাৎ, মাথাপিছু যন্ত্র ও সাজসরঞ্জামের ব্যবহার ; অর্থনীতির ভাষায় যাহাকে বলা হয় 'Capital Intensity'।

২৯। এ বিষয়ে গান্ধীজির মতবাদের সহিত অধ্যাপক জ্ঞানচন্দের (Gyanchand) নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি তুলনা করা যাইতে পারে। পি. সি. জৈন সম্পাদিত Industrial Problems of India গ্রন্থের প্রারম্ভিক প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন,—"The dangers of economic and political despotism inherent in a system of centralised control of the entire system of production have to be admitted. It is bad enough to be subservient to an employer for one's living, but subservience imposed by the State which controls *every* avenue of employment is infinitely worse."

৩০। কেবল যে ধনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থায় অবাঞ্ছিত নগর-সভ্যতার উদ্ভব হয়, তাহা নয়, কেন্দ্রশাসিত যন্ত্রব্যবহারমূলক সমাজতন্ত্রেও জনাকীর্ণ নগরের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের উপর তাহার প্রভাব সামান্য নয়।

৩১। শিল্প সভ্যতার প্রথম পুরোধা Adam Smith পর্যন্ত এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কার্ল মার্ক্স যদিও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, যান্ত্রিক উৎপাদন-রীতি শ্রমিককে এক অদ্ভুত ও বিকলাংগ জীবে পরিণত করে ("makes him a cripple and a monster") তথাপি তাঁহার ব্যবস্থা-পত্রে যন্ত্রকে বাদ দিবার নির্দেশ ছিল না। সমৃদ্ধি বাড়ানোর দিকে নজর ছিল বলিয়াই বোধ হয় মার্ক্স এ নির্দেশ দিতে ভরসা পান নাই। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের দিক হইতে দেখিতে গেলে গান্ধীনীতি মার্ক্সীয় নীতি অপেক্ষা অনেক বেশি অগ্রসর, অর্থাৎ শ্রমজীবীর সৃষ্টির আনন্দকে গান্ধী তাঁহার সহজ অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

৩২। "In modern society not only is the ownership of the means of production concentrated, but there are far fewer positions from which the major structural connections between different economic activites can be perceived and fewer men can reach those vantage points." উক্তিটি Mannheim-এর গ্রন্থ হইতে অধ্যাপক ডাটিওয়ালা কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে। সমাজতন্ত্র না হয় প্রথম সমস্যাটির সমাধান করিতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়টির ?

৩৩। প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধটির নাম Socialism and Gandhism. গত ১৯৪৫ সনের 'Modern Review' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩৪। এক সময়ে অর্থনীতিবিদ্‌রা laissez-faire নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। ধনতন্ত্রের বিস্তৃতির যুগে ইহার ঐতিহাসিক আবশ্যকতা অস্বীকার করা

চলিবে না। এ কথাও স্বীকার্য যে, প্রথম যুগ হইতেই এই নীতি-বিরুদ্ধ অর্থ নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার লোকের অভাব ছিল না।

৩৫। অনুবাদ। 'Young India' পত্রিকা, ১৩. ১০. ১৯২১।

৩৬। অনুবাদ। ইংরাজি 'হরিজন' পত্রিকা, ২৭. ১. ৪০।

৩৭। ভাবানুবাদ। Young India পত্রিকা, ১৫. ১১. ১৯২৮।

৩৮। "The state represents violence in a concentrated and organised from." ইহার সুষ্ঠু বাংলা অনুবাদ আমার দ্বারা সম্ভব হয় নাই। দ্রষ্টব্য—নির্মলকুমার বসু, Studies in Gandhism. পৃ. ৪৩।

৩৯। "The state will not wither away; it will blossom into a flower." উক্তিটি কাহার, সে কথা আমার জানা নাই।

৪০। রাষ্ট্র সম্বন্ধে গান্ধীজী ও মার্ক্সের চিন্তাধারা তুলনা করিবার বিষয়। রাষ্ট্র যে হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত এ কথা উভয়েই স্বীকার করিয়া লইতেছেন; কিন্তু মার্ক্স যেমন শ্রেণী শোষণের কথা বলিয়াছিলেন, গান্ধীজী সেরূপ কিছু বলেন নাই। আবার, মার্ক্স যেমন সর্বহারা শ্রেণী (Proletariate) কর্তৃক রাষ্ট্র শক্তির অধিকার কল্পনা করিয়াছিলেন, গান্ধীজীর চিন্তায় তাহার স্থান নাই। তিনি ব্যক্তিগত পরিবর্তন ও অহিংস ব্যক্তি-চরিত্রের গঠন দ্বারা হিংসাভিত্তি রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করিয়া দিতে চান্। ব্যক্তিচরিত্রের এরূপ আমূল পরিবর্তন কোনো কালে সম্ভব হইবে কি না জানি না; কিন্তু সংঘবদ্ধ জীবনে, বিশেষতঃ গণতন্ত্র-সম্মত রাষ্ট্রিক জীবনে, ব্যক্তির পক্ষে হিংসা পরিত্যাগ করিয়া যুক্তি ও ন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করা যে অধিকতর সহজ ও স্বাভাবিক উপায়, উপরে আমাদের ইহাই মূল বক্তব্য।

৪১। ধনতন্ত্রের পক্ষে বক্তব্যটুকুও শুনিয়া রাখা ভালো। ক্ষুদ্র গ্রামসমাজকে বিলুপ্ত করিয়া সে বৃহত্তর সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে, অধিক সংখ্যক লোকের পক্ষে আগের চেয়ে উন্নত ধরণের জীবনযাত্রা সম্ভবপর করিয়াছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সহায়তা করিয়াছে। সংগে সংগে বাড়িয়াছে ধনবৈষম্য, লোভ, চাতুরী

এবং পররাজ্য শোষণের প্রবৃত্তি। ভারতের গ্রামসমাজগুলি কি ভাবে ধীরে ধীরে বিপর্যস্ত হইয়া গেল তাহার একটি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ কে. এস্. শেলভংকর প্রণীত The Problem of India গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে পাওয়া যাইবে। (প্রকাশক : পেংগুইন্ বুক্স্ লিমিটেড্)

৪২। 'শনিবারের চিঠি' (আষাঢ়, ১৩৫৩) পত্রিকায় গান্ধীজির গঠনকর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ এই অসংগতিকেই দূর করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "যখন রাষ্ট্র আমাদের হইবে, তখনও কি রাষ্ট্রকে আমরা শত্রুভাবে উপাসনা করিব? তখন সমাজে যে ঐতিহাসিক অবস্থা আসিবে তাহাতে বর্তমান (রাষ্ট্রনিরপেক্ষ) গঠনক্রম কি সম্পূর্ণ সমাজবিচ্যুত এবং অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইবে না?"

৪৩। দ্রষ্টব্য—Oppenheimer প্রণীত The State গ্রন্থ।

৪৪। সন্দেহবাদী ইহা অস্বীকার করিবেন। সে ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত, মুষ্টিমেয় শাসক ও শোষক শ্রেণী অধিকাংশ মানুষের সমৃদ্ধি ব্যাহত করিতে থাকিবে, ইহাই মানুষের ভাগ্যলিপি। অধ্যাপক আঞ্জারিয়া (J. J. Anjaria) তাঁহার An Essay on Gandhian Economics গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদটিতে (পৃ. ৩৬) এই সন্দেহবাদের আভাস দিয়াছেন।

৪৫। ভাবানুবাদ। নির্মল বসু, Studies in Gandhism. পৃ. ৪৩।

৪৬। 'শনিবারের চিঠি'তে (আষাঢ়, ১৩৫৩) শ্রীযুক্ত বিমল সিংহের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪৭। অনুবাদ। ইংরাজি 'হরিজন' পত্রিকা, ৩১. ৭. ১৯৩৭।

৪৮। সম্প্রতি মাদ্রাজ সরকার যে বিকেন্দ্রীকৃত বস্ত্র-শিল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, গান্ধীজি তাহা সমর্থন করিয়াছেন। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে অবাধ ধনতন্ত্রকে পরাভূত করিয়া বিকেন্দ্রীকরণের প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত হিসাবে ইহা উল্লেখ-যোগ্য। ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কতখানি প্রয়োজন, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

৪৯। অহিংস অসহযোগের নীতিকে গান্ধীজি যতটা ব্যক্তিগত অসহযোগের ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, আমরা কিন্তু তাহা করি না। ইহাতেও সংঘবদ্ধ পরিচালনার একান্ত প্রয়োজন। গান্ধীজির চিন্তাধারাকে বড়ো বেশি atomistic বলিয়া অনেক সময় মনে হইয়াছে। (পৃ. বিয়াল্লিশ দ্রষ্টব্য)

৫০। বস্তুত, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ একটি ধারণাতীত (imponderable) বস্তু। মার্ক্স তাঁহার রাষ্ট্রকে শ্রেণীর ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কিন্তু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবিশেষের মধ্য দিয়াই যে সে ইচ্ছা প্রকাশিত হয়, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মনে করিয়াছেন।

৫১। তাঁহার মত এই :—"It is our duty to co-operate only so long as the State protects our honour ; it is equally our duty not to co-operate when the State, instead of protecting, robs us of our honour. That is what non-co-operation teaches us." (মাদ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতা।

৫২। অধ্যাপক আঙ্গারিয়া সত্যই বলিয়াছেন, "The problem is not whether we can or should decentralise production to whatever extent we can—but whether and how we can decentralise and democratise the ownership and control of *Power*—Economic, Social and *Political*." (পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৩৬) রাষ্ট্রশক্তির বিকেন্দ্রীকরণ যে প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্যই অত্যাবশ্যক ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজশাস্ত্রে 'ইহা বাঞ্ছনীয়' কিংবা 'এরূপ হওয়া উচিত'—এই ধরণের উক্তি বিপজ্জনক। মানুষের সচেতন ও সংঘবদ্ধ চেষ্টার ফলে সমাজে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসিতে পারে, ইহাই শুধু স্বীকার্য। আমরা কেবল বলিতে চাই যে, প্রকৃত গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রশক্তির বিকেন্দ্রীকরণ, দুইটি অবিচ্ছেদ্য। এই দিক দিয়া বিভিন্ন দেশের "প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র" আমাদের গণতন্ত্রের আদর্শকে কতটুকু প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছে, তাহাও বিচার্য।

৫৩। যথা, কর্মের আনন্দ হইতে মানুষকে বঞ্চনা, জনাকীর্ণ নগরের দুর্নীতি-মূলক জীবন, অন্যের নিকট হইতে আদেশ গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা (regimentation) ইত্যাদি।

৫৪। ⎫
⎬ ইংরাজি 'হরিজন' পত্রিকার সংখ্যাবিশেষে উদ্ধৃত।
৫৫। ⎭

৫৬। ভারতের Association of Engineers-এর সম্পাদক গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন।

৫৭। পূর্ববর্তী তৃতীয় অধ্যায়ে ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কার্ল মার্ক্স বহু পূর্বেই ইহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

৫৮। স্বর্গত অনাথগোপাল সেন তাঁহার "জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজীর অর্থনীতি" গ্রন্থে এই ধরণের একটি মানসিক স্খলনের জন্য দায়ী ছিলেন, ইহা আমার বহুবার মনে হইয়াছে। পরিপূর্ণ চিত্র হিসাবে বিকেন্দ্রীকৃত আর্থিক ব্যবস্থা যত মনোহর, তাহার বিকাশপদ্ধতি যে তত সহজ ও বাধাবিঘ্নহীন নহে, এ কথা মনে থাকিলেও রচনার ভিতরে প্রকাশ করা তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই। হয়তো সমাজতন্ত্র ও গান্ধীতন্ত্রের পার্থক্যকে বড়ো করিয়া দেখাইতে গিয়া, গান্ধীতন্ত্রের এই মূল দুর্বলতাকে তিনি পাশ কাটাইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি যে-সমাজতন্ত্রের নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহা বিপ্লব-সঞ্জাত, রাশিয়ান্ সমাজতন্ত্র—ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

৫৯। অর্থাৎ, অন্য কারণে বড়ো কারখানাকে যদি রাখিতেই হয়। বড়ো কারখানার রন্ধ্র পথে স্বৈরাচার-শাসন যাহাতে আসিতে না পারে, সেইজন্য কারখানার সাধারণ নীতির উপর শ্রমিক সমবায়ের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। অবশ্য, সমস্ত সমবায়ের মধ্যেই শাসন ও শোষণের সুযোগ করিয়া লওয়া চলে; সমাজে বাস করিতে হইলে সাধারণ মানুষকে এ বিপদ স্বীকার করিয়াই লইতে হইবে। বিভিন্ন সমবায়ের ঠোকাঠুকির ফলে তবু যদি কিছুটা স্বাধীনতার আস্বাদ পাওয়া যায়!

৬০। তুলনীয়: "The masses, the world over, do not have to seize power, since it is by their toil that the wheels go round and the earth brings forth; this is their power; their strength lies in the realisation of it." কিন্তু realisationটি একযোগে হওয়া চাই; সেইজন্য দরকার সংঘ ও নেতৃত্বের, এবং নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার।

৬১। এম. এল. দাঁতওয়ালা প্রণীত Gandhism Reconsidered নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্তিটি গান্ধীজির।

৬২। রাষ্ট্র-দার্শনিক বুঝিবেন, ইহা Pluralism মতের প্রতিধ্বনি।

৬৩। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ৺অনাথগোপাল সেনের Socialism and Gandhism প্রবন্ধ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৬৪। যন্ত্রের যদি বহুল-উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে, অথচ তাহাকে বিভক্ত করিয়া স্বল্পতর উৎপাদন সম্ভব না হয়, তবে সেরূপ যন্ত্রকে অর্থনীতির ভাষায় 'অবিভাজ্য' বলা হয়। নির্মিত রেলপথ ইহার একটি দৃষ্টান্ত।

৬৫। ১—সংখ্যক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬৬। কারণ, বর্তমানে ভারতের কৃষি-শিল্পে বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যা এত বেশি যে, কৃষিকে উন্নত করিতে হইলে ইহাদিগকে অন্য কর্ম দেওয়া প্রয়োজন; কিন্তু শিল্পেও এত লোকের কর্মসংস্থান সহজে হইবে কি-না সন্দেহ। আধুনিক শিল্পে শ্রমিকের কর্মসংস্থান সূচী (employment index) খুব উঁচুতে নয়। সেইজন্য ভারতবর্ষে স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবেই কিছু কিছু কুটির-শিল্প অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইবে। এই প্রসংগে ভারতের জনসংখ্যা উর্ধ্বতম-উৎপাদন-সম্মত সীমাকে (optimum) ছাড়াইয়া গিয়াছে কি-না তাহাও অর্থনীতিবিদ্‌গণের বিবেচ্য।

৬৭। বস্তুত, রাষ্ট্রের হাতে শুধু পর্যবেক্ষণ ও সাধারণ পরিদর্শনের ভার

থাকিবে মাত্র; পরিকল্পনা ও তাহাকে কার্যে পরিণত করিবার ভার গ্রামসমাজের। পরে ৬-নং অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬৮। লর্ড কেইন্‌স্ (Keynes) প্রণীত পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৬৯। সঞ্চিত মূলধন যাহাতে সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, ধনিকের ইংগিতে বিলাসদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য, অথবা কেবলমাত্র সঞ্চয়ের (hoard) জন্য নয়, ইহার ব্যবস্থা করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য।

৭০। সুপ্রসিদ্ধ "বোম্বাই পরিকল্পনা"য় (Bombay Plan) যে ভাবে ভারতের আর্থিক উন্নতির কল্পনা করা হইয়াছে, বি. আর. শিনয় (Shenoy) তাহার যথার্থ সমালোচনা করিয়াছেন। মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) দ্বারা আর্থিক বিকাশ যে একেবারেই অসম্ভব, আমরা তাহা মনে করি না; কিন্তু ইহার ফলে সমাজে ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পাইবে, নানারূপ জটিল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখিবার জন্য বহু ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে এবং সাময়িক ক্ষতি অনেককেই সহ্য করিতে হইবে—বিশেষতঃ যদি ধনতন্ত্রের কাঠামো বজায় রাখিয়া মুদ্রাস্ফীতির প্রবর্তন করা হয়। পক্ষান্তরে, কম্যুনিজমের মত কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া মুদ্রাস্ফীতি করিবার পরামর্শও আমরা দিতে পারি না।

৭১। যান্ত্রিক উৎপাদন রীতির সাহায্যে মানুষের অবসর বাড়ানোকেও গান্ধীজি কোনো কোনো স্থলে সমালোচনা করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের মনে হয়, অবসর সময়ে স্বাধীন শিল্পকাজ করিয়া মানুষ যন্ত্রের গতিবেগের সহিত তাল রাখিয়া কাজ করিবার বিপদকে প্রতিরোধ করিতে পারে। অবশ্য, অবসর সমভাবে বণ্টিত হওয়া প্রয়োজন (equal distribution of leisure)।

৭২। অধ্যাপক মানহাইম (Mannheim) তাঁহার Man and Society গ্রন্থে এ সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা করিয়াছেন।

৭৩। ইহার জন্যে সমবায়মূলক সংবাদ পরিবেশন রীতির সৃষ্টি করা কি অসম্ভব?

৭৪। বস্তুত, গ্রামসমাজেও যথেষ্ট শোষণ ছিল। ক্ষুদ্র গৃহচালিত শিল্পে (domestic industry) শিশুপীড়নের বাধা ছিল না। এই সকল শোষণের সম্ভাবনা সম্পর্কে গান্ধীপন্থীরা (অর্থাৎ গোঁড়া বিকেন্দ্রীকরণবাদীরা) একেবারে নীরব। তুলনীয়, দাঁতওয়ালা : পূর্বোল্লিখিত পুস্তক : "Exploitation may begin with the rickshaw and end with the airplane economy" ইত্যাদি। পৃ. ৩৬।

৭৫। বৃহত্তর সাংস্কৃতিক সমবায় অবশ্য গান্ধীপন্থায়ও স্বীকৃত; কিন্তু ন্যূনতম আর্থিক প্রয়োজন সাধনের জন্যও যে বৃহত্তর সমবায় প্রয়োজন, বিকেন্দ্রীকরণ-বাদীরা সহজে তাহা স্বীকার করেন না।

৭৬। পরে ইহাকেই আমরা 'কম্যুনিজম্' বলিয়াছি।

৭৭। C. E. M. Joad : 'Guide to the Philosophy of Morals and Politics', অধ্যক্ষ অগ্রবাল কর্তৃক উদ্ধৃত।

৭৮। ভাবানুবাদ। নির্মলকুমার বসুর প্রবন্ধবিশেষে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৮৯। তুলনীয় : নির্মল কুমার বসু : শনিবারের চিঠি, ভাদ্র, ১৩৫৩।

৮০। মোটামুটিভাবে, ১৯১০—১৯৩০।

৮১। বস্তুত, বাস্তবতার দিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে, বহির্জাগতিক ঘটনাবলীই ভারতের ভবিষ্যৎ আর্থিক সংগঠনকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিবে।

৮২। তুলনীয় : পি. সি. জৈন সম্পাদিত 'Industrial Problems of India' গ্রন্থে অধ্যাপক জ্ঞানচন্দের (Gyanchand) প্রারম্ভিক প্রবন্ধ।

৮৩। দ্রষ্টব্য : গ্যাডগিল্ (Gadgil) : 'Industrial Evolution in India'.

৮৪। তুলনীয় : "The object of planned economy for India is neither economic autarky and national aggression as sought in fascist countries, nor economic imperialism

based on the power and prosperity of a small capitalistic and directive class, as in the democratic countries, nor again a bare materialistic and regimented culture as in Russia." (অধ্যক্ষ অগ্রবালের পূর্বোল্লিখিত পুস্তকে উদ্ধৃত)

৮৫। জার্মাণ অর্থ নৈতিক সংগঠন এই ভিত্তির উপরই গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা পাঠকের জানা থাকা স্বাভাবিক। 'Guns instead of butter' উক্তিটি গ্যেরিং (Goering) এর।

৮৬। বি. আর. শিনয় (Shenoy) প্রণীত The Bombay Plan : A Review of its Financial Provisions গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৮৭। ভি. কে. আর. ভি. রাও (Rao) প্রণীত : 'The National Income of Britsh India, 1931-32" গ্রন্থে এই হিসাব পাওয়া যাইবে।

৮৮। বাৎসরিক সঞ্চয়ের কোনো নির্ভরযোগ্য হিসাব নাই। অধ্যাপক জৈন তাঁহার পূর্বোল্লিখিত পুস্তকে বাৎসরিক সঞ্চয়কে ১৬০ কোটি হইতে ৩০০ কোটি টাকার মধ্যে বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

৮৯। তুলনীয় : অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্রের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ।

৯০। সামাজিক গুণ হিসাবে অহিংসা বড়ো, কি সমবায়মূলক জীবন বড়ো, প্রশ্নটিকে এই আকারে উপস্থিত করা চলে। ইহার উত্তর বোধ হয় এই যে, অহিংসা সমবায়ের ভিত্তিস্বরূপ, কিন্তু সমবায়ই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য। বস্তুত, গান্ধীজী ব্যক্তিগত অহিংসাকে প্রাধান্য দিয়াছেন, আমরা সমাজগত সমবায়কে।

৯১। অধ্যক্ষ অগ্রবালের পূর্বোল্লিখিত পুস্তক দ্রষ্টব্য।

৯২। Aykroyd : Food and Nutrition.

৯৩। পূর্বে নয় পৃষ্ঠায় গান্ধীজির যে উক্তিটি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার মধ্যে এইরূপ একটি ইংগিত আছে; কিন্তু ভারতবর্ষ আয়ের দিক দিয়া দরিদ্র

হইলেও প্রাকৃতিক সম্পদে ধনী। অতএব, গান্ধীজির যুক্তি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। দ্রষ্টব্য :—অধ্যাপক জ্ঞানচন্দের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ।

৯৪। দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৯৫। বোম্বাই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে পনেরো বৎসরে মোট ১০ হাজার কোটি টাকা মূলধনের প্রয়োজন। এই মূলধন সংগ্রহ করা তাঁহারা যত সহজ মনে করিয়াছেন, ততটা সহজ নয়। দ্রষ্টব্য :—Shenoy: পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ।

৯৬। অর্থাৎ, আমদানির তুলনায় (relatively) বাড়িতে পারে, এবং এই বাড়্তি অংশকে জাতীয় সঞ্চয়ে পরিণত করা সম্ভব হয়।

৯৭। এই তথ্য নির্ধারণের জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহা মূলধনের একটি অংশ দ্বারা পূরণ করিতেই হইবে।

৯৮। বস্তুত, দেশরক্ষা শিল্প (Defence industries), মৌলিক শিল্প (Basic industries) এবং ভোগ্যদ্রব্য-শিল্পের (Consumers' goods Industries) মধ্যে যথার্থ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলাই পরিকল্পনার দুরূহতম অংগ।

৯৯। কিন্তু সাময়িকভাবে গুরুতর কর্মহীনতা-সমস্যা প্রতিরোধ করিবার জন্য অধিক মূল্য দিয়াও উৎপাদন-পদ্ধতি-বিশেষকে রক্ষা করা আবশ্যক হইতে পারে।

১০০। অনুবাদ। 'Young India' পত্রিকা। ১৮. ৬. ১৯৩১।

১০১। অধ্যাপক দাঁতওয়ালার কল্পনাকে এই জন্যই আমরা বর্তমানে প্রাধান্য দিতে পারি না।

১০২। অর্থাৎ, monopolistic competition.

১০৩। Sir Arthur Salter প্রণীত 'World Trade and Its Future' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

১০৪। দ্রষ্টব্য :—অধ্যক্ষ অগ্রবালের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে স্যার ভিক্টর সাসুনের (Victor Sassoon) উক্তি।

১০৫। বিশেষত, যে দেশে আয়ের পরিমাণগত বৃদ্ধি নিতান্ত অপরিহার্য।

১০৬। C. E. M. Joad প্রণীত Modera Political Theory, পৃ. ১২১।

১০৭। দ্রষ্টব্য :—বঙ্গীয় দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের (Bengal Famine Inquiry Commission) সদস্য স্যর মণিলাল নানাবতীর বিবৃতি (minute of dissent)।

১০৮। উৎপাদন-ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির উপর রাষ্ট্রের মালিকানা (state ownership of the means of production) একটি উপায় (means) হইতে পারে; কিন্তু উদ্দেশ্য (end) হইল, সামাজিক নির্ধারণের দ্বারা উৎপাদন-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ।

নির্ঘণ্ট

শ্রীকস্তুরচাঁদ লালুয়ানী রচিত পুস্তকাবলী ঃ—

মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র ১ম ভাগ

নিয়োগ বিষয়ক অর্থশাস্ত্রের বিশ্লেষণ।

Towards Marxian Destination

An Introduction to Money

Commercial Essays

Indian Business-vol. I

যন্ত্রস্থ ঃ

Indian Business-vol II

An Introduction to Banking.